উপক্রমণিকা

মহান দেশনায়ক সুভাষচন্দ্র বসুর নামাঙ্কিত নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্মুক্ত শিক্ষাঙ্গনে আপনাকে স্বাগত। ২০১১-এ এই প্রতিষ্ঠান দেশের সর্বপ্রথম রাজ্য সরকারি মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে ন্যাক (NAAC) মূল্যায়নে 'এ' গ্রেড প্রাপ্ত হয়েছে এবং ২০২৪-এ সমগ্র দেশের মুক্ত শিক্ষাব্যবস্থা ক্ষেত্রে NIRF মূল্যায়নে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে। পাশাপাশি, ২০২৪-এই 12B-র অনুমোদন প্রাপ্তি ঘটেছে।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন প্রকাশিত জাতীয় শিক্ষানীতি (NEP, ২০২০)-র নির্দেশনামায় সিবিসিএস পাঠক্রম পদ্ধতির পরিমার্জন ঘটানো হয়েছে। জাতীয় শিক্ষানীতি অনুযায়ী Curriculum and Credit Framework for Undergraduate Programmes (CCFUP)-এ চার বছরের স্নাতক শিক্ষাক্রমকে ছ'টি পৃথক প্রকরণে বিন্যস্ত করার কথা বলা হয়েছে। এগুলি হল—'কোরকোর্স', 'ইলেকটিভ কোর্স', 'মাল্টি ডিসিপ্লিনারি কোর্স', 'স্কিল এনহান্সমেন্ট কোর্স', 'এবিলিটি এনহ্যান্সমেন্ট কোর্স' এবং ভ্যালু অ্যাডেড কোর্স। ক্রেডিট পদ্ধতির ভিত্তিতে বিন্যস্ত এই পাঠক্রম শিক্ষার্থীর কাছে নির্বাচনাত্মক পাঠক্রমে পাঠ গ্রহণের সুবিধা এনে দেবে। এরই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ষান্মাসিক মূল্যায়ন ব্যবস্থা এবং ক্রেডিট ট্রান্সফারের সুযোগ। জাতীয় শিক্ষানীতি পরিমাণগত মানোন্নয়নের পাশাপাশি গুণগতমানের বিকাশ ঘটানোর লক্ষ্যে National Higher Education Qualifications Frmework (NHEQF), National Credit Framework (NCrF) এবং National Skills Qualification Framework (NSQF)-এর সঙ্গে সাযুজ্য রেখে চার বছরের স্নাতক পাঠক্রম প্রস্তুতির দিশা দেখিয়েছে। শিক্ষার্থী-কেন্দ্রিক এই ব্যবস্থা মূলত গ্রেড-ভিত্তিক, যা অবিচ্ছিন্ন ও অভ্যন্তরীণ মূল্যায়ণের মাধ্যমে সার্বিক মূল্যায়ণের দিকে অগ্রসর হবে এবং শিক্ষার্থীকে বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত সুবিধা দেবে। শিক্ষাক্রমের প্রসারিত পরিসরে বিবিধ বিষয় চয়নের সক্ষমতা শিক্ষার্থীকে দেশের অন্যান্য উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আন্তঃব্যবস্থায় অর্জিত ক্রেডিট স্থানান্তরে সাহায্য করবে। শিক্ষার্থীর অভিযোজন ও পরিগ্রহণ ক্ষমতা অনুযায়ী পাঠক্রমের বিন্যাস এই জাতীয় শিক্ষানীতির লক্ষ্য। উচ্চশিক্ষার পরিসরে এই পদ্ধতি এক বৈকল্পিক পরিবর্তনের সূচনা করেছে। আগামী ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষ থেকে স্নাতক স্তরে এই নির্বাচনভিত্তিক পাঠক্রম কার্যকরী করা হবে, এই মর্মে নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। বর্তমান পাঠক্রমগুলি উচ্চশিক্ষাক্ষেত্রে নির্ণায়ক কৃত্যকের যথাবিহিত প্রস্তাবনা ও নির্দেশাবলী অনুসারে রচিত ও বিন্যস্ত হয়েছে। বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে সেইসব দিকগুলির প্রতি যা ইউ.জি.সি-র জাতীয় শিক্ষানীতি, ২০২০ কর্তৃক চিহ্নিত ও নির্দেশিত।

মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে সব শিক্ষা পাঠ-উপকরণ শিক্ষার্থী-সহায়ক পরিষেবার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সি.বি.সি.এস পাঠক্রমের এই পাঠ-উপকরণ মূলত বাংলা ও ইরেজিতে লিখিত হয়েছে। শিক্ষার্থীদের সুবিধের কথা মাথায় রেখে আমরা ইংরেজি পাঠ-উপকরণের বাংলা অনুবাদের কাজেও এগিয়েছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীণ শিক্ষকরাই মূলত পাঠ-উপকরণ প্রস্তুতির ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছেন, যদিও পূর্বের মতোই অন্যান্য বিদ্যায়তনিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংযুক্ত অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞ শিক্ষকদের সাহায্য আমরা অকুণ্ঠচিত্তে গ্রহণ করেছি। তাঁদের এই সাহায্য পাঠ-উপকরণের মানোন্নয়নে সহায়ক হবে বলেই বিশ্বাস। নির্ভরযোগ্য ও মূল্যবান বিদ্যায়তনিক সাহায্যের জন্য আমি তাঁদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। এই পাঠ-উপকরণ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষণ পদ্ধতি প্রকরণে নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। উন্মুক্ত শিক্ষাঙ্গনের পঠন প্রক্রিয়ায় সংযুক্ত সকল শিক্ষকের সদর্থক ও গঠনমূলক মতামত আমাদের আরও সমৃদ্ধ করবে। মুক্ত শিক্ষাক্রমে উৎকর্ষের প্রশ্নে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

পাঠ-উপকরণ প্রস্তুতি সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল শিক্ষক, আধিকারিক ও কর্মীদের আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাই এবং ছাত্রদের সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি।

অধ্যাপক (ড.) ইন্দ্রজিৎ লাহিড়ি
উপাচার্য

Netaji Subhas Open University

Four Year Undergraduate Degree Programme
Under National Higher Education Qualification Framework (NHEQF) &
Curriculum and Credit Framework for Undergraduate Programmes
Bachelor of Arts (Honours) (Economics) [FUHEC]
Course Type : Discipline Specific Core (DSC)
Course Title : Indian Economy-I
Course Code : 6CC-EC-07

প্রথম মুদ্রণ : মার্চ, 2025

Memo No. SC/DTP/25/086

Date : 28. 02. 205

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের দূরশিক্ষা ব্যুরোর বিধি অনুযায়ী মুদ্রিত।

Printed in accordance with the regulations of the University Grants Commission–Distance Education Bureau

Netaji Subhas Open University

Four Year Undergraduate Degree Programme
Under National Higher Education Qualification Framework (NHEQF) &
Curriculum and Credit Framework for Undergraduate Programmes
Bachelor of Arts (Honours) (Economics) [FUHEC]
Course Type : Discipline Specific Core (DSC)
Course Title : Indian Economy-I
Course Code : 6CC-EC-07

: বিষয় সমিতি :

: সদস্যবৃন্দ :

অনির্বাণ ঘোষ
(Chariperson)
Director (i/c). SPS, NSOU

বাসবী ভট্টাচার্য
Retd. Prof., Jadavpur University

সেবক জানা
Professor of Economics,
Vidyasagar University

বিবেকানন্দ রায়চৌধুরী
Associate Professor of Economics, NSOU

অসীম কুমার কর্মকার
Assistant Professor of Economics, NSOU

প্রিয়ন্থী বাগচী
Associate Professor of Economics, NSOU

ড. অনিন্দিতা সেন
Associate Professor
Calcutta University

ড. সুসমিতা ব্যানার্জি
Associate Professor
Charu Chandra College

ড. শতরূপা বন্দ্যোপাধ্যায়
Associate Professor
Bethune College

বিশ্বজিৎ চ্যাটার্জী
Professor of Economics, NSOU

সেখ সেলিম
Associate Professor of Economics, NSOU

ড. অনিন্দিতা সেন
Associate Professor
Calcutta University

পূর্বা রায়চৌধুরী
Associate Professor of Economics,
Bhowanipore Education Society

: রচনা :
ড. মনোজিৎ ঘোষ
Associate Professor of Economics, NSOU

: সম্পাদনা :
মৈনাক রায়
Associate Professor of Economics, NSOU

: বিন্যাস সম্পাদনা :
প্রিয়ন্থী বাগচী
Associate Professor of Economics, NSOU

প্রজ্ঞাপন

এই পাঠ উপকরণের সমুদয় স্বত্ব নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সংরক্ষিত। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি ব্যতিরেকে এই পাঠ উপকরণের কোনো অংশের মুনর্মুদ্রণ বা পুনরুৎপাদন এবং কোনোরকম উদ্ধৃতি সম্পূর্ণ বে-আইনি ও নিষিদ্ধ। এই বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় প্রয়োজনীয় বিধিসম্মত আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।

অনন্যা মিত্র
নিবন্ধক (অতিরিক্ত ভারপ্রাপ্ত)

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

ভারতীয় অর্থনীতি
(HEC)
(Indian Economy)
Course Code : 6CC-EC-07

একক – ১	❑ ভারতের কাঠামোগত পরিবর্তন	7 – 35
একক – ২	❑ ভারতীয় অর্থনীতিতে পেশাগত কাঠামো এবং কর্মসংস্থানের পরিবর্তন	36 – 52
একক – ৩	❑ উন্নয়ন ও পরিকল্পনা	53 – 74
একক – ৪	❑ ভারতবর্ষে পরিকল্পনা	75 – 99
একক – ৫	❑ ভারতের উন্নয়নে আঞ্চলিক বৈষম্য	102 – 117
একক – ৬	❑ জনসংখ্যা এবং উন্নয়ন	118 – 133
একক – ৭	❑ মানব উন্নয়ন	133 – 151
একক – ৮	❑ ভারতবর্ষে দারিদ্র	152 – 165
একক – ৯	❑ ভারতের আয় বৈষম্য	166 – 178
একক – ১০	❑ ভারতে কর্মসংস্থান ও বেকারী	179 – 202

একক – ১ ❑ ভারতের কাঠামোগত পরিবর্তন

গঠন

১.১ উদ্দেশ্য

১.২ প্রস্তাবনা

১.৩ ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, কাঠামোগত রূপান্তর ও বিভিন্ন মতবাদ

১.৪ ভারতীয় অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য

১.৫ স্বাধীনতার পর থেকে ভারতের জাতীয় ও মাথাপিছু আয়ের গতি প্রকৃতি

১.৫.১ প্রথম পর্ব **1951–1980** সময়কাল

১.৫.২ দ্বিতীয় পর্ব **1981** থেকে বর্তমান সময়

১.৬ ভারতের জাতীয় উৎপন্নের কাঠামোগত পরিবর্তন ও তার তাৎপর্য

১.৭ ভারতের জাতীয় আয়ের বিভিন্ন ক্ষেত্রগত বন্টনের বিকাশ ও পরিবর্তনের তাৎপর্য

১.৮ ভারতে সঞ্চয়ের গতিপ্রকৃতি

১.৯ ভারতে বিনিয়োগ বা মুলধন গঠনের গতিপ্রকৃতি

১.১০ সারাংশ

১.১১ অনুশীলনী

১.১২ গ্রন্থপঞ্জি

১.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে ছাত্রছাত্রীরা জানতে পারবে

- ভারতীয় অর্থনীতির কাঠামোগত রূপান্তর এবং সে সম্পর্কে বিভিন্ন মতামত
- ভারতীয় অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য
- স্বাধীনতার পর থেকে ভারতের জাতীয় ও মাথাপিছু আয়ের গতিপ্রকৃতি
- ভারতের জাতীয় উৎপন্নের কাঠামোগত পরিবর্তন ও তার তাৎপর্য

- সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে ভারতের জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি 1951 থেকে 1980 এবং 1980 সালের পরবর্ত্তী অবস্থা
- ভারতের বিভিন্ন ক্ষেত্রগত বিকাশ এবং পরিবর্তনের তাৎপর্য
- ভারতে সঞ্চয় ও বিনিয়োগের গতি প্রকৃতি

১.২ প্রস্তাবনা

যে কোনো দেশের অর্থনৈতিক বিষয় নিয়ে আলোচনার ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে তার মধ্যে অন্যতম হলো অর্থনীতির বৈশিষ্ট্যগুলি কিরূপ এবং সেই দেশের জাতীয় আয়। বর্তমান এককে পরিকল্পনার শুরু থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত ভারতের জাতীয় আয় ও মাথাপিছু আয়ের কিরূপ পরিবর্তন হয়েছে তা আলোচনা করা হয়েছে। স্বাধীনতার পরবর্তীকালে ভারতের জাতীয় আয়ের ক্ষেত্রেগত পরিবর্তন ঘটেছে। এই ক্ষেত্রগত পরিবর্তন কতটা হয়েছে এবং তার তাৎপর্য কি তা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সাম্প্রতিক কালে ভারতের জাতীয় আয়ে সেবা ক্ষেত্রের অবদান উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এই সেবাক্ষেত্রের অবদানের তাৎপর্য কি, তা ভারতের উন্নয়নের উচ্চতর স্তর নির্দেশ করে কিনা তাও বিশ্লেষণ করা হয়েছে, এছাড়াও ভারতের স্বাধীনতার পরবর্তীকালে সঞ্চয় ও বিনিয়োগের গতিপ্রকৃতি নিয়েও আলোচনা করা হয়েছে।

১.৩ ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, কাঠামোগত রূপান্তর ও বিভিন্ন মতবাদ

বিভিন্ন দেশের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে নিম্ন উৎপাদনশীলতা ক্ষেত্র থেকে উচ্চ উৎপাদনশীলতা ক্ষেত্রে যে কাঠামোগত রূপান্তর হয়েছে তা উচ্চহারে অর্থনৈতিক বিকাশ এবং উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান তৈরী করতে সমর্থ হয়েছে। বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ্ যেমন Lewis (1954), Kaldor (1966) এবং Kuznets (1966, 1971) কাঠামোগত রূপান্তর এবং অর্থনৈতিক বৃদ্ধির মধ্যে সম্পর্কের উপর জোর দিয়েছেন।

রাষ্ট্রসংঘের মতে যে সব দেশগুলির মাথাপিছু বাস্তব আয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া এবং পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলির মাথাপিছু বাস্তব আয় অপেক্ষা কম সে সব দেশগুলিকে স্বল্পোন্নত বা অনগ্রসর দেশ বলা যেতে পারে। কিন্তু রাষ্ট্রসংঘের এই সংজ্ঞা থেকে স্বল্পোন্নত দেশ বা উন্নয়নশীল দেশ বা উন্নত দেশ—এই ভেদাভেদটি পরিষ্কার নয়। কারণ আমরা জানি যে মধ্যপ্রাচ্যের কিছু তৈল উৎপাদনকারী দেশ যাদের মাথাপিছু বাস্তব আয় অত্যন্ত বেশী এবং জনসংখ্যারও চাপ কম। তা সত্ত্বেও এই দেশগুলিকে কখনই উন্নত দেশ বলা যাবে না। অর্থাৎ শুধু মাথাপিছু আয়ের ভিত্তিতে কোন দেশকে স্বল্পোন্নত বা উন্নয়নশীল দেশ বলা যাবে না। বিশ্বব্যাঙ্ক মাথাপিছু জাতীয় উৎপাদনের সাহায্যে স্বল্পোন্নতির

একটি ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়েছে। এই মত দেশগুলিকে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে—স্বল্প আয় বিশিষ্ট দেশ (Low income countries), মধ্য আয় বিশিষ্ট দেশ (Middle income countries) এবং উচ্চ আয় বিশিষ্ট দেশ (High income countries)। বিশ্ব ব্যাঙ্ক মাথাপিছু স্থূল জাতীয় আয় (Gross National Income, GNI per capita) এর উপর ভিত্তি করেই বিভিন্ন আয়ভুক্ত দেশের শ্রেণীবিভাগ করেছে। 2024 খৃষ্টাব্দে স্বল্প আয় বিশিষ্ট দেশ হলো যাদের GNI per capita \$1085 বা তার কম। মধ্য আয় বিশিষ্ট দেশ হলো আবার দুই প্রকার (১) নিম্নমধ্য আয় বিশিষ্ট (lower middle income economies) এবং (২) উচ্চ মধ্য আয় বিশিষ্ট (Upper middle income economies)। নিম্নমধ্য আয় বিশিষ্ট দেশের ক্ষেত্রে GNI per capita \$ 1136 থেকে \$ 4465 এর মধ্যে। উচ্চ মধ্য আয় বিশিষ্ট দেশ হলো যাদের GNI Per capita \$ 4,466 থেকে \$ 13,845 এর মধ্যে। উচ্চ আয় বিশিষ্ট (Higher income countries) দেশ হলো যাদের GNI per capita \$ 13,846 অথবা বেশী।

প্রতিটি বিকাশমান বা স্বল্পোন্নত দেশের স্বতন্ত্র ইতিহাস, ভৌগলিক অবস্থা, আর্থ সামাজিক কাঠামো, রীতিনীতি ইত্যাদি পরিলক্ষিত হয়। অর্থাৎ এই সব বিষয়ে এই দেশগুলির মধ্যে পার্থক্য বিপুল। তথাপি, এমন কতকগুলি মৌলিক বৈশিষ্ট্য আছে যেগুলির ক্ষেত্রে এদের স্বতন্ত্রতা প্রমাণ করা দুরূহ ব্যাপার। এই মৌলিক বিষয়গুলি কমবেশী পরিমাণে প্রতিটি অনুন্নত দেশেই পরিলক্ষিত হয়। বৈশিষ্ট্যগুলি হল :

১.৪ ভারতীয় অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য

(১) মাথাপিছু আয়ের স্বল্পতা : যে কোনো অনুন্নত দেশের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো মাথাপিছু আয়ের স্বল্পতা। প্রকৃতপক্ষে অনুন্নত দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো উন্নত নয় এবং অর্থনৈতিক সংগঠনগুলিও অদক্ষ ও অনুন্নত। ফলে জাতীয় উৎপাদনের পরিমাণ কম হয়, এর সাথে জনসংখ্যা দ্রুত হারে বৃদ্ধি পেতে থাকায় মাথাপিছু আয়ের পরিমাণ খুব কম হয়।

(২) কৃষির প্রাধান্য : অনুন্নত দেশগুলিতে কৃষির প্রাধান্য বেশী হয় বলে এই দেশগুলিকে কৃষি প্রধান দেশ বলা হয়। এই সমস্ত দেশে জাতীয় আয়ের বিরাট অংশ কৃষি থেকে আসে। জীবিকা ও কর্মসংস্থানের ভিত্তিতেও কৃষি তথা প্রাথমিক ক্ষেত্রের গুরুত্ব সব থেকে বেশী।

(৩) আয় ও সম্পদ বন্টনে বৈষম্য : এই সমস্ত দেশে মুষ্টিমেয় ধনী ব্যবসায়ী ও বড় চাষীদের হাতে দেশের মোট সম্পদের এক বিরাট অংশ কেন্দ্রীভূত হয়ে থাকে।

(৪) জনসংখ্যার চাপ : এই দেশগুলিতে জনবিস্ফোরণের সমস্যা অত্যন্ত প্রকট এবং উন্নত দেশগুলির তুলনায় এই সমস্ত দেশগুলিতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বেশী।

(৫) মূলধনের স্বল্পতা : মূলধনের স্বল্পতার একটি বড় কারণ হলো দেশের জনসাধারণের সঞ্চয়ের পরিমাণ অত্যন্ত কম, সঞ্চয় কম হওয়ার কারণ হলো মাথাপিছু আয় কম এবং মাথাপিছু উৎপাদন কম। তার ফলে সঞ্চয় কম এবং বিনিয়োগ কম এবং মূলধনেরও স্বল্পতা দেখা দেয়।

(৬) দ্বৈত অর্থ ব্যবস্থা (Dual Economy) : একটি অর্থ ব্যবস্থায় যখন পরস্পর দুইটি পৃথক ঘটনা বা অবস্থার সহাবস্থান ঘটে তখন সেই অর্থ ব্যবস্থাকে দ্বৈত অর্থ ব্যবস্থা (Dual Economy) বলা হয়। অনুন্নত দেশে দুই ধরনের অর্থনৈতিক কার্যকলাপ অর্থাৎ দ্বৈত অর্থ ব্যবস্থা অবস্থান করে। একদিকে এখানে থাকে আধুনিক ক্ষেত্রে যেখানে ব্যবহৃত হয় আধুনিক কৃৎকৌশল যেটি মূলতঃ বাজারমুখী, এইগুলি কেন্দ্র করে উন্নত ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা, সওদাগিরি অফিস, যানবাহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। এই ক্ষেত্রকে বলা হয় উন্নত ক্ষেত্র বা পুঁজিবাদী ক্ষেত্র যেখানে অনেক যৌথ কোম্পানি, বিদেশী কোম্পানি দেশের অর্থনৈতিক জীবন নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। আবার অপরদিকে থাকে চিরাচরিত ক্ষেত্র যেখানে ব্যবহৃত হয় পুরানো আমলের কারিগরী কৌশল। বিস্তীর্ণ গ্রামাঞ্চলে দেখা যায় চিরাচরিত ক্ষেত্র। এই ক্ষেত্রকে বলা হয় ন্যূনতম আয়ভিত্তিক জীবনধারণের ক্ষেত্র (Subsistence Sector)। এই দুই ধরনের ক্ষেত্রের মধ্যে পারস্পরিক লেনদেন তেমন থাকে না। তাই এই দ্বৈত অর্থ ব্যবস্থার দরুন এই সমস্ত দেশে দেখা যায় একদিকে চরম দারিদ্র এবং অপরদিকে চরম প্রাচুর্য।

(৭) মানবিক মূলধন : অনুন্নত দেশের আর একটি বৈশিষ্ট্য হলো মানবিক মূলধনের নিম্নমান। জনসাধারণের গুণগত মানের মাপকাঠি হলো দেশবাসীর গড় আয়ু, স্বাক্ষরতার স্তর এবং কারিগরী শিক্ষার মান। এই সমস্ত দেশে এই বিষয়গুলির মান উন্নত দেশের তুলনায় কম।

১.৫ স্বাধীনতার পর থেকে ভারতের জাতীয় ও মাথাপিছু আয়ের গতিপ্রকৃতি

1950-51 সালে ভারতে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা শুরু হয় এবং তা 2017 সালের মার্চ মাস পর্যন্ত চলে। পরিকল্পনাকালে এবং তার পরবর্তী বছরগুলিতে ভারতের জাতীয় আয় এবং মাথাপিছু আয় বেশ কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে। আমাদের আলোচনার সুবিধার জন্য আমরা সমগ্র সময়কালটিকে দুটি ভাগে ভাগ করছি। প্রথম ভাগ বা পর্বটি হল 1951-1980 সময়কাল এবং দ্বিতীয় পর্ব বা ভাগটি হল 1981 সাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত।

১.৫.১ প্রথম পর্ব : 1951-1980 সময়কাল :

1951 সাল থেকে 1980 সাল ছিল ভারতীয় অর্থনীতিতে নিয়ন্ত্রণের যুগ। ওই সময়কালে ভারতের শিল্পক্ষেত্রে নানা নিয়ন্ত্রণ ছিল। এই সময়কালকে অনেকে পারমিট-কোটা-লাইসেন্স রাজ বলে অভিহিত করেছেন। শিল্পক্ষেত্রে ছিল সরকারি ক্ষেত্রের প্রাধান্য। বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে আমদানি নিয়ন্ত্রণ ও আমদানি-পরিবর্ততার নীতি অনুসৃত হয়েছিল। এর মূলকথা হল বিদেশ থেকে আমদানি দ্রব্য না এনে সেই দ্রব্যের পরিবর্ত দ্রব্য দেশের মধ্যে তৈরি করা। উন্নয়নের ক্ষেত্রে একে বলা হয় অন্তর্মুখী উন্নয়ন কৌশল (inward-looking strategy)। 1950-80 সময়কাল ছিল ভারতের অর্থনীতিতে এই অন্তর্মুখী উন্নয়ন কৌশলের পর্ব। এই সময়কালে ভারতের নিট জাতীয় উৎপাদন এবং মাথাপিছু নিট জাতীয় উৎপাদন

কেমন বেড়েছে তা 1.1 নং সারণিতে দেখিয়েছি। আমরা নির্বাচিত কিছু বছরের জাতীয় ও মাথাপিছু আয়ের হিসাব দিয়েছি। এখানে নিট জাতীয় উৎপাদনের দুটি হিসাব দেওয়া হয়েছে : একটি চলতি দামস্তরে এবং অপরটি 1999-2000 এই ভিত্তি বছরের দামস্তরে। অনুরূপভাবে, মাথাপিছু আয়ের দুটি হিসাব দেওয়া হয়েছে। ভিত্তি বছরের দামস্তরে হিসাব করা মাথাপিছু আয়ই হল প্রকৃত মাথাপিছু আয়।

সারণি 1.1

নিট জাতীয় উৎপাদন ও মাথাপিছু নিট জাতীয় উৎপাদন

বছর	1999-2000 দামস্তরে		চলতি দামস্তরে	
	নিট জাতীয় উৎপাদন (কোটি টাকায়)	মাথাপিছু নিট জাতীয় উৎপাদন (টাকায়)	নিট জাতীয় উৎপাদন (কোটি টাকায়)	মাথাপিছু নিট জাতীয় উৎপাদন (টাকায়)
1950-51	2,04,924	5,708	9,152	255
1960-61	2,09,045	7,121	15,593	359
1970-71	4,37,719	8,091	40,135	742
1980-81	5,83,548	8,594	1,21,129	1,784

সূত্র : Economic Survey, 2005-06

সারণি থেকে দেখা যাচ্ছে যে, 1950-51 সাল থেকে 1980-81 সালের মধ্যে প্রকৃত মাথাপিছু আয় 5,708 টাকা থেকে বেড়ে 8,594 টাকা হয়েছে অর্থাৎ 30 বছরে প্রকৃত মাথাপিছু আয় দেড়গুণের সামান্য কিছু বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে। 30 বছরে মাথাপিছু আয়ের এই বৃদ্ধি আদৌ সন্তোষজনক নয়। স্থির দামে জাতীয় ও মাথাপিছু আয় ওই তিন দশকে কেমন বেড়েছে তা আমরা 2.2 নং সারণিতে দেখিয়েছি। এই সারণি থেকে আমরা প্রকৃত জাতীয় আয় এবং প্রকৃত মাথাপিছু আয়ের বৃদ্ধির হার জানতে পারছি। সারণি থেকে দেখা যাচ্ছে যে, 1950-51 থেকে 1960-61 সালে প্রকৃত জাতীয় আয় বার্ষিক 4.2% হারে বেড়েছে। কিন্তু পরের দশকেই (1960-61 থেকে 1970-71) সালে ওই হার 3.5 শতাংশে নেমে আসে। 1970-71 থেকে 1980-81 এই দশকে তা আরো কমে বার্ষিক 2.9% দাঁড়ায়। এই সমগ্র সময়কালে নিট জাতীয় আয়বৃদ্ধির বার্ষিক হার ছিল 3.5 শতাংশের মতো। অধ্যাপক রাজকৃষ্ণ একে 'উন্নয়নের হিন্দু হার' বলে অভিহিত করেছেন। প্রকৃত মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির হারের অবস্থা আরো খারাপ। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে মাথাপিছু আয় নিট জাতীয় উৎপাদন অপেক্ষা আরো কম হারে বেড়েছে। সারণি থেকে যাচ্ছে যে, 1950-51 থেকে 1960-61 সালের মধ্যে প্রকৃত মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির হার ছিল 2.3 শতাংশ। পরের দশকে এই হার মাত্র 1.2 শতাংশ এবং শেষ দশকে অর্থাৎ 1970-71 থেকে 1980-81 এই দশকে প্রকৃত মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির হার ছিল মাত্র 0.6 শতাংশ। প্রকৃত মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির হারে এই মন্থরতার পিছনে প্রধান কারণ হল জনসংখ্যা বৃদ্ধি।

সারণি 1.2

প্রকৃত জাতীয় আয় ও প্রকৃত মাথাপিছু আয়ের বৃদ্ধির শতকরা হার (1950-51 থেকে 1980-81) (1999-2000 সালের দামস্তরে)

বছর	প্রকৃত নিট জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার (গড়)	মাথাপিছু প্রকৃত নিট জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার (গড়)
1950-51 থেকে 1960-61	4.2	2.3
1960-61 থেকে 1970-71	3.5	1.2
1970-71 থেকে 1980-81	2.9	0.6

সূত্র : Economic Survey-র বিভিন্ন সংখ্যা

1950-80 সময়কালে প্রকৃত জাতীয় আয় নিম্নহারে বাড়ার পিছনে অনেকগুলি কারণ ছিল। প্রকৃতপক্ষে 1965 থেকে 1980 সাল পর্যন্ত ভারতীয় অর্থনীতিতে মন্দা চলে। বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ এই মন্দার পিছনে বিভিন্ন কারণ নির্দেশ করেছেন। আমরা এই কারণগুলিকে দু'টি ভাগে ভাগ করতে পারি : বাহ্যিক কারণ এবং অভ্যন্তরীণ কারণ। বাহ্যিক কারণ বলতে আমরা সেই কারণগুলিকে বোঝাচ্ছি যেগুলির উপর অর্থনীতির কোনো নিয়ন্ত্রণ ছিল না। 1965-80 সময়কালে ভারতীয় অর্থনীতির মন্দার পিছনে নিম্নলিখিত বাহ্যিক কারণগুলি উল্লেখযোগ্য।

বাহ্যিক কারণসমূহ :

1. 1965 থেকে 1967 এবং পুনরায় 1971 থেকে 1973 এই চারটি বছরে ভারতে প্রচণ্ড খরা দেখা দেয়। এর ফলে কৃষি উৎপাদন ভীষণ মার খায়। ভারতের ন্যায় কৃষি প্রধান দেশে কৃষিই হল অর্থনীতির মেরুদণ্ড। কৃষির মন্দা অর্থনীতির নানা ক্ষেত্রে প্রতিকূল প্রভাব ফেলে। এর ফলে জাতীয় ও মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির হার কমে যায়। কৃষিতে মন্দার ফলে একদিকে শিল্পের জন্য কাঁচামালের জোগান কমে যায়, অন্যদিকে খরায় কৃষি ক্ষেত্রের আয় কমে যাওয়ায় শিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদাও কমে যায়। এই দু'য়ের চাপে শিল্পের অগ্রগতি ব্যাহত হয় এবং সমগ্র অর্থনীতির অগ্রগতির হার কমে যায়।

2. 1962, 1965 এবং 1971 সালে প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে ভারত যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। 1962তে ঘটে চিন-ভারত যুদ্ধ, 1965 সালে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ এবং 1971 সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে কেন্দ্র করে পুনরায় ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ। আমরা জানি, যুদ্ধের ফলে অনুৎপাদনশীল ব্যয় বৃদ্ধি পায়। সম্পদকে উৎপাদনশীল কাজে ব্যবহার করা যায় না। এর ফলে ভারতের শিল্পোৎপাদন ব্যাহত হয় এবং ফলস্বরূপ জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার কমে যায়।

3. 1965-80 সময়কালে শিল্পের অগ্রগতি ব্যাহত হওয়ার পিছনে আর একটি বড় কারণ হল পরিকাঠামোর অভাব। শিল্পের উন্নতির জন্য পরিকাঠামো শিল্পের উৎপাদন, বিশেষত বিদ্যুৎশক্তি ও পরিবহনের উন্নতি, বিশেষভাবে প্রয়োজন। ওই সময়ে ভারতে শিল্পের দ্রুত উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ পরিকাঠামো ছিল না। এর ফলেও ভারতের শিল্পোৎপাদন সন্তোষজনক হারে প্রসার লাভ করতে পারেনি।

4. 1973 সালের পর থেকে আন্তর্জাতিক বাজারে পেট্রোলের দাম দ্রুত বাড়তে থাকে। ওই বছর OPEC (Organisation of Petroleum Exporting Countries) দেশগুলি তেলের দাম অস্বাভাবিক ভাবে বৃদ্ধি করে। ফলে ভারতের শিল্পক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলা এবং বৈদেশিক বাণিজ্যে ঘাটতি দেখা দেয়। এগুলিও ভারতে জাতীয় আয় বৃদ্ধিতে বাধা দান করেছে বলে অনেকে মনে করেন।

এ সমস্ত বাহ্যিক কারণ ছাড়াও ভারতীয় অর্থনীতির মন্দার (1965) পিছনে কতকগুলি অভ্যন্তরীণ কারণও উল্লেখ করা যায়।

অভ্যন্তরীণ কারণসমূহ : নিম্নলিখিত অভ্যন্তরীণ কারণগুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

1. **আমলাতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ :** ভারতের শিল্প তথা সমগ্র অর্থনীতির মন্দার পিছনে একটি কারণ হল আমলাতান্ত্রিক প্রশাসন ও প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ। আমরা আগেই বলেছি যে, 1950-80 এই সময়কাল ছিল ভারতীয় অর্থনীতিতে পারমিট-কোটা-লাইসেন্স রাজ। অর্থনীতিবিদ ভগবতী এবং অর্থনীতিবিদ দেশাই মনে করেন যে, শিল্প লাইসেন্স ব্যবস্থা এবং সরকারের বিভিন্ন নিয়ন্ত্রণ, বিশেষ করে আমদানি-রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ, শিল্পের অগ্রগতিতে বাধার সৃষ্টি করেছে। ফলে শিল্পের তথা সমগ্র অর্থনীতির অগ্রগতির হার মন্থর হয়েছে।

2. **কৃষির ব্যর্থতা :** দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে (1956-61) কৃষি ছিল অবহেলিত। তৃতীয় পরিকল্পনাতেও (1961-66) কৃষির উপর তেমন জোর দেওয়া হয়নি। এছাড়া 1965 থেকে 1967 এবং পুনরায় 1971 থেকে 1973 সালে সারা ভারত প্রচণ্ড খরার কবলে পড়ে। স্বভাবতই কৃষি উৎপাদন কমে যায়। অর্থনীতিবিদ রাজ, বৈদ্যনাথন এবং চক্রবর্তী মনে করেন যে, কৃষির ব্যর্থতাই শিল্পের উন্নতির হারকে মন্থর করেছে। কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন কমার ফলে কৃষকদের ক্রয়ক্ষমতা কমেছে। তার ফলে গ্রামীণ ভারতে শিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদা কমে গেছে। আবার, কৃষি উৎপাদন ব্যাহত হবার ফলে কৃষি থেকে শিল্পে কাঁচামালের জোগান কমেছে। এর ফলে শিল্পের উৎপাদন তথা জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধির হার কমেছে।

3. **আয় বৈষম্য এবং বাজার বা চাহিদার সমস্যা :** অর্থনীতিবিদ অশোক মিত্র এবং দীপক নায়ার মনে করেন যে 1960-এর দশকের মধ্যভাগ থেকে শিল্পায়নের গতি মন্থর হয়ে আসার পিছনে অন্যতম প্রধান কারণ হল আয় বণ্টনের বৈষম্য ও বাজার বা চাহিদার সমস্যা। প্রথম তিনটি

পরিকল্পনায় (1951-65) ভারতের জাতীয় আয় বৃদ্ধি পেয়েছে বটে, কিন্তু আয় বণ্টনের বৈষম্য ক্রমাগত বেড়েছে। ফলে শিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদা বিশেষ বৃদ্ধি পায়নি। আয় বৈষম্য সাধারণ লোকের ক্রয়ক্ষমতা বাড়তে দেয়নি। গ্রামীণ জনসাধারণের অধিকাংশেরই আয়ের বড় অংশ খাদ্যশস্য কিনতে ব্যয়িত হয়েছে। ফলে শিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদা কমে গেছে। এর ফলেও আমাদের আলোচ্য সময়ে শিল্পের অগ্রগতি ব্যাহত হয়েছে।

4. **মূলধন-নিবিড় উৎপাদন কৌশল :** আমরা জানি, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিকল্পনায় মূল ও ভারী শিল্পের উপর জোর দেওয়া হয়েছিল। এসব শিল্পের উৎপাদন কৌশল মূলধন-নিবিড়। এই কৌশল গ্রহণের ফলে কর্মসংস্থান বিশেষ বাড়েনি। বেকারি বেড়েছে। এর ফলেও শিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদা বিশেষ বাড়েনি। তাছাড়া, মূল ও ভারী শিল্পের উন্নতি ছিল বিদেশি প্রযুক্তি নির্ভর। এরূপ প্রযুক্তির প্রধান কুফল এই যে, এর প্রসার প্রভাব (spread effect) দেশের মধ্যে তেমন পাওয়া যায় না। বিদেশি প্রযুক্তির প্রসার প্রভাব বিদেশেই বেশি হবে। ফলে দেশের মধ্যে অন্যান্য ক্ষেত্রের তেমন প্রসার ঘটেনি। এর জন্য জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার তেমন সন্তোষজনক ছিল না।

5. **সরকারি ক্ষেত্রের ব্যর্থতা :** 1970-80 দশকে অনেক সরকারি ক্ষেত্রই প্রত্যাশামতো তাদের দক্ষতা দেখাতে পারেনি। অনেক সরকারি ক্ষেত্রকে ভরতুকি দিয়ে চালাতে হয়েছে। অনেক সরকারি ক্ষেত্রে লোকসান হয়েছে। এটিও আমাদের আলোচ্য সময়কালের (1950-80) শেষ দিকে জাতীয় আয় বৃদ্ধিতে মন্থরতার অন্যতম কারণ।

সুতরাং, দেখা যাচ্ছে যে, 1950-80 এই সময়কালে জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার তেমন সন্তোষজনক না হওয়ার পিছনে অনেক কারণ ছিল। এর পিছনে যেমন যুদ্ধ, খরা, আন্তর্জাতিক বাজারে পেট্রোলের দামবৃদ্ধি প্রভৃতি বাহ্যিক বিষয় কাজ করেছে, অন্যদিকে তেমনি আয় বৈষম্য, আমলাতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ, সরকারি ক্ষেত্রের ব্যর্থতা প্রভৃতি বিষয়ও কাজ করেছে। সরকার তাই আমলাতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ কমানোর কথা ভাবতে শুরু করে। পাশাপাশি, অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সরকারি ক্ষেত্রের উপর জোর না দিয়ে বাজার-ব্যবস্থার উপর জোর দেওয়ার ভাবনা শুরু হয়। তাই 1980-র দশক থেকে শুরু হল বি-নিয়ন্ত্রণ তথা সংস্কারের যুগ। এটিই ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নের দ্বিতীয় পর্ব (1981 থেকে বর্তমান সময়)। এই দ্বিতীয় পর্বে ভারতের জাতীয় ও মাথাপিছু আয়ের গতিপ্রকৃতি নিয়ে এবার আলোচনা করব।

১.৫.২ দ্বিতীয় পর্ব : 1981 থেকে বর্তমান সময় :

এই সময়কালটি হল ভারতীয় অর্থনীতির সংস্কারের যুগ। মোটামুটিভাবে বলতে গেলে, 1980-র দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে ভারতে অর্থনৈতিক সংস্কার শুরু হয়। বিভিন্ন অর্থনৈতিক কাজকর্মে সরকারি নিয়ন্ত্রণ কমতে থাকে। সরকার শিল্পক্ষেত্রের জাতীয়করণের পথ থেকে বেসরকারিকরণের দিকে ঝুঁকতে থাকে। বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও আমদানি নিয়ন্ত্রণ ও আমদানি পরিবর্ততার পথ থেকে সরে

আসতে থাকে। রপ্তানি ও আমদানি উভয়ই প্রসারের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। সরকারের এই নীতিকে অনেকে ভারতীয় অর্থনীতির বিশ্বায়ন বা ভুবনীকরণ (globalisation) বলে অভিহিত করেন। এই সমস্ত পরিবর্তন চরম রূপ পায় 1991 সালের 24 জুলাই প্রকাশিত নতুন শিল্পনীতিতে। ভারত সরকার যে অর্থনৈতিক নীতি গ্রহণ করে তাকে বলা হয় উদারীকরণ, বেসরকারিকরণ এবং বিশ্বায়ন বা ভুবনীকরণ (Liberalisation, Privatisation and Globalisation বা, সংক্ষেপে LPG)। যাই হোক, এই সংস্কারের যুগে ভারতের নিট জাতীয় উৎপাদন ও মাথাপিছু নিট জাতীয় উৎপাদন কেমন বৃদ্ধি পেয়েছে তা আমরা 1.3 নং সারণিতে দেখিয়েছি। 1981 সাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত ভারতীয় জাতীয় সম্পর্কিত পরিসংখ্যানে ভিত্তি বছরের মুখ্যত 3 বার পরিবর্তন হয়েছে। আমরা 1990-91 সাল থেকে 2004-05 সাল পর্যন্ত জাতীয় ও মাথাপিছু আয়ের তথ্য পাই 1999-2000 সালের দামস্তরে। তারপর 2004-05 থেকে 2010-11 সাল পর্যন্ত তথ্য পাই 2004-05 সালের দামস্তরে। এরপর 2011-12 সাল থেকে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত জাতীয় ও মাথাপিছু আয়ের তথ্য পাই 2011-12 সালের দামস্তরে। আর সব বছরেরই অবশ্য চলতি দামস্তরে জাতীয় ও মাথাপিছু আয়ের তথ্য পাওয়া যায়। তুলনার অসুবিধার জন্য আমরা বিভিন্ন দামস্তরে জাতীয় আয় ও মাথাপিছু আয়ের অপেক্ষাকৃত পুরনো বছরগুলির রাশিতথ্য এখানে হাজির করছি না। আমরা 2011-12 সালের দামস্তর এবং চলতি দামস্তরে 2011-12 থেকে 2017-18 সালের ভারতের জাতীয় ও মাথাপিছু আয়ের তথ্য উপস্থাপিত করেছি (সারণি 1.3)।

সারণি 1.3

নিট জাতীয় উৎপাদন ও মাথাপিছু নিট জাতীয় উৎপাদন (2011-12 থেকে 2017-18)

বছর	2011-12 দামস্তরে		চলতি দামস্তরে	
	নিট জাতীয় উৎপাদন (কোটি টাকায়)	মাথাপিছু নিট জাতীয় উৎপাদন (টাকায়)	নিট জাতীয় উৎপাদন (কোটি টাকায়)	মাথাপিছু নিট জাতীয় উৎপাদন (টাকায়)
2011-12	78,46,531	64,316	78,46,531	64,316
2012-13	81,93,427	66,344	88,41,733	71,593
2013-14	87,51,834	69,959	1,00,56,523	80,388
2014-15	93,88,992	74,104	1,11,37,615	87,748
2015-16	99,63,681	77,659	1,21,62,398	94,797
2016-17	1,07,82,092	83,003	1,36,23,937	1,04,880
2017-18 (দ্বিতীয় RE)	1,15,40,556	87,828	1,51,49,545	1,15,293

টীকা : RE = Revised Estimate

সূত্র : Economic Survey, 2015-16 ও 2020-21

আমরা পরের সারণিতে (সারণি 1.4) 1980-81 সালের পর থেকে প্রকৃত জাতীয় আর এবং প্রকৃত মাথাপিছু জাতীয় আয়ের বৃদ্ধির শতকরা হার দেখিয়েছি। এক্ষেত্রে প্রকৃত জাতীয় ও মাথাপিছু আয়ের বৃদ্ধি বলতে স্থির দামে তাদের বৃদ্ধির শতকরা হার বোঝাচ্ছে।

সারণি 1.4

প্রকৃত জাতীয় আয় ও প্রকৃত মাথাপিছু আয়ের বৃদ্ধির শতকরা হার
(2011-12 সাল থেকে 2014-15)

বছর	প্রকৃত নিট জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার (গড়)	মাথাপিছু প্রকৃত নিট জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার (গড়)
1980-81 থেকে 1990-91	5.2	3.0
1990-91 থেকে 2000-01	5.5	3.4
2000-01 থেকে 2004-05	7.5	5.9
2004-05 থেকে 2010-11	8.5	7.0
2010-11 থেকে 2014-15	6.3	4.8

সূত্র : Economic Survey, 2015-16

সারণি 1.4 থেকে দেখা যাচ্ছে যে সংস্কার-কার্যসূচির কালে ভারতের প্রকৃত জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার বেড়েছে। বিশেষত 2000-01 থেকে 2010-11 সাল এই দশকে প্রকৃত জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার 7 থেকে 8 শতাংশ। এটি অবশ্যই যথেষ্ট কৃতিত্বের দাবি রাখে। আমরা বলতে পারি যে, ভারত অধ্যাপক রাজকৃষ্ণ কথিত ‘‘উন্নয়নের হিন্দু হারের’’ যুগ পার হয়ে এসেছে। মাথাপিছু প্রকৃত জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার অবশ্য মোটের উপর দুই শতাংশ কম। এর পিছনে কারণ হল জনসংখ্যা বৃদ্ধি। আমরা জানি যে, মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির হার = জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার —জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার। আলোচ্য সময়ে ভারতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির গড় বার্ষিক হার ছিল মোটামুটি ২ শতাংশের মতো। তাই মাথাপিছু জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার মোট জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার অপেক্ষা কম।

জাতীয় ও মাথাপিছু আয়ের গড় বৃদ্ধির হার ছাড়াও আমরা সাম্প্রতিক সময়ের বার্ষিক GDP-র (Gross Domestic Product বা স্থূল দেশীয় উৎপাদন) হার সম্পর্কেও কিছু তথ্য Economic Survey থেকে পেতে পারি। সেই তথ্য আমরা সারণি 1.5-এ উপস্থাপিত করেছি।

সারণি 1.5

ভারতের GDP বৃদ্ধির হার (শতাংশ)
(2011-12 সালের দামস্তরে)

বছর	GDP বৃদ্ধির হার
2015-16	8.0
2016-17	7.0
2017-18	6.7
2018-19 (First RE)	6.1
2019-20 (PE)	4.2
2020-21 (First AE)	– 7.9

টীকা : (1) RE : Revised Estimate, PE : Provisional Estimate AE : Advance Estimate
(2) 2020-21 সাল ছিল COVID অতিমারির প্রথম বছর। দীর্ঘ লকডাউন এবং বিশৃঙ্খলার ফলে GDP বৃদ্ধির হার ঋণাত্মক অর্থাৎ GDP কমেছে।

সূত্র : Economic Survey, 2020-21 (Statistical Appendix)

সারণি 1.5 থেকে দেখা যাচ্ছে যে, GDP-র বৃদ্ধির হারের ক্ষেত্রে সাম্প্রতিক সময়ে সবচেয়ে ভালো বছর ছিল 2015-16। ওই বছর 2011-12 সালের দামস্তরে ভারতের GDP বৃদ্ধির হার ছিল 8.0 শতাংশ। তারপর থেকে GDP বৃদ্ধির হার কমতে থাকে। 2019-20 সালে তা 4.2 শতাংশে নেমে আসে। এরপর 2020 সালের মার্চ মাসে ভারত তথা বিশ্বে কোভিড মহামারি শুরু হয়। ভারত সরকার ওই বছর 25 মার্চ থেকে 31 মে মোট 68 দিন সর্বভারতীয় স্তরে লকডাউন ঘোষণা করে। 4 দফার এই 68 দিনের লকডাউনে দেশের যাবতীয় কর্মকাণ্ড বন্ধ ছিল। এছাড়া ছিল রাজ্য ও স্থানীয় স্তরে অসংখ্য ছোট-বড় লকডাউন। এসবের ফলে দেশের অর্থনৈতিক কাজকর্ম পুরোপুরি বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। তারই ফলস্বরূপ আমরা সারণি 1.5-এ দেখছি যে, 2020-21 সালে ভারতে জাতীয় আয় (GDP) বৃদ্ধির হার ছিল ঋণাত্মক (–7.9) অর্থাৎ দেশের অর্থনীতির মাপ প্রায় 8 শতাংশ কমেছিল।

১.৬ ভারতের জাতীয় উৎপন্নের কাঠামোগত পরিবর্তন ও তার তাৎপর্য

অর্থনৈতিক কার্যকলাপের প্রকৃতির ভিত্তিতে কোনো দেশের অর্থনীতিকে সাধারণত তিনটি ভাগে ভাগ করা হয় : প্রাথমিক ক্ষেত্র (Primary sector), মাধ্যমিক ক্ষেত্র (Secondary sector) এবং তৃতীয় স্তরের ক্ষেত্র বা সেবামূলক ক্ষেত্র (Tertiary sector or Service sector)। প্রাথমিক ক্ষেত্রের মধ্যে রয়েছে কৃষি, মৎস্য চাষ, বন, ফলমূল চাষ, পশুপালন প্রভৃতি। মাধ্যমিক ক্ষেত্রের মধ্যে রয়েছে শিল্প, খনি, নির্মাণ কার্য, বিদ্যুৎ, গ্যাস ও জল সরবরাহ প্রভৃতি। আর তৃতীয় বা সেবামূলক ক্ষেত্রের মধ্যে রয়েছে

ব্যাঙ্কিং কাজকর্ম, বিমা, ব্যবসাবাণিজ্য, পরিবহন, যোগাযোগ প্রভৃতি। এই তিনটি ক্ষেত্রে নিযুক্ত ব্যক্তিদের জীবিকাকেও অনুরূপভাবে তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়। যে সমস্ত ব্যক্তি প্রাথমিক ক্ষেত্রে নিযুক্ত, তাদের জীবিকাকে প্রাথমিক জীবিকা (Primary occupation) বলা হয়। তেমনি, মাধ্যমিক ক্ষেত্রের কাজকর্মে নিযুক্ত ব্যক্তিদের জীবিকাকে মাধ্যমিক জীবিকা (Secondary occupation) বলা হয়। আর সেবা ক্ষেত্রের কাজকর্মে নিযুক্ত ব্যক্তিদের জীবিকাকে তৃতীয় স্তরের জীবিকা (Tertiary occupation) বলা হয়।

অধ্যাপক কলিন ক্লার্ক এবং অধ্যাপক এ.জি.বি দিশার-এর মতে, কোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে মোট জাতীয় উৎপন্নে প্রাথমিক ক্ষেত্র থেকে উৎপন্নের অংশ কমতে থাকে এবং মাধ্যমিক ক্ষেত্র ও সেবা ক্ষেত্র থেকে উৎপন্নের অংশ বাড়তে থাকে। অনুরূপভাবে, অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে কোনো দেশের মোট নিযুক্ত শ্রমিকদের মধ্যে প্রাথমিক ক্ষেত্রে নিযুক্ত জনসংখ্যার অংশ কমতে থাকে এবং মাধ্যমিক ও সেবামূলক ক্ষেত্রে নিযুক্ত জনসংখ্যার অংশ বাড়তে থাকে। একে ক্লার্ক-ফিশার তত্ত্ব (Clark-Fisher Thesis) বলা হয়। জাতীয় আয়ের ক্ষেত্রগত পরিবর্তনকে বলা হয় উৎপন্ন কাঠামোর (output structure) পরিবর্তন। আর শ্রমিকের নিয়োগের ক্ষেত্রগত পরিবর্তনকে বলা হয় জীবিকা কাঠামোর (occupation structure) পরিবর্তন। দুটি পরিবর্তনকে একসাথে বলা হয় দেশের কাঠামোগত পরিবর্তন (structural change)। স্বাধীনতা-উত্তরকালে ভারতের কাঠামোগত পরিবর্তন কেমন হয়েছে তা আমরা বিবেচনা করব। প্রথমে আমরা ভারতের উৎপন্ন কাঠামোর পরিবর্তন আলোচনা করব এবং তারপর ভারতের জীবিকা কাঠামোর বৈশিষ্ট্য তথা পরিবর্তন বিশ্লেষণ করব।

ভারতে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার যুগ শুরু হয় 1951 সালের এপ্রিল মাসে এবং তা শেষ হয় 2017 সালের মার্চ মাসে। পরিকল্পনাকালে ভারতের জাতীয় ও মাথাপিছু আয় বেড়েছে। পরিকল্পনার পর শুরু হয়েছে NITI আয়োগের যুগ। বর্তমানে NITI আয়োগের সুপারিশ মতো ভারতের অর্থনৈতিক কার্যকলাপ নির্বাহ করা হচ্ছে। এই 1950-51 সাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত ভারতের জাতীয় আয়ের ক্ষেত্রগত বণ্টনে কীরূপ পরিবর্তন হয়েছে তা আমরা সারণি 1.6-এ উপস্থাপিত করেছি।

সারণি 1.6

ভারতের স্থূল দেশীয় উৎপন্নের (GDP) ক্ষেত্রগত বণ্টন (শতকরা)
(1950-51 থেকে 2020-21) (1980-81 সালের দামস্তরে)

ক্ষেত্র	1950-51	1970-71	1996-97	2020-21*
প্রাথমিক	55.3	44.1	26.1	16.4
মাধ্যমিক	16.1	23.0	31.0	29.3
সেবামূলক	28.6	31.9	42.9	54.3
মোট	100.0	100.0	100.0	100.0

টীকা : * 2011-12 সালের দামস্তর

সূত্র : Economic Survey, 2020-21

সারণি 1.6 থেকে দেখা যাচ্ছে যে, 1950-51 সাল থেকে 2020-21 সাল সময়কালে ভারতের জাতীয় আয়ে প্রাথমিক ক্ষেত্রের অংশ বা অবদান ক্রমাগত কমেছে। 1950-51 সালে প্রাথমিক ক্ষেত্র থেকে আসত জাতীয় আয়ের 55.3 শতাংশ। 1970-71 সালে এই অংশ 44.5 শতাংশে নেমে আসে। 1996-97 সালে জাতীয় আয়ের 26.1 শতাংশ উদ্ভূত হত প্রাথমিক ক্ষেত্র থেকে। 2020-21 সালে প্রাথমিক ক্ষেত্রের অবদান আরো কমে দাঁড়ায় 16.4 শতাংশ। ভারতের প্রাথমিক ক্ষেত্রের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কাজকর্ম হল কৃষি ও সংশ্লিষ্ট কাজকর্ম। অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে সাথে ভারতীয় অর্থনীতিতে কৃষির আপেক্ষিক বা তুলনামূলক গুরুত্ব ক্রমাগত কমে আসছে, ফলে সামগ্রিকভাবে প্রাথমিক ক্ষেত্রের গুরুত্ব কমেছে।

অন্যদিকে, জাতীয় আয়ে মাধ্যমিক ক্ষেত্রের গুরুত্ব ক্রমাগত বেড়েছে। 1950-51 সালে ভারতের জাতীয় আয়ের মাত্র 16.1 শতাংশ আসত মাধ্যমিক ক্ষেত্র থেকে। 1970.71 সালে এই অংশ বেড়ে দাঁড়ায় 23.6 শতাংশ এবং 1996-97 সালে তা আরো বেড়ে দাঁড়ায় 31.0 শতাংশ। 2020-21 সালে অবশ্য মাধ্যমিক ক্ষেত্রের শতকরা অবদান কিছুটা কমে 29.3 শতাংশ হয়। ভারতে মাধ্যমিক ক্ষেত্রের মধ্যে রয়েছে শিল্প, খনিজ দ্রব্য, নির্মাণ কার্য, বিদ্যুৎ উৎপাদন, জল সরবরাহ, গ্যাস সরবরাহ প্রভৃতি। এদের মধ্যে শিল্পই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। 2020-21 সাল ছিল ভারতে কোভিড মহামারির প্রথম বছর। 2020 সালের 25 মার্চ থেকে 31 মে মোট 68 দিন ভারত সরকার চার দফায় সর্বভারতীয় স্তরে লকডাউন ঘোষণা করে। ওই সময়ে দেশের যাবতীয় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ও অন্যান্য কর্মকাণ্ড বন্ধ ছিল। এর ফলে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয় শিল্পক্ষেত্র। পুরো শিল্পক্ষেত্র বিশৃঙ্খল ও বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। 2020-21 সালে শিল্পের অগ্রগতির হার ছিল ঋণাত্মক (-7.2 শতাংশের মতো)। স্বভাবতই, মোট জাতীয় উৎপন্নে শিল্প তথা মাধ্যমিক ক্ষেত্রের অবদান কমে।

ভারতে সেবামূলক ক্ষেত্র বা তৃতীয় ক্ষেত্র উদ্ভূত জাতীয় আয়ের অংশ ক্রমাগত বেড়েছে। 1950-51 সালে ভারতের জাতীয় আয়ে সেবামূলক ক্ষেত্রের অংশ ছিল 28.6 শতাংশ। 1996-97 সালে এই অংশ বেড়ে দাঁড়ায় প্রায় 43 শতাংশ। 2020-21 সালে তা আরো বেড়ে 54.3 শতাংশ দাঁড়ায়। ভারতের সেবামূলক ক্ষেত্রের মধ্যে রয়েছে ব্যাঙ্ক, বিমা, পরিবহন, বিভিন্ন ধরনের সেবাকার্য, বাণিজ্য প্রভৃতি। এদের মধ্যে বাণিজ্য ও পরিবহনই অধিক গুরুত্বপূর্ণ। স্বাধীনতা-উত্তরকালে বাণিজ্য ও পরিবহন ক্ষেত্রের যথেষ্ট অগ্রগতি ঘটেছে। ফলে জাতীয় আয়ে সেবামূলক ক্ষেত্রের অবদান বেড়েছে।

১.৭ ভারতের জাতীয় আয়ের বিভিন্ন ক্ষেত্রগত বন্টনের বিকাশ ও পরিবর্তনের তাৎপর্য

কোনো দেশের জাতীয় আয়ের ক্ষেত্রগত বণ্টন থেকে ওই দেশ উন্নতির কোন্ স্তরে রয়েছে তা সাধারণত জানা যায়। ক্লার্ক-ফিশার তত্ত্ব থেকে জানা যায় যে, কোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে

সাথে ওই দেশের কাঠামোগত পরিবর্তন (structural change) ঘটে। এখন, কাঠামোগত পরিবর্তনের দুটি অংশ —উৎপন্ন কাঠামো এবং জীবিকা কাঠামো (output structure and occupation structure)। এখন, ক্লার্ক-ফিশার তত্ত্বে বলা হয় যে, কোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে ওই দেশের জাতীয় আয়ে প্রাথমিক ক্ষেত্রের অবদান কমতে থাকে এবং মাধ্যমিক ও সেবা ক্ষেত্রের অবদান বাড়তে থাকে। পাশাপাশি, দেশটির জীবিকা কাঠামোতেও একই ধরনের পরিবর্তন ঘটতে থাকে। অর্থাৎ, অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে সাথে প্রাথমিক ক্ষেত্রে নিযুক্ত লোকের অনুপাত কমতে থাকে এবং মাধ্যমিক ও সেবা ক্ষেত্রে নিযুক্ত লোকের অনুপাত বাড়তে থাকে। এক কথায়, দেশটির যত উন্নয়ন ঘটতে থাকে, মাধ্যমিক ও সেবা ক্ষেত্রের গুরুত্ব ততই বাড়তে থাকে। সুতরাং, কোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে কাঠামোগত পরিবর্তনের একটা সম্পর্ক রয়েছে। এছাড়া, জাতীয় আয়ের ক্ষেত্রগত বণ্টন থেকে কোনো দেশের অর্থব্যবস্থায় বিভিন্ন ক্ষেত্রের গুরুত্ব কীরূপ তা আমরা জানতে পারি। জাতীয় আয়ে কোন্ ক্ষেত্রের অবদান কতটা, তা জানা যায়। তেমনি, দেশটির জনসংখ্যার নিয়োগের ধরনও জানা যায় অর্থাৎ দেশের জনসংখ্যার শতকরা কতভাগ কোন্ ক্ষেত্রে নিযুক্ত, তা জানা যায়। ভারতের জাতীয় আয়ের ক্ষেত্রগত বণ্টন বিশ্লেষণ করলে আমরা নিম্নলিখিত বিষয়গুলি জানতে পারি।

1. স্বাধীনোত্তর কালে ভারতের জাতীয় আয়ে প্রাথমিক ক্ষেত্রের অবদান কমেছে এবং মাধ্যমিক ও সেবা ক্ষেত্রের অবদান বেড়েছে।
2. জাতীয় আয়ে মাধ্যমিক ক্ষেত্রের অবদান বাড়লেও তা খুব ধীর গতিতে বেড়েছে। এর তাৎপর্য হল, ভারতীয় শিল্পের অগ্রগতির হার তুলনায় মন্থর।
3. শিল্পক্ষেত্রের মধ্যে আবার সংগঠিত শিল্পক্ষেত্রের গুরুত্ব তুলনায় বেশি বেড়েছে। ক্ষুদ্র শিল্পের গুরুত্ব তুলনামূলকভাবে কমেছে। অসংগঠিত ক্ষেত্রের শিল্পের গুরুত্ব আনুপাতিকভাবে বাড়েনি।
4. ভারতের জাতীয় আয়ের কাঠামোয় যেরূপ এবং যে হারে পরিবর্তন ঘটেছে, জনসাধারণের জীবিকা কাঠামোয় সেরূপ পরিবর্তন ঘটেনি। অন্তত 2005-06 সাল পর্যন্ত ভারতের জীবিকা কাঠামোকে অনড় বলা যেতে পারে।
5. ভারতে সেবা ক্ষেত্রের অবদান মাধ্যমিক ক্ষেত্রের চেয়ে বেশি হারে বেড়েছে। ভারতের সাম্প্রতিক উন্নয়নকে অনেকে তাই সেবাক্ষেত্র চালিত উন্নয়ন (service-led growth) বলে অভিহিত করেছেন।

এখন, ভারতের কাঠামোগত পরিবর্তন বিশ্লেষণ করলে দেখা যাচ্ছে যে, ভারতে জাতীয় আয়ে প্রাথমিক ক্ষেত্রের অবদান ক্রমাগত কমেছে এবং মাধ্যমিক ও সেবা ক্ষেত্রের অবদান ক্রমাগত বেড়েছে। অনেকে তাই ক্লার্ক-ফিশার তত্ত্ব অনুসরণ করে বলতে চান যে, ভারত অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে অনেকখানি অগ্রসর হয়েছে। এই মন্তব্য সাধারণভাবে মেনে নিলেও আমাদের কয়েকটি বিষয় এর সাথে মনে রাখতে হবে। **প্রথমত**, উন্নত দেশের তুলনায় আমাদের জাতীয় আয়ে প্রাথমিক ক্ষেত্রের অবদান

যথেষ্ট বেশি। **দ্বিতীয়ত**, ভারতের জাতীয় আয়ের ক্ষেত্রগত বণ্টনে পরিবর্তন ঘটলেও জীবিকা কাঠামোর বণ্টনে বিশেষ পরিবর্তন ঘটেনি। ভারতের জীবিকা কাঠামো মোটের উপর অনড়ই রয়ে গেছে। এটি ভারতের কৃষির অনগ্রসরতাকে নির্দেশ করে। সুতরাং, ভারতের কাঠামোগত পরিবর্তন ক্লার্ক-ফিশার তত্ত্বমাফিক ঘটেনি। **তৃতীয়ত**, ভারতের জাতীয় আয়ে সেবা ক্ষেত্রের অবদান বাড়াকে অনেকে খুব উৎসাহব্যঞ্জক বলে মনে করেন। তাঁরা বলতে চান যে, এটি ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নের উচ্চস্তর নির্দেশ করছে। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে যে, সেবা ক্ষেত্রের প্রসার সর্বদাই অর্থনৈতিক উন্নয়নের নির্দেশক নয়। ভারতে শিল্প ক্ষেত্রের প্রসার সন্তোষজনক নয়। অন্তত নিয়োগ সৃষ্টির দিক থেকে দেখতে গেলে বলতে হয়, ভারতের শিল্প ক্ষেত্র আদৌ কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়াতে পারেনি। পাশাপাশি, ভারতের জনসংখ্যা বেড়েই চলেছে। ফলে বাড়তি জনসংখ্যা কৃষিতে ভিড় করেছে, কৃষি জনাকীর্ণ হয়ে পড়েছে। কৃষিক্ষেত্রের এই বিপুল উদ্‌বৃত্ত জনসংখ্যার একটা অংশ শহরে কাজের খোঁজে চলে এসেছে। এরা অধিকাংশই অশিক্ষিত এবং অদক্ষ শ্রমিক। এরা শহরের দোকান, হোটেল, রেস্তোঁরা, বাস স্ট্যান্ড এবং রাস্তায় নানা ছোটোখাটো কাজ করছে। এতে তাদের জীবনযাত্রার মান বাড়েনি। আর এরা যে ধরনের কাজে নিযুক্ত হয়েছে বা হচ্ছে, তাতে উৎপাদনশীলতা খুবই কম। এর ফলে এদের নিয়োগে দেশের উন্নতিও ঘটেনি। এক্ষেত্রে দারিদ্র্য ও বেকারির চাপেই সেবা ক্ষেত্রের প্রসার ঘটেছে। এখানে গ্রাম থেকে শহরে যে শ্রমিকের স্থানান্তর ঘটেছে, তা অর্থনীতিবিদ লুইস নির্দেশিত শ্রমের স্থানান্তর নয়। সেক্ষেত্রে গ্রামীণ উদ্‌বৃত্ত শ্রমিককে নিয়ে এসে শহরের পরিকাঠামো শিল্পের বা সামাজিক মূলধনের প্রসার (রাস্তাঘাট নির্মাণ, ক্যানাল তৈরি, অপেক্ষাকৃত কম উঁচু ব্রিজ তৈরি, বাঁধ নির্মাণ প্রভৃতি) ঘটে। আর সেই সামাজিক বহিরঙ্গের (social overhead capital) বা সামাজিক মূলধনের জোগান বাড়লে বেসরকারি মূলধন শিল্পে বিনিয়োগে উৎসাহিত হয়, শিল্পে বিনিয়োগ বাড়ে ও শিল্পক্ষেত্রটির প্রসার ঘটে। এভাবে লুইস অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটি রূপরেখা দিয়েছেন যেখানে স্বল্পোন্নত দেশের গ্রামীণ উদ্‌বৃত্ত জনসংখ্যাকে কাজে লাগিয়ে দেশের মূলধন গঠন করা যেতে পারে এবং তার দ্বারা অর্থনৈতিক উন্নয়ন অর্জন করা যেতে পারে। কিন্তু ভারতের ক্ষেত্রে গ্রাম থেকে শ্রমিকের শহরে চলে আসা এবং তার ফলে সেবা ক্ষেত্রের প্রসার অর্থনৈতিক উন্নয়নের পরিচায়ক নয়। এক্ষেত্রে সেবা ক্ষেত্রের প্রসার দারিদ্র্য ও অনুন্নতিরই ফল। উন্নয়নের পরিণত স্তরে উন্নত দেশগুলিতে সেবা ক্ষেত্রের যে ধরনের প্রসার ঘটেছে তার সাথে ভারতের সেবা ক্ষেত্রের প্রসার তুলনীয় নয়। বিষয়টি আমরা পরের বিভাগে কিছুটা বিশদে আলোচনা করেছি।

ক্লার্ক-ফিশার তত্ত্ব থেকে আমরা জানি যে, কোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে সাথে সেবা ক্ষেত্রের গুরুত্ব বাড়ে। দেশটির জাতীয় আয়ে সেবা ক্ষেত্রের অবদান বাড়ে। পাশাপাশি, দেশের জনসাধারণের বেশি বেশি অংশ সেবা ক্ষেত্রে নিযুক্ত হয়। এক কথায়, উৎপন্ন কাঠামো এবং জীবিকা কাঠামোয় পরিবর্তন ঘটে সেবা ক্ষেত্রের অনুকূলে। ভারতের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে, সংস্কার-পরবর্তীকালে (1991 থেকে বর্তমান সময়) জাতীয় উৎপন্নের কাঠামোয় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেছে। 1990-91 সালে ভারতের জাতীয় আয়ে সেবা ক্ষেত্রের অবদান ছিল 41.9 শতাংশ (2004-05 সালের দামস্তরে)

অবশ্য ভারতের জীবিকা কাঠামার ক্ষেত্রে তেমন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেনি। 1991 সালে ভারতের জনসংখ্যার 20.5 শতাংশ সেবা ক্ষেত্রে নিযুক্ত ছিল (আদমশুমারির তথ্য)। 2020 সালে এই অংশ বেড়ে দাঁড়ায় 32.3 শতাংশ (NSSO-প্রদত্ত তথ্য)। যাই হোক, ভারতের জাতীয় আয়ে সেবা ক্ষেত্রের এই উল্লেখযোগ্য অবদান বৃদ্ধিকে অনেকে সেবা ক্ষেত্রচালিত উন্নয়ন (service-led growth) বলে অভিহিত করেছেন।

ভারতের জাতীয় আয়ের সেবা ক্ষেত্রের এই অবদান বৃদ্ধির পিছনে নানা কারণ কাজ করেছে। সংক্ষেপে সেই কারণগুলিকে নিম্নলিখিত ভাবে লিপিবদ্ধ করা যেতে পারে :

1. অর্থনৈতিক প্রসারের সাথে সাথে অনেক ফার্ম কিছু কাজ বাইরের বিশেষজ্ঞদের দিয়ে করিয়ে নেয়। একে চলতি কথায় আমরা outsourcing বা 'বাইরের কাউকে দিয়ে কাজ করিয়ে নেওয়া' বলি। Prof. Jagdish Bhagwati একে Splintering বলে অভিহিত করেছেন। (Splintering-এর অর্থ হল বড় কোনো কিছুকে টুকরো টুকরো করা)। এই outsourcing বা splintering কাজ বর্তমানে খুব বেড়েছে। এগুলিকে সেবা ক্ষেত্রের কাজ বলে ধরা হয়। ফলে দেশের মোট উৎপাদনে সেবা ক্ষেত্রের অবদান বেড়েছে।

2. উদারীকরণের নীতির ফলে ভারতে আয় বৈষম্য ভীষণভাবে বেড়েছে। উচ্চবিত্ত শ্রেণির বিভিন্ন ধরনের সেবা কার্য ও বিলাস দ্রব্যের চাহিদা বেড়েছে। এর ফলে সেবা ক্ষেত্রের প্রসার ঘটেছে।

3. 1991 সালের পর আর্থিক নীতির উদারীকরণের ফলে বেসরকারি ক্ষেত্রে ব্যাঙ্ক, বিমা, টেলিযোগাযোগ প্রভৃতির ব্যাপক প্রসার ঘটেছে। এগুলি সবই সেবা ক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত।

4. সাম্প্রতিক বছরগুলিতে মানুষের শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে বেশি ব্যয় করার প্রবণতা বেড়েছে। অনেক স্কুল, নার্সিংহোম, হাসপাতাল, ইঞ্জিনিয়ারিং ও ম্যানেজমেন্ট স্কুল ভারতের বেসরকারি ক্ষেত্রে গড়ে উঠেছে। এদের কার্যকলাপের প্রসারও ভারতে সেবা ক্ষেত্রের প্রসার ঘটিয়েছে।

5. বর্তমানে ইন্টারনেট, সেলুলার ফোন প্রভৃতির প্রবর্তনের ফলে টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার বিস্ময়কর অগ্রগতি ঘটেছে। সেবা ক্ষেত্রের বিস্তারের পিছনে এই বিষয়টিও কাজ করেছে।

6. বিভিন্ন সামাজিক পরিষেবা, সরকারি প্রশাসন, প্রতিরক্ষা প্রভৃতি খাতে বিগত বছরগুলিতে সরকারের ব্যয় বেড়েছে। এর ফলেও সেবা ক্ষেত্রের প্রসার ঘটেছে এবং জাতীয় আয়ে এর অবদান বেড়েছে।

7. 1991 সালের পর থেকে ভারতে ব্যাপক নগরায়ণ ঘটেছে। বহুতলবিশিষ্ট আবাসন কমপ্লেক্সের প্রসার ঘটেছে। এই সমস্ত আবাসনের বাসিন্দারা তাদের প্রয়োজনীয় প্রায় সব জিনিসই ঘরে বসে পেতে চায় (home delivery)। এর ফলেও সাম্প্রতিক অতীতে ভারতে সেবা ক্ষেত্রের প্রসার ঘটেছে।

8. পর্যটন, রেলভ্রমণ, বিমানের টিকিট বুকিং, ট্যাক্সি বুকিং ইত্যাদি হরেক রকম পরিষেবা এখন বৈদ্যুতিন মাধ্যমের দ্বারা প্রদান করা হচ্ছে। এর ফলেও ভারতে সেবা ক্ষেত্রের দিন দিন প্রসার ঘটে চলেছে।

9. আধুনিক শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে এখন বিজ্ঞাপন, বিপণন, কর্মীদের আইনি-সেবা প্রদান, জনসংযোগ ইত্যাদি নানাবিধ খাতে বহু টাকা ব্যয় করতে হয়। এটিও সেবা ক্ষেত্রের বৃদ্ধির অন্যতম কারণ।

10. কৃষিতে শ্রমিকের আধিক্য এবং শিল্পে নিয়োগ না বাড়ার ফলে দেশের জনসাধারণ অসংগঠিত সেবাক্ষেত্রে যাই-হোক একটা কাজ করতে বাধ্য হচ্ছে। ফলে ভারতে সম্প্রতি অসংগঠিত সেবা ক্ষেত্রের ব্যাপক প্রসার ঘটেছে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, ভারতে নানা কারণে সেবা ক্ষেত্রের প্রসার ঘটেছে। ভারতে সেবা ক্ষেত্রের এই প্রসার উন্নত দেশের সেবা ক্ষেত্রের প্রসারের সঙ্গে তুলনীয় নয়।

প্রথমত, উন্নত অর্থনীতিতে উৎপাদন হয় বহু বিচিত্র রকমের (diversified)। এই বিচিত্র রকমের দ্রব্যের উৎপাদনকে কেন্দ্র করে নানা ধরনের সেবামূলক কাজের উদ্ভব ও প্রসার ঘটে। **দ্বিতীয়ত**, উন্নত দেশের জাতীয় আয়ে ব্যাঙ্ক, বিমা, বাণিজ্য, পরিবহন প্রভৃতির অবদান খুবই বেশি। এ সমস্ত দেশের অধিবাসীদের জীবনধারণের জন্য প্রাথমিক প্রয়োজনগুলি আগেই মিটে গেছে। এদের এখন শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পর্যটন এবং নানা বিলাস দ্রব্যের জন্য চাহিদা বেশি। এগুলির অধিকাংশই সেবাকর্ম নির্ভর। তাই উন্নত দেশে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক ক্ষেত্রের তুলনায় সেবা ক্ষেত্রের আপেক্ষিক গুরুত্ব বেশি। এসমস্ত দেশে তাই সেবা ক্ষেত্রের উন্নতি ও প্রসার দেশটির উন্নয়নের পরিণত ও অগ্রগামী স্তর নির্দেশ করছে।

কিন্তু ভারতের ন্যায় স্বল্পোন্নত ও জনবহুল দেশে সেবা ক্ষেত্রের প্রসার উন্নয়নের পরিণত স্তরকে প্রকাশ করে না। এক্ষেত্রে সেবা ক্ষেত্রের প্রসার বরং এক ধরনের ভারসাম্যহীনতা প্রকাশ করে। ভারতের আয় কাঠামোর পরিবর্তন ঘটলেও জীবিকা কাঠামোর তেমন কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। তাছাড়া, ভারতের শিল্পের তেমন উন্নতি ঘটেনি। বাড়তি জনসংখ্যাকে শিল্পক্ষেত্র কাজ দিতে পারেনি। ফলে বাড়তি জনসংখ্যা কৃষিতে ভিড় করেছে। কৃষিতে সৃষ্টি হয়েছে ব্যাপক প্রচ্ছন্ন ও মরশুমি বেকারত্ব। এই বাড়তি শ্রমিকেরই একটা অংশ শহরের অসংগঠিত সেবা ক্ষেত্রে নানা ছোটোখাটো কাজ জুটিয়ে নিচ্ছে। (যেমন, চা ও রেস্টুরেন্ট, ছোটোখাটো হোটেল প্রভৃতিতে কাজ, রেল স্টেশন ও বাস স্ট্যান্ডে মুটে-মজুরের কাজ প্রভৃতি)। এতে এদের জীবনযাত্রার মান বাড়েনি। তা ছাড়া, ভারতীয় অর্থনীতিতে রয়েছে বিপুল সংখ্যক শিক্ষিত বেকার। এরা ব্যাঙ্ক, বিমা প্রভৃতি ক্ষেত্রে চুক্তির ভিত্তিতে সামান্য মাইনেতে কাজ করছে। এরাও আসলে প্রচ্ছন্ন বেকার। তেমনি, ভারতের পরিবহন ও বাণিজ্য ক্ষেত্রেও রয়েছে অদক্ষ ও অসংগঠিত শ্রমিক (গ্যারেজে হেল্পারের কাজ, ট্রেনে জুতো পালিশ বা কাগজফেরি প্রভৃতি)। এরাও দারিদ্র্যসীমার নীচেই

বাস করে। এই সমস্ত বিপুল সংখ্যক প্রচ্ছন্ন বেকার ভারতের সেবা ক্ষেত্রের 'তথাকথিত' প্রসার ঘটিয়েছে। এই প্রসার কোনো পরিণত স্তরের উন্নয়নের নির্দেশক নয় এবং এটি উন্নত দেশের সেবা ক্ষেত্রের প্রসারের সঙ্গে তুলনীয় নয়।

১.৮ ভারতে সঞ্চয়ের গতিপ্রকৃতি

আমরা জানি যে, ভারতের ন্যায় স্বল্পোন্নত দেশে মূলধনের অভাব। অর্থনীতিবিদ নার্কস বলেছেন যে, মূলধনের অভাবের দরুন স্বল্পোন্নত দেশে দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র কাজ করে। আর এই মূলধনের জোগান আসে সঞ্চয় থেকে। সুতরাং, স্বল্পোন্নত দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সঞ্চয়ের হার বাড়ানো অতীব গুরুত্বপূর্ণ। অবশ্য শুধু সঞ্চয়ের হার বাড়ালেই হবে না, সেই সঞ্চয়কে উৎপাদনশীল কাজে বিনিয়োগ করতে হবে। বিনিয়োগের দ্বারা দেশে মূলধন গঠন হয়ে থাকে। এই বিভাগে আমরা ভারতের সাম্প্রতিক কালে সঞ্চয়ের হার কেমন তা বিবেচনা করব। এই সঞ্চয়ের দ্বারা ভারতের মূলধন গঠন কেমন হয়েছে তা পরের বিভাগে বিবেচনা করা হবে।

1950-51 সালের পর থেকে ভারতে সঞ্চয়ের হার সন্তোষজনকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ভারতে অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়ের উৎস হল তিনটি : পরিবার ক্ষেত্র (Household sector), বেসরকারি শিল্পক্ষেত্র (Private corporate sector) এবং সরকারি ক্ষেত্র (Public sector)। 1950-51 সাল থেকে 2011-12 সাল পর্যন্ত আমরা 2004-05 সালের দামস্তরে ভারতের অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়ের হার সম্পর্কে তথ্য পাই। এর পর ভিত্তি বছরের পরিবর্তন হয়। নতুন ভিত্তি বছর হল 2011-12 সাল। সেজন্য আমরা তুলনার জটিলতা এড়াতে 2011-12 সাল থেকে সাম্প্রতিক অতীতের কয়েক বছরের সঞ্চয়ের হার দেখিয়েছি। তার আগের সময় পর্বে ভারতের সঞ্চয়ের হার যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। সঞ্চয়ের হারকে সাধারণত জাতীয় আয়ের শতাংশ হিসাবে দেখানো হয়। 1950-51 সালে ভারতের স্থূল অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়ের হার ছিল 9.5 শতাংশ (2004-05 সিরিজ অনুযায়ী)। 1990-91 সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় 22.9 শতাংশ। 2004-05 সালে সঞ্চয়ের হার বেড়ে 32.4 শতাংশে পৌঁছায়। (সবই 2004-05 সিরিজ অনুযায়ী)।

1.7 নং সারণিতে আমরা 2011-12 সালের সিরিজ অনুযায়ী 2018-19 সাল পর্যন্ত ভারতের স্থূল অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়ের হার উপস্থাপন করেছি। সারণি থেকে দেখা যাচ্ছে যে, 2011-12 সাল থেকে 2014-15 সাল পর্যন্ত ভারতে অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়ের হার যথেষ্ট বেশি ছিল (জাতীয় আয়ের এক-তৃতীয়াংশের মতো)। তারপর অবশ্য সঞ্চয়ের হার কিছুটা কমেছে, যদিও তখনও তা 30 শতাংশের সামান্য বেশি।

সারণি 1.7

ভারতের স্থূল অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় (GDP-র শতকরা হিসাবে)
(2011-12 সিরিজ)

বছর	স্থূল অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়ের উৎসসমূহ			
	(1) পরিবার ক্ষেত্র	(2) বেসরকারি শিল্পক্ষেত্র	(3) সরকারি ক্ষেত্র	(4) মোট (= 1 + 2 + 3)
2011-12	23.6	9.5	1.5	34.6
2012-13	22.5	10.0	1.4	33.9
2013-14	20.3	10.7	1.0	32.1
2014-15	19.6	11.7	1.0	32.2
2015-16	18.0	11.9	1.2	31.1
2016-17	17.1	11.5	1.7	30.3
2017-18	17.2	11.6	1.7	30.5
2018-19	18.2	10.4	1.5	30.1

টীকা : দশমিকের round off করার জন্য মোট সঞ্চয়ের হার তিনটি ক্ষেত্রের যোগফল থেকে সামান্য পৃথক হতে পারে।

সূত্র : Economic Survey, 2017-18, Government of India

সারণি থেকে দেখা যাচ্ছে যে ভারতের স্থূল অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়ে পরিবার ক্ষেত্রে অবদান সবচেয়ে বেশি। অবশ্য এই ক্ষেত্রের অবদানও 2013-14 সালের পর থেকে ক্রমাগত কমেছে। তবুও এই ক্ষেত্রের অবদান মোট সঞ্চয়ের 57 শতাংশের মতো। আর বেসরকারি কোম্পানি ক্ষেত্রের অবদান 2015-16 সাল থেকে বাড়েনি। এই অবদান মোটামুটি 11.5 শতাংশের কাছাকাছি বা মোট সঞ্চয়ের হারের 38 শতাংশের মতো। আর ভারতের স্থূল অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়ে সরকারি ক্ষেত্রের অবদান খুবই নগণ্য — GDP-র গড় বার্ষিক 1.5 শতাংশের মতো। এটি মোট অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়ের 5 শতাংশের মতো। সুতরাং, দেখা যাচ্ছে, ভারতের মোট অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়ে পরিবার ক্ষেত্রের ভূমিকা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। অবশ্য এই ক্ষেত্রের অবদানও দিন দিন কমেছে। 2003-04 সালে দেশের অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়ের প্রায় 80 শতাংশ এই ক্ষেত্র থেকে আসত (2004-05 সালের ভিত্তি বছর অনুযায়ী)। 2017-18 সালে দেশের স্থূল অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়ে পারিবারিক ক্ষেত্রের অবদান 57 শতাংশে নেমে আসে (2012-13 সালের নতুন সিরিজ অনুযায়ী)।

ভারতের স্থূল অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়ের হার বিবেচনা করলে আমরা এ সম্পর্কে দু'একটি মন্তব্য করতে পারি। (i) ভারতে বর্তমান স্থূল অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়ের হার 30 শতাংশের মতো। অর্থনীতিবিদ লুইস মনে

করেন যে, এই সঞ্চয়ের হার কোনো দেশের স্বয়ংচালিত উন্নয়নের পক্ষে যথেষ্ট। (ii) দেশের মোট সঞ্চয়ে সরকারি ক্ষেত্রের অবদান নগণ্য। ভারতে সরকার 1991 সালে উদারীকরণের ও বেসরকারিকরণে কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। ফলে ভারতীয় অর্থনীতিতে সরকারি ক্ষেত্রের গুরুত্ব দিন দিন কমছে। ফলে আগামী দিনগুলিতে ভারতের মোট সঞ্চয়ে সরকারি ক্ষেত্রের অবদান আরো কমবে বলে ধরা যেতেই পারে। (iii) আমরা আগেই বলেছি যে, ভারতের মোট সঞ্চয়ে পরিবার ক্ষেত্রের অবদান সর্বাধিক (57 শতাংশের মতো)। তবে এই ক্ষেত্রের অবদানও ধীরে হলেও কমছে। (iv) ভারতের মোট অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়ে বেসরকারি ক্ষেত্রের অবদান ধীরে হলেও বাড়ছে। 1991 সালে উদারীকরণের নীতি গ্রহণ করার পর বেসরকারি শিল্পক্ষেত্রের দিন দিন প্রসার ঘটছে। ফলে আগামী দিনে এই বেসরকারি ক্ষেত্রের অবদান দেশের মোট সঞ্চয়ে বাড়বে বলেই মনে হয়।

১.৯ ভারতে বিনিয়োগ বা মুলধন গঠনের গতিপ্রকৃতি

বিনিয়োগ বলতে কোনো দেশের মূলধন ভাণ্ডারের নিট সংযুক্তিকে বোঝায়। মূলধন ভাণ্ডারের বৃদ্ধিকেই মূলধন গঠন বলে। বিনিয়োগের মাধ্যমেই এই মূলধন গঠন হয়ে থাকে। মূলধন গঠন ও বিনিয়োগ তাই সমার্থক। মূলধন গঠনকেই বলে বিনিয়োগ। বিনিয়োগ বা মূলধন গঠন দু'প্রকারের : একটি হল স্থূল বিনিয়োগ বা স্থূল মূলধন গঠন এবং অপরটি হল নিট বিনিয়োগ বা নিট মূলধন গঠন। স্থূল মূলধন গঠন বা স্থূল বিনিয়োগ থেকে মূলধনের ক্ষয়ক্ষতি বা অপচয় বাদ দিলে নিট মূলধন বা নিট বিনিয়োগ পাওয়া যায়। কোনো দেশের মূলধন গঠনের হারকে স্থূল জাতীয় অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের (Gross Domestic Product বা GDP) অংশ হিসাবে প্রকাশ করা হয়। আমরা 2.9 সারণিতে সাম্প্রতিক বছরগুলিতে স্থূল অভ্যন্তরীণ মূলধন গঠন বা স্থূল বিনিয়োগ দেখিয়েছি। মূলধন গঠন বা বিনিয়োগ তিন রকমের হতে পারে : সরকারি ক্ষেত্রের বিনিয়োগ, বেসরকারি ক্ষেত্রের বিনিয়োগ এবং মূল্যবান সম্পত্তিতে বিনিয়োগ। এই সারণিতে আমরা মূলধন গঠন বা বিনিয়োগের হারের পাশাপাশি সঞ্চয়ের হার এবং উভয়ের মধ্যে ব্যবধান বা পার্থক্য দেখিয়েছি। মূলধন গঠন বা বিনিয়োগ হল মূলধনের চাহিদার দিক, আর সঞ্চয় হল মূলধনের জোগানের দিক। সুতরাং, বিনিয়োগ ও সঞ্চয়ের পার্থক্য থেকে জানা যাবে আমাদের মূলধনের চাহিদার সাথে জোগানোর ব্যবধান কতটা। যদি সঞ্চয়ের তুলনায় বিনিয়োগ বেশি হয়, তাহলে সেই ব্যবধান বিদেশি সঞ্চয় (foreign saving) নির্দেশ করে। এটি আসলে বিদেশি ঋণ। এই বিদেশি ঋণের দ্বারাই কোনো দেশ তার বিনিয়োগের তুলনায় সঞ্চয়ের ঘাটতি পূরণ করে। আমাদের সারণি থেকে দেখা যাচ্ছে যে, 2011-12 থেকে 2018-19 সাল পর্যন্ত সঞ্চয়ের হার অপেক্ষা মূলধন গঠন বা বিনিয়োগের হার বেশি ছিল। ফলে ভারতকে বিনিয়োগ কর্মসূচি রূপায়ণ করতে বিদেশি মূলধনের বা ঋণের উপর নির্ভর করতে হয়েছে।

সারণি 1.8

ভারতের স্থূল অভ্যন্তরীণ মূলধন গঠন (বিনিয়োগ) এবং স্থূল অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়
GDP-র শতকরা হিসাবে (2011-12 সিরিজ)

বছর	স্থূল অভ্যন্তরীণ মূলধন গঠন (বিনিয়োগ)				স্থূল অভ্যন্তরীণ	সঞ্চয়-
	সরকারি ক্ষেত্র (1)	বেসরকারি শিল্পক্ষেত্র (2)	মূল্যবান সম্পত্তি (3)	মোট (4 = 1+2+3)	সঞ্চয় (5)	বিনিয়োগ পার্থক্য (6 = 5 – 4)
2011-12	7.5	29.2	2.9	39.6	34.6	– 5.0
2012-13	7.2	28.4	2.8	38.3	33.9	– 4.4
2013-14	7.1	25.5	1.4	34.0	32.1	– 1.9
2014-15	7.1	25.5	1.7	34.3	32.2	– 2.1
2015-16	7.6	23.1	1.5	32.1	31.1	– 1.0
2016-17	7.1	22.1	1.1	30.2	30.3	(+) 0.1
2017-18	7.2	22.4	1.3	30.9	30.5	– 0.4
2018-19	7.2	23.4	1.1	31.7	30.1	– 1.6

টীকা : দশমিকের round off করার জন্য মোট হিসাব সামান্য পৃথক হতে পারে।

সূত্র : Economic Survey, 2018-19, Government of India

সারণি 1.8 থেকে কয়েকটি বিষয় লক্ষ করা যেতে পারে। সংক্ষেপে সেগুলি হল :

(i) 2011-12 সালে ভারতে স্থূল অভ্যন্তরীণ মূলধন গঠনের হার ছিল সর্বাধিক (36.9 শতাংশ)। এরপর মূলধন গঠনের হার ক্রমাগত কমেছে। 2016-17 থেকে 2018-19 সময়কালে তা GDP-র শতাংশ হিসাবে মোটামুটি 30-এ নেমে আসে।

(ii) ভারতের শেষ তথা দ্বাদশ পরিকল্পনা কালে (2012-17) মূলধন গঠনের হার একাদশ পরিকল্পনার (2007-12) তুলনায় কিছুটা কম ছিল। তবে অনাপেক্ষিক বিচারে এই হার ছিল যথেষ্ট বেশি (30 শতাংশের কিছু বেশি)।

(iii) 1950-51 সাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত ভারতের অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় ও বিনিয়োগের হার যথেষ্ট বেড়েছে। কিন্তু ভারতের জাতীয় আয় সেই অনুপাতে বাড়েনি। এটা একটা প্রহেলিকা বা বিরোধাভাস। আমরা পরের বিভাগে এটা নিয়ে বিশদে আলোচনা করেছি।

(iv) 1950-51 সালের পর থেকে প্রায় সমস্ত বছরেই ভারতের অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়ের হারের তুলনায় বিনিয়োগ বা মূলধন গঠনের হার বেশি ছিল। এই ব্যবধান বা ফাঁক পূরণ করতে ভারতকে বিদেশি মূলধনের উপর নির্ভর করতে হয়েছে। GDP-র শতাংশ হিসাবে বিদেশি মূলধনের পরিমাণ না বাড়লেও মোট বিদেশি মূলধনের পরিমাণ বেড়েছে।

ভারতে উচ্চহারে সঞ্চয় ও নিম্নহারে প্রসার বা বৃদ্ধির আপাত বিরোধিতা

অধ্যাপক হ্যারোড (Harrod) এবং অধ্যাপক ডোমার-এর (Domar) মতে, কোনো দেশের সঞ্চয়ের হারকে মূলধন-উৎপন্নের অনুপাত (capital output ratio) দিয়ে ভাগ করলে সেই দেশের জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার পাওয়া যায়। যদি আমরা সঞ্চয়ের হারকে s দ্বারা প্রকাশ করি এবং মূলধন-উৎপন্নের অনুপাতকে v দ্বারা চিহ্নিত করি, তাহলে উন্নয়নের হার বা g হল, $g \quad \frac{s}{v}$ অর্থাৎ জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার বা প্রসার হার = । এটিই হ্যারোড-ডোমার প্রসার মডেলের মূলকথা। এখন, যদি আমরা কোনো দেশের মূলধন-উৎপন্নের অনুপাতকে স্থির বলে ধরি, তাহলে ওই দেশের সঞ্চয় ও বিনিয়োগের হার যত বেশি হবে, প্রসার বা উন্নয়নের হারও তত বেশি হবে। সুতরাং, দেখা যাচ্ছে যে, অর্থনৈতিক প্রসারের (economic growth) জন্য প্রয়োজন সঞ্চয়ের বৃদ্ধি এবং সেই সঞ্চয়ের উৎপাদনশীল কাজে ব্যবহার। ভারতের ক্ষেত্রে এরূপ ঘটেছে কিনা তা দেখা যাক।

ভারতের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে, 1990-91 সাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত ভারতের অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়ের হার গড়ে GDP-র 30 শতাংশের মতো। যদি মূলধন-উৎপন্নের অনুপাতের মান 4 ধরা হয়, তাহলে ভারতের জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার হওয়া উচিত 7.5 শতাংশ (30 শতাংশ ÷ 4)। কিন্তু ওই সময়কালে ভারতের জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার গড়ে বার্ষিক 5.5 শতাংশের মতো। অর্থাৎ ভারতের সঞ্চয় ও বিনিয়োগের হার যথেষ্ট বাড়লেও তা জাতীয় আয় বৃদ্ধির হারে প্রতিফলিত হয়নি। সঞ্চয় ও বিনিয়োগের হার অনুপাতে জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার কম হয়েছে। একেই ভারতীয় অর্থনীতিতে উচ্চহারে সঞ্চয় ও মূলধন গঠন এবং নিম্নহারে প্রসারের প্রহেলিকা (ধাঁধা) বা আপাত বিরোধিতা (paradox of high saving rate and low growth rate in Indian economy) বলে অনেকে অভিহিত করেছেন।

বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ এই প্রহেলিকা বা ধাঁধাকে বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। তাঁদের যুক্তিগুলিকে সংক্ষেপে নিম্নলিখিত ভাবে লিপিবদ্ধ করা যেতে পারে :

(i) সঞ্চয়ের হার বাড়লেই উৎপাদনের হার বাড়ে না। উৎপাদন বাড়তে হলে সঞ্চয় বাড়তে হয়। কিন্তু সেটি উৎপাদন বাড়ার প্রয়োজনীয় (necessary) শর্ত, পর্যাপ্ত (sufficient) শর্ত নয়। পর্যাপ্ত শর্তটি হল : সঞ্চয়কে উৎপাদনশীল কাজে বিনিয়োগ করতে হবে। আমরা জানি যে, ভারতের মোট সঞ্চয়ের বড় অংশ আসে পরিবার ক্ষেত্র থেকে। পারিবারিক সঞ্চয়ের একটা

বড় অংশ ব্যয়িত হয় অলংকার এবং বাস্তুজমি কিনতে। এধরনের বিনিয়োগ উৎপাদনশীল বিনিয়োগ নয়। এসবের ফলে দেশের উৎপাদন বাড়ে না।

(ii) ভারতের সঞ্চয় ও বিনিয়োগ সম্পর্কে তথ্য সরবরাহ করে কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান সংস্থা (Central Statistical Organisation বা CSO)। এই সংস্থা সঞ্চয় ও বিনিয়োগ সম্পর্কে যে তথ্য প্রদান করে, তা অনেক ক্ষেত্রেই অতিরঞ্জিত বলে অধ্যাপক মিহির রক্ষিত মনে করেন। তাঁর মতে, বাস্তবে ভারতে সঞ্চয় ও বিনিয়োগের হার অতটা বেশি নয়। এজন্য ভারতে জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার কম।

(iii) আমাদের মনে রাখা দরকার যে, মূলধন গঠনের একটা অংশ হল মজুত ভাণ্ডার বৃদ্ধি (inercase in inventory)। যদি মজুত ভাণ্ডার বাড়ে, তাহলে গণিতের হিসাবে বিনিয়োগ বাড়ে। কিন্তু মজুত ভাণ্ডার বৃদ্ধি কখনোই উৎপাদনশীল বিনিয়োগ নয়। ফলে মজুত ভাণ্ডার বাড়লে বিনিয়োগের হার বাড়ে বটে, কিন্তু উৎপাদন বৃদ্ধির হার বাড়ে না। কেউ কেউ মনে করেন যে, ভারতে স্বল্প হারে জাতীয় আয় বৃদ্ধির এটিও একটি কারণ।

(iv) কোনো কোনো অর্থনীতিবিদের মতে (যেমন, অধ্যাপক সুখময় চক্রবর্তী, অধ্যাপক কে. এল. রাজ প্রমুখ), পরিকল্পনাকালে ভারতে মূলধন-উৎপন্নের অনুপাত (v) বেড়েছে। এর ফলে আয় বৃদ্ধির হার (= সঞ্চয় অনুপাত ÷ মূলধন-উৎপন্ন অনুপাত) কমেছে। অনেকে অবশ্য এই যুক্তিটির বিরোধিতা করেছেন।

(v) ভারতের বিনিয়োগের একটা বড়ো অংশ হল সরকারি বিনিয়োগ। অনেকের মতে, সরকারি অনেক বিনিয়োগই ত্রুটিপূর্ণ। উপযুক্ত সময়ে ও উপযুক্ত ক্ষেত্রে সরকারি বিনিয়োগ অনেক সময়ই হয় না। ভারতে সরকারি বিনিয়োগ দক্ষভাবে ব্যবহৃত (efficiently utilised) হয় না। এর ফলে জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার বাড়েনি।

(vi) বেসরকারি বিনিয়োগের একটা বড়ো অংশ ধনীদের ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়েছে। এই দ্রব্যগুলির অধিকাংশই বিলাস দ্রব্য। এ ধরনের বিনিয়োগের ফলে ভবিষ্যতে আয় ও কর্মসংস্থান বাড়ে না।

(vii) ভারত সরকার অনেক সময় কলকারখানায় এবং বিভিন্ন মূলধন প্রকল্পে বড়ো আকারের বিনিয়োগ করেছে। কিন্তু উপযুক্ত ব্যবস্থাপনা ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার অভাবে সেগুলি অনেক সময়ই অর্ধ-সমাপ্ত অবস্থায় পড়ে থেকেছে। ফলে সেগুলি থেকে কোনো প্রতিদান পাওয়া যায়নি।

(viii) দ্বিতীয় পরিকল্পনার শুরু (1956) থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত ভারতে দু'একটি বছর বাদ দিলে দামস্তর ক্রমাগত বেড়েছে অর্থাৎ মুদ্রাস্ফীতি ঘটেছে। মুদ্রাস্ফীতির ফলে সঞ্চয় ও বিনিয়োগের প্রকৃত মূল্য (= আর্থিক মূল্য ÷ দামস্তর) কমে যায়। সেক্ষেত্রে অর্থের অঙ্কে বিনিয়োগ বাড়লেও

প্রকৃত অঙ্কে (real value) তা নাও বাড়তে পারে, এমনকি কমে যেতেও পারে। সেক্ষেত্রে উন্নয়নের হার না বেড়ে তা উল্টে কমে যাবে।

(ix) স্বল্পোন্নত দেশের সঙ্গে উন্নত দেশের বাণিজ্য ঘটলে বাণিজ্য হার স্বল্পোন্নত দেশের প্রতিকূলে চলে যায় বলে প্রেবিশ ও সিঙ্গার মনে করেন (Prebisch-Singer Thesis)। এর ফলে স্বল্পোন্নত দেশের লেনদেন ব্যালান্সে ঘাটতি দেখা দেয়। এই ঘাটতি মেটাতে দেশটির সঞ্চয়ের একটা বড়ো অংশ ব্যয় হয়ে যায়। ফলে সঞ্চয় বাড়লেও স্বল্পোন্নত দেশটির উন্নয়নের হার বাড়ে না। ভারতের ন্যায় উন্নয়নশীল কিন্তু স্বল্পোন্নত দেশের ক্ষেত্রে এমনটাই ঘটেছে বলে অনেক অর্থনীতিবিদ মনে করেন।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, ভারতে উচ্চ সঞ্চয়ের হার এবং স্বল্প প্রসারের হারের পিছনে অনেক কারণ আছে। অধ্যাপক জগদীশ ভগবতী মনে করেন যে, সঞ্চয় অনুযায়ী জাতীয় আয় না-বাড়ার পিছনে প্রধান কারণ হল ভারতীয় অর্থনীতির ক্রমহ্রাসমান দক্ষতা বা ক্রমহ্রাসমান উৎপাদনশীলতা। তাঁর মতে, ভারতের সরকারি ক্ষেত্রের অদক্ষতা এবং আমলাতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণের ফলে দেশটি বিনিয়োগ অনুযায়ী প্রতিদান পায়নি। অবশ্য 2010-এর দশকে সরকারি ক্ষেত্র অনেকটাই সংকুচিত হয়েছে এবং অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণও অনেকটাই শিথিল করা হয়েছে। ফলে 2020-র দশকে ভারতে জাতীয় আয় 7.5 শতাংশের কাছাকাছি থাকবে বলে মনে হয়। সেক্ষেত্রে উচ্চ সঞ্চয় ও নিম্ন প্রসার হারের প্রহেলিকা আর থাকবে না বলে আশা করা যেতে পারে।

১.১০ সারাংশ

(১) **ভারতীয় অর্থনীতির কাঠামোগত রূপান্তর ও মতামত :** বিভিন্ন দেশের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে নিম্ন উৎপাদনশীলতা ক্ষেত্র থেকে উচ্চ উৎপাদনশীলতা ক্ষেত্রে যে কাঠামোগত রূপান্তর হয়েছে তা উচ্চহারে অর্থনৈতিক বিকাশ এবং উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান তৈরী করতে সমর্থ হয়েছে। এ বিষয়ে অর্থনীতিবিদ Lewis, Kaldor, Kuznets তাদের মতামত দিয়েছেন। রাষ্ট্রসংঘ উন্নত ও স্বল্পোন্নত দেশের মাথাপিছু বাস্তব আয়ের মধ্যে তুলনা করে বিভিন্ন প্রকার উন্নত, স্বল্পোন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশের সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। বিশ্বব্যাঙ্ক মাথাপিছু স্থূল জাতীয় আয়ের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন আয়ভুক্ত দেশের শ্রেণীবিভাগ করেছেন।

প্রতিটি বিকাশমান দেশের স্বতন্ত্র ইতিহাস। ভৌগলিক অবস্থা ও আর্থসামাজিক কাঠামোর মধ্যে পার্থক্য আছে। তথাপি, এমন কতকগুলি মৌলিক বৈশিষ্ট্য আছে যেগুলির দ্বারা স্বল্পোন্নত বা বিকাশমান দেশের সংজ্ঞাও বর্ণনা করা যায়।

(২) ভারতীয় অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য—

- মাথাপিছু আয়ের

- কৃষির প্রাধান্য
- আয় ও সম্পদ বন্টনে বৈষম্য
- জনসংখ্যার চাপ
- মূলধনের স্বল্পতা
- দ্বৈত অর্থব্যবস্থা

(৩) **স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে ভারতে জাতীয় ও মাথাপিছু আয়ের গতিপ্রকৃতি :** ভারতে জাতীয় ও মাথাপিছু আয়ের গতিপ্রকৃতি দুটি পর্ব বা কালপর্যায়ে ভাগ করে আলোচনা করা যেতে পারে। প্রথম পর্বটি হল 1951-1980 সময়কাল এবং দ্বিতীয় পর্বটি হল 1981 থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত। প্রথম পর্ব বা সময়কালটি হল ভারতীয় অর্থনীতিতে নিয়ন্ত্রণের যুগ। এই সময়ে উন্নয়নের যে কৌশল গ্রহণ করা হয়েছিল তাকে বলা হয় অন্তর্মুখী উন্নয়ন কৌশল। এর মূল কথা হল আমদানি নিয়ন্ত্রণ করে দেশের মধ্যেই আমদানি পরিবর্ত দ্রব্য তৈরি করা। 1951-80 এই সময়কালে নিট জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার ছিল 3.5 শতাংশের মতো। অধ্যাপক রাজ কৃষ্ণ এই নিম্ন আয় বৃদ্ধির হারকে 'উন্নয়নের হিন্দু হার' বলে অভিহিত করেছেন। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে প্রকৃত মাথাপিছু আয় আরো কম হারে বাড়ে। নিট জাতীয় আয় বৃদ্ধির কম হারে বাড়ার পিছনে বাহ্যিক কারণগুলি হল : (i) 1965 থেকে 1967 এবং 1971 থেকে 1973 সাল পর্যন্ত খরা, ii) 1961, 1965 এবং 1971 সালে প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে যুদ্ধ, (iii) পরিকাঠামোর অভাব, (iv) আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের অস্বাভাবিক দাম বৃদ্ধি প্রভৃতি। আয় বৃদ্ধির মন্থরতার পিছনে অভ্যন্তরীণ কারণগুলি হল : (i) আমলাতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ, (ii) কৃষির ব্যর্থতা, (iii) আয় বৈষম্যর ফলে দেশে শিল্পজাত দ্রব্যসামগ্রীর অপ্রতুল চাহিদা, (iv) মূলধন-নিবিড় বিদেশি প্রযুক্তি গ্রহণ, (v) সরকারি ক্ষেত্রের ব্যর্থতা প্রভৃতি।

দ্বিতীয় পর্ব অর্থাৎ 1981 থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত হল ভারতের অর্থনীতিতে সংস্কারের যুগ। বিশেষত 1991 সালে নতুন শিল্পনীতি এবং নতুন আর্থিক নীতি প্রবর্তিত হয়। এর মূলকথা হল উদারীকরণ, বেসরকারিকরণ এবং বিশ্বায়ন বা ভুবনীকরণ, এই সময়কালে জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার বাড়ে। 1980 থেকে 2000 সাল পর্যন্ত প্রকৃত জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার 5 শতাংশের বেশি ছিল। আর 2001 থেকে 2011 সালের মধ্যে জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার ছিল 8 শতাংশের মতো। তারপর অবশ্য জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার কিছুটা নেমে আসে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে নিট মাথাপিছু আয় এর থেকে কম হারে (মোটামুটি জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার থেকে 1.5 শতাংশ কম) বেড়েছে। আর কোভিড মহামারির ফলে 2020-21 সালে ভারতে জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার ছিল ঋণাত্মক (–7.9 শতাংশ)। এর পরের বছর অবশ্য ভারতীয় অর্থনীতি আবার ঘুরে দাঁড়ায়। কোভিড-এর প্রথম বছরে (2020-21) জাতীয় আয় কমে যাওয়ার

অন্যতম কারণ হল দীর্ঘ সময় ধরে ভারতে লকডাউন (68 দিন) ঘোষণা। ওই সময় ভারতীয় অর্থনীতির যাবতীয় কর্মকাণ্ড বন্ধ ছিল।

(৪) **ভারতের জাতীয় উৎপন্নের কাঠামোগত পরিবর্তন :** কোনো দেশের অর্থনীতিকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয় : প্রাথমিক ক্ষেত্র, মাধ্যমিক ক্ষেত্র এবং সেবামূলক ক্ষেত্র। ক্লার্ক-ফিশার তত্ত্বের মতে, অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে সাথে জাতীয় আয়ে প্রাথমিক ক্ষেত্রের অবদান কমতে থাকে এবং মাধ্যমিক ও সেবামূলক ক্ষেত্রের অবদান বাড়তে থাকে। ভারতের জাতীয় আয়ের ক্ষেত্রগত বণ্টনের পরিবর্তনেও এই ধরনটি লক্ষ করা যায়। 1950-51 সাল থেকে ভারতে প্রাথমিক ক্ষেত্র থেকে উদ্ভূত জাতীয় আয়ের অংশ ক্রমাগত কমে আসছে এবং মাধ্যমিক ও সেবামূলক ক্ষেত্র থেকে উদ্ভূত জাতীয় আয়ের অংশ ক্রমাগত বাড়ছে। সুতরাং, ক্লার্ক-ফিশার তত্ত্ব অনুসরণ করে বলা যায় যে, ভারত অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে অগ্রসর হয়েছে। তবে এই কাঠামোগত পরিবর্তন খুব ধীর গতিতে হয়েছে।

(৫) **ভারতের জাতীয় আয়ের বিভিন্ন ক্ষেত্রগত বন্টনের বিকাশ ও তাৎপর্য :** 1950-51 সালের পর থেকে ভারতের জাতীয় আয়ে প্রাথমিক ক্ষেত্রের গুরুত্ব ক্রমাগত কমেছে এবং মাধ্যমিক ও সেবামূলক ক্ষেত্রের অবদান ক্রমাগত বেড়েছে। ফলে ক্লার্ক-ফিশার তত্ত্ব অনুসরণ করে অনেক ভাবতে পারেন যে, ভারতে উল্লেখযোগ্য হারে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটেছে। কিন্তু বাস্তব অবস্থা তা নয়। ভারতের জাতীয় আয়ে ক্ষেত্রগত বন্টনের পরিবর্তন কেবলমাত্র উৎপন্ন কাঠামোয় ঘটেছে, জীবিকা কাঠামোর বিশেষ পরিবর্তন ঘটেনি। এটি একদিকে ভারতীয় কৃষির কম উৎপাদনশীলতাকে প্রকাশ করে এবং অন্যদিকে, এটি ভারতীয় শিল্পক্ষেত্রের অগ্রগতির মন্থরতা নির্দেশ করে। তা ছাড়া, সেবা ক্ষেত্রের প্রসার সর্বদাই অর্থনৈতিক উন্নয়নের পরিচায়ক নয়।

(৬) **ভারতে সঞ্চয়ের গতি প্রকৃতি ও বিনিয়োগের গতি প্রকৃতি :** 1950-51 থেকে ভারতে সঞ্চয়ের হার যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। সঞ্চয়ের উৎস তিনটি : পরিবার, বেসরকারি শিল্পক্ষেত্র এবং সরকারি শিল্পক্ষেত্র। ভারতে বর্তমানে জাতীয় আয়ের মোটামুটি 31 শতাংশ হল সঞ্চয়ের হার। এই সঞ্চয়ে পারিবারিক ক্ষেত্রের অবদান সর্বাধিক। পাশাপাশি, সরকারি ক্ষেত্রের অবদান নগণ্য।

কোনো দেশে বিনিয়োগের মাধ্যমেই মূলধন গঠন হয়ে থাকে। বিনিয়োগ তিনটি আকারের হতে পারে : সরকারি ক্ষেত্রে বিনিয়োগ, বেসরকারি ক্ষেত্রে বিনিয়োগ এবং মূল্যবান সম্পত্তিতে বিনিয়োগ। স্বাধীনতা-পরবর্তী কালে ভারতে মূলধন গঠনের বা বিনিয়োগের হারও বেড়েছে। অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় দিয়ে তাই বিনিয়োগের সবটা পূরণ করা যায়নি। বিদেশি সঞ্চয় বা বিদেশি মূলধন দিয়ে এই ব্যবধান পূরণ করা যায়নি। বিদেশি সঞ্চয় বা বিদেশি মূলধন দিয়ে এই ব্যবধান পূরণ করা হয়েছে। ফলে ভারতে বিদেশি মূলধনের পরিমাণ বেড়েছে। বর্তমান উদারীকরণের যুগে তা আরো বাড়বে বলেই মনে হয়।

৭. ভারতে উচ্চ হারে সঞ্চয় ও নিম্ন হারে প্রসার বা বৃদ্ধির আপাত বিরোধিতা : হ্যারোড এবং ডোমারের মতে, কোনো দেশের সঞ্চয়ের হারকে মূলধন-উৎপন্নের অনুপাত দিয়ে ভাগ করলে সেই দেশের প্রসারের হার জানা যায়। সুতরাং, মূলধন-উৎপন্নের অনুপাত অপরিবর্তিত থাকলে সঞ্চয় ও বিনিয়োগের হার যত বেশি হবে, দেশটির উন্নয়নের হারও তত বেশি হবে। কিন্তু ভারতের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে, ভারতে সঞ্চয় ও বিনিয়োগের হার যথেষ্ট বেড়েছে, কিন্তু জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার বিশেষ বাড়েনি। অনেক অর্থনীতিবিদ একে ভারতে উচ্চ হারে সঞ্চয় ও নিম্ন হারে প্রসার বা বৃদ্ধির আপাত বিরোধিতা বা প্রহেলিকা বলে উল্লেখ করেছেন। এই প্রহেলিকা বা আপাত বিরোধিতার পিছনে কয়েকটি কারণ হল : (i) সঞ্চয়ের অনুৎপাদনশীল বিনিয়োগ, (ii) সঞ্চয়ের হার কিছুটা অতিরঞ্জিত, (iii) মূলধন-উৎপন্নের অনুপাত বৃদ্ধি, (iv) ত্রুটিপূর্ণ সরকারি বিনিয়োগ, (v) মুদ্রাস্ফীতির ফলে প্রকৃত বিনিয়োগের মূল্য হ্রাস, (vi) বৈদেশিক বাণিজ্যে প্রতিকূল হার প্রভৃতি।

১.১১ অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত উত্তরের প্রশ্নাবলী :

১. রাষ্ট্রসংঘের মতে স্বল্পোন্নত দেশ কাহাকে বলে?

২. বিশ্বব্যাঙ্ক বিশ্বের দেশগুলিকে তাদের আয় অনুযায়ী কয়টি শ্রেণীতে ভাগ করিয়াছে এবং কি কি?

৩. ভারতীয় অর্থনীতির দুইটি প্রধান বৈশিষ্ট্য কি কি?

৪. কোনো দেশের প্রাথমিক ক্ষেত্র বলিতে কি বোঝায়?

৫. কোনো দেশের মাধ্যমিক ক্ষেত্র বলতে কি বোঝায়?

৬. কোনো দেশের সেবা ক্ষেত্র বলতি কি বোঝায়?

৭. কোনো দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো কাকে বলে?

৮. সঞ্চয়ের উৎস কি কি?

৯. মূলধন গঠন বা বিনিয়োগ বলতে কি বোঝায়?

১০. ভারতে এখন সঞ্চয়ের হার কত?

মাঝারি দৈর্ঘ্যের উত্তরের প্রশ্নাবলী :

১. কোনো দেশের জাতীয় আয়ে ক্ষেত্রগত পরিবর্তনের তাৎপর্য কী?

২. পরিকল্পনাকালে ভারতে জীবিকা কাঠামোর পরিবর্তন বর্ণনা করো।

৩. ভারতীয় অর্থনীতিতে সেবা ক্ষেত্রচালিত উন্নয়ন বলতে কী বোঝানো হচ্ছে?

৪. ভারতের জাতীয় আয়ে সেবাক্ষেত্রের অবদান বৃদ্ধির দুটি প্রধান কারণ উল্লেখ কর।
৫. 1950-51 সালের পর ভারতের অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়ের হার বর্ণনা কর।
৬. স্বাধীনতার পর ভারতে মূলধন গঠন বা বিনিয়োগ কীরূপ হয়েছে বলে তুমি মনে কর?
৭. ভারতে সঞ্চয়ের হার বেশি হওয়া সত্ত্বেও আয় বৃদ্ধির হার কম কেন?
৮. 1951 থেকে 1980 সময়কালে ভারতের শিল্পক্ষেত্রের ভূমিকা ব্যাখ্যা কর।
৯. 1981 সাল থেকে বর্তমান সময়কাল পর্যন্ত কোন শিল্পনীতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এবং তাৎপর্যপূর্ণ তা ব্যাখ্যা কর।
১০. ভারতের জাতীয় আয়ের ক্ষেত্রগত বন্টনের পরিবর্তনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।

দীর্ঘ উত্তরের প্রশ্নাবলী

১. পরিকল্পনাকালে ভারতে জাতীয় মাথাপিছু আয়ের গতিপ্রকৃতি বর্ণনা কর।
২. 1950-51 সালের পর ভারতে জাতীয় আয়ের ক্ষেত্রগত বণ্টনের পরিবর্তন আলোচনা কর।
৩. ভারতে সাম্প্রতিক সেবাক্ষেত্রের প্রসার কি উন্নয়নের নির্দেশক? তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও।
৪. ভারতের জাতীয় আয়ে সেবা ক্ষেত্রের অবদান বৃদ্ধির কারণগুলি বর্ণনা কর।
৫. ভারতে উচ্চ হারে সঞ্চয় ও নিম্ন হারে উন্নয়নের আপাত বিরোধিতা তুমি কীভাবে ব্যাখ্যা করবে।

সঠিক উত্তর নির্বাচনের প্রশ্নাবলী (Multiple Choice Questions MCQ)

১. ভারতীয় অর্থনীতির একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো—
(ক) মাথাপিছু আয়ের স্বল্পতা (খ) উচ্চহারে মাথাপিছু আয়
(গ) মধ্যমানের মাথাপিছু আয় (ঘ) কোনোটিই নয়

২. কোনো দেশের প্রাথমিক ক্ষেত্র বলতে কি বোঝ?
(ক) কৃষিক্ষেত্র (খ) শিল্পক্ষেত্র
(গ) সেবাক্ষেত্র (ঘ) কোনোটিই নয়

৩. কোনো দেশের মাধ্যমিক ক্ষেত্র বলতে কি বোঝ?
(ক) সেবাক্ষেত্র (খ) কৃষিক্ষেত্র
(গ) শিল্পক্ষেত্র

৪. 1991 সালে ভারত সরকার যে আর্থিক নীতি গ্রহণ করেছে তার মূল কথা হলো—
(ক) উদারীকরণ (খ) বেসরকারীকরণ
(গ) বিশ্বায়ন (ঘ) (ক), (খ), (গ) সবগুলিই

৫. অদৃশ্য হাত (invisible hand) তত্ত্বটি কোন অর্থনীতিবিদের দ্বারা কথিত—

(ক) ডেভিড রিকার্ডো (খ) অ্যাডাম স্মিথ

(গ) আলফ্রেড মার্শাল (ঘ) কোনোটিই নয়

৬. ভারতে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কখন শুরু হয়?

(ক) 1956 সালে (খ) 1947 সালে

(গ) 1951 সালে (ঘ) কোনোটিই নয়

৭. স্বাধীনতা উত্তরকালে কোন ক্ষেত্রের অবদান ক্রমাগত বাড়ছে?

(ক) কৃষি ক্ষেত্র (খ) সেবামূলক ক্ষেত্র

(গ) শিল্প ক্ষেত্র (ঘ) কোনোটিই নয়

৮. সেবামূলক ক্ষেত্র কি?

(ক) কৃষি (খ) শিল্প

(গ) ব্যাঙ্ক, বীমা, পরিবহন, বাণিজ্য ইত্যাদি (ঘ) কোনোটিই নয়

৯. ভারতে অভ্যন্তরীণ সঞ্চয়ের উৎস কোনটি?

(ক) পরিবার ক্ষেত্র (খ) বেসরকারী শিল্প ক্ষেত্র

(গ) সরকারী ক্ষেত্র (ঘ) (ক), (খ), (গ) তিনটিই

১০. মূলধন গঠন কিসের মাধ্যমে হয়?

(ক) ভোগ (খ) সঞ্চয়

(গ) বিনিয়োগ (ঘ) কোনোটিই নয়

১.১২ গ্রন্থপঞ্জি

১. সরখেল, জয়দেব ও সেখ সেলিম (2022) : *ভারতীয় অর্থনীতি*, বুক সিন্ডিকেট প্রাইভেট লিমিটেড।

২. Puri, V. K. and S. K. Misra (2020) : *Indian Economy*, Himalaya Publishing House.

৩. Datt, Gaurav & Ashwani Mahajan (2020) : *Indian Economy*, S. Chand and Company Limited.

৪. সেখ সেলিম (2011) : *ভারতের পরিকল্পনা ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন*, গ্রন্থমিত্র, কলকাতা।

৫. অজয় কুমার নন্দী (2011) : *আধুনিক ভারতীয় অর্থনীতির রূপরেখা*, B. B. Kundu Grandsons.

একক – ২ ❑ ভারতীয় অর্থনীতিতে পেশাগত কাঠামো এবং কর্মসংস্থানের পরিবর্ত্তন

গঠন

২.১ উদ্দেশ্য

২.২ প্রস্তাবনা

২.৩ পেশাগত কাঠামো

২.৩.১ পেশাগত কাঠামো কি?

২.৩.২ পেশাগত কাঠামোর বিভিন্ন ধরণ

২.৪ কর্মসংস্থানের কাঠামো

২.৪.১ কর্মসংস্থানের কাঠামো কি?

২.৪.২ পেশাগত কাঠামোর বৈশিষ্ট

২.৪.৩ বৃটিশ যুগে পেশাগত কাঠামো

২.৪.৪ স্বাধীনতা পরে পেশাগত কাঠামো

২.৫ কর্মসংস্থানের পরিবর্ত্তন

২.৬ পেশাগত কাঠামোর প্রবণতা

২.৭ পেশাগত কাঠামো এবং কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রগত বিভাজন

২.৮ পেশাগত কাঠামোর এবং কর্মসংস্থানের উন্নতিকল্পে ব্যবস্থা

২.৯ সারাংশ

২.১০ অনুশীলনী

২.১১ গ্রন্থপঞ্জি

২.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে ছাত্রছাত্রীরা জানতে পারবে

- ভারতে পেশাগত কাঠামোর ধরণ কিরূপ

- কাঠামোর পরিবর্তন এবং কর্ম নিয়োগ এর ধরণ কিরূপ
- বৃটিশ যুগে এবং স্বাধীনতার পরবর্ত্তীকালে পেশাগত কাঠামোর ধরণ কেমন ছিল
- পেশাগত কাঠামো এবং কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রগত বিভাজন কিরূপ

২.২ প্রস্তাবনা

Adam Smith তাঁর বিখ্যাত Wealth of Nations (1776) বইয়ে উন্নয়নের এক পর্যায়ক্রম উল্লেখ করেছেন। তিনি মন্তব্য করেছেন যে, উন্নতির সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী প্রতিটি বিকাশমান দেশে মূলধন প্রথমে কৃষিকার্যে, তারপর কৃষি থেকে শিল্পক্ষেত্রে এবং সবশেষে বৈদেশিক বাণিজ্যে নিয়োজিত হয়। তুলনামূলক ভাবে সাম্প্রতিক কালে Colin Clark (1957) কোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সেই দেশের জীবিকা কাঠামোর মধ্যে এক গুরুত্বপূর্ণ পরিসংখ্যানগত সম্পর্ক দেখিয়েছেন। ক্লার্ক-এর মতে, অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে সাথে শ্রমেরও পুনর্বণ্টন ঘটে। শ্রম প্রথমে প্রাথমিক ক্ষেত্র (কৃষি, বন, মৎস্যচাষ, খনি প্রভৃতি) থেকে মাধ্যমিক ক্ষেত্রে (শিল্প, নির্মাণকার্য, গ্যাস ও জলসরবরাহ প্রভৃতি) এবং সবশেষে এই দুই ক্ষেত্র থেকে তৃতীয় বা সেবা ক্ষেত্রে (ব্যাঙ্কিং, বাণিজ্য, বিমা প্রভৃতি) গমন করে। তিনি এ ধরনের সম্পর্ক আবিষ্কারের কৃতিত্ব দিয়েছেন Sir William Petty-কে এবং বিষয়টিকে Petty's Law (1690) বলে উল্লেখ করেছেন। কলিন ক্লার্কের সমসাময়িক লেখক হলেন A.G..B. Fisher (1895-1976)। তিনিও ক্লার্কের ন্যায় অনুরূপ সম্পর্কের কথা বলেছেন। এজন্য অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে জীবিকা কাঠামোর এই সম্পর্কের তত্ত্বকে একসাথে ক্লার্ক-ফিশার তত্ত্ব (Clark-Fisher Thesis) বলে। আমরা প্রথমে এই তত্ত্বের তাত্ত্বিক ভিত্তি আলোচনা করব। শ্রম শক্তিকে কৃষি থেকে শিল্পের স্থানান্তরের দ্বারা কীভাবে একটি স্বল্পোন্নত দেশের উন্নয়ন হতে পারে এবং সেই উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সমস্যাগুলোই বা কীরূপ, তা নিয়ে আলোচনা করেছেন পৃথক পৃথক ভাবে লুইস (Lewis) এবং নার্কস। এদের তত্ত্বও আমরা সংক্ষেপে বর্ণনা করব। আবার, ভারতের ন্যায় জনবহুল স্বল্পোন্নত দেশে কৃষি থেকে শিল্পে এই ধরনের শ্রম স্থানান্তরের ফলে নানা সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছেন হ্যারিস এবং টোডারো (Harris & Todaro)। এই সমস্যা ও তার সম্ভাব্য সমাধান নিয়েও আমরা আলোচনা করব। ভারতে শ্রম শক্তির ক্ষেত্রগত স্থানান্তর কীরূপ ঘটেছে, তাও বিবেচনা করা হবে। উন্নত দেশের সঙ্গে ভারতের এই শ্রম স্থানান্তরের পার্থক্য কোথায়, তাও বিশ্লেষণ করা হবে। সবশেষে, BRICS দেশগুলির (Brazil, Russia, India, China এবং South Africa) পাশাপাশি ভারতের শ্রম শক্তির স্থানান্তরের তুলনা করা হবে।

২.৩ পেশাগত কাঠামো

২.৩.১ পেশাগত কাঠামো কি?

কোনো একটি দেশের পেশাগত কাঠামো হলো কত শতাংশ কর্মক্ষম মানুষ অর্থনীতির বিভিন্ন জায়গায় নিয়োজিত আছে। বিভিন্ন ধরনের পেশা অনুসারে জনসংখ্যার বন্টনকে পেশাগত কাঠামো বলে। ভারতে বিভিন্ন ধরণের পেশা রয়েছে। পেশাগুলিকে সাধারণত প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং উচ্চতর শ্রেণীতে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়।

২.৩.২ পেশাগত কাঠমোর বিভিন্ন ধরণ

বিভিন্ন ধরণের পেশা অনুসারে জনসংখ্যার বন্টনকে পেশাগত কাঠামো বলা হয়। ভারতে পেশার বিশাল বৈচিত্র আছে। পেশাগুলিকে সাধারণত প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং উচ্চতর শ্রেণীতে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়।

(i) প্রাথমিক কার্যকলাপের মধ্যে রয়েছে কৃষি, পশুপালন, বনায়ন, মাছ ধরা, খনি এবং খনন ইত্যাদি।

(ii) মাধ্যমিক কার্যকলাপের মধ্যে রয়েছে উৎপাদন শিল্প, ভবন ও নির্মাণ কাজ ইত্যাদি।

(iii) তৃতীয় স্তরের কার্যকলাপের মধ্যে রয়েছে পরিবহন, যোগাযোগ, বাণিজ্য, প্রশাসন এবং অন্যান্য পরিষেবা। ভারতে জনসংখ্যার প্রায় ৬৪ শতাংশ কেবল কৃষিতে নিযুক্ত, মাধ্যমিক এবং তৃতীয় স্তরের উপর নির্ভরশীল জনসংখ্যার অনুপাত যথাক্রমে প্রায় ১৩ এবং ২০ শতাংশ। কিন্তু সম্প্রতি ক্রমবর্ধমান শিল্পায়ন এবং নগরায়ণের কারণে মাধ্যমিক এবং তৃতীয় স্তরের দিকে পেশাগত পরিবর্তন দেখা দিয়েছে।

২.৪ কর্মসংস্থানের কাঠামো

২.৪.১ কর্মসংস্থানের কাঠামো কি?

ভারতীয় অর্থনীতিতে কর্মসংস্থানের বা কর্ম নিয়োগের কাঠামো প্রাথমিক স্তর কৃষিতেই আবদ্ধ থাকে যদিও GDP তে এই স্তরের অবদান ক্রমশই হ্রাস পেয়েছে এবং সেবাক্ষেত্র একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মনিয়োগের সংস্থান হিসাবে রূপান্তরিত হচ্ছে। ইহা একটি কাঠামোগত পরিবর্ত্তন চিরাচরিত শিল্প থেকে আধুনিক জ্ঞানভিত্তিক সেবামূলক নিয়োগে। আবার মাধ্যমিক ক্ষেত্র বা শিল্প ক্ষেত্র এই রূপান্তর প্রক্রিয়ায় সহায়তা করছে তবে বেশ বাধার সম্মুখীন হয়ে।

২.৪.২ পেশাগত কাঠামোর বৈশিষ্ট্য

কয়েকটি বৈশিষ্ট্য হলো—

1. কৃষি হলো মূল পেশা, ভারতবর্ষে কৃষি হলো মূল পেশা, মোট জনসাধারণের প্রায় 66.7% কৃষিতে নিযুক্ত। প্রচ্ছন্ন বেকারত্ব খুবই বৃদ্ধি পেয়েছে। যার ফলে কৃষির উপর যে অত্যধিক চাপ তা কমানো খুব কঠিন হয়েছে।
2. শিল্পোন্নয়ন আশানুরূপ নয়—ভারতে 17% জনসংখ্যা শিল্পের উপর নির্ভরশীল। যেখানে আমেরিকায় 32%, ইংল্যান্ডে 42%, জাপানে 39%। কাজেই ভারত যে শিল্পের দিক থেকে বেশ পেছিয়ে আছে তা পরিষ্কার।
3. কৃষির উপর অতি নির্ভরশীলতা—মাথাপিছু আয় স্বল্প কারণ কৃষিই হল একমাত্র ভরসা এবং তাই প্রচ্ছন্ন বেকারত্ব খুবই প্রকট এই ক্ষেত্রে।
4. কৃষিতে নয়া কৌশল কেন ব্যবহার হয়—প্রান্তিক চাষী বেশী হওয়ার জন্য নয়া কৃষি কৌশল এর প্রয়োগ অত্যন্ত কম।
5. কৃষি শ্রমিক শতকরা হিসাবে অন্যান্যদের চেয়ে বেশী।

২.৪.৩ বৃটিশ যুগে পেশাগত কাঠামো

বৃটিশ শাসনে পেশাগত বিষয়টি সংগঠিত হতো কিভাবে শোষণ প্রক্রিয়া আরও সুদৃঢ় করে ভারত থেকে বৃটেনে রপ্তানি বৃদ্ধি করা যায়। এই সময়ে ভারতীয় অর্থনীতি মূলত ছিল কৃষিভিত্তিক, কৃষি শ্রমিকরা সব চা, ইন্ডিগো এবং কফি চাষে বেশী নিয়োজিত হতো কারণ এই দ্রবগুলিই অধিক পরিমাণে রপ্তানী হতো। কৃষকেরা বাধ্য থাকতো এ বিষয়ে নিয়োজিত হতে। 70-75% শ্রমিক কৃষিতে নিযুক্ত হয়েছিল কলকারখানা শিল্পে ছিল মাত্র 10% এবং সেবামূলক ক্ষেত্রে ছিলো মাত্রা 15–20%।

আঞ্চলিক কিছু তারতম্য দেখা দিয়েছিল Madras Presidency, পশ্চিমবঙ্গ এবং মহারাষ্ট্রে কৃষিতে নিয়োগ কিছুটা হ্রাস পেয়েছিল পরিবর্তে শিল্প কারখানা নিয়োগ বৃদ্ধি পেয়েছিল। সেবামূলক ক্ষেত্রেও বৃদ্ধি পেয়েছিল। আবার উড়িষ্যা, পাঞ্জাব এবং রাজস্থানে কৃষিতে নিয়োগ আনুপাতিক হারে বৃদ্ধি পেয়েছিল।

তাই বলা যায় বৃটিশ শাসনকালে পেশাগত কাঠামোতে অনেকটা পরিবর্ত্তন দেখা দিয়েছিল তবে গ্রামাঞ্চল থেকে শহরে শ্রমিকদের স্থানান্তরিত হওয়ার কিছু সমস্যা ছিল যা আমরা হ্যারিস-টোডাবো মডেলে দেখতে পাই। এই মডেলগুলি হল—

গ্রাম থেকে শহরে শ্রমিক স্থানান্তরের সমস্যা : হ্যারিস-টোডারো মডেল

অধ্যাপক লুইস এবং অধ্যাপক নার্কস আলাদা আলাদা ভাবে দেখিয়েছেন কীভাবে একটি জনবহুল দেশের কৃষিক্ষেত্রের উদ্বৃত্ত শ্রমিককে শিল্পে স্থানান্তর করে দেশটির অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটানো যায়। এই শ্রমিক স্থানান্তরের ক্ষেত্রে তাঁদের মডেলে প্রধান সমস্যা হল, উদ্বৃত্ত শ্রমিকের পাশাপাশি তাদের

জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্য ও কৃষি থেকে শিল্পে নিয়ে যাওয়ার সমস্যা। এটি না পারলে শিল্প ক্ষেত্রের বিস্তারের সময় মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেবে এবং ফলে উন্নয়ন প্রক্রিয়া বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে। কিন্তু এছাড়াও বাস্তবে আরো একটি বড় সমস্যা দেখা দেবে। গ্রাম ও শহরের মধ্যে মজুরি ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার পার্থক্যের দরুন গ্রাম থেকে বহু সংখ্যক শ্রমিক শহরে এসে ভিড় করছে। তাই গ্রাম থেকে শহরে অর্থাৎ কৃষি থেকে শিল্পে শ্রমিক স্থানান্তরের ফলে বাস্তবে শহরগুলি জনাকীর্ণ হয়ে পড়ছে। বস্তি জীবনের প্রসার ঘটছে। পরিবেশের অবনমন ঘটছে। এক কথায়, গ্রামীণ বেকারি শহুরে বেকারিতে পরিণত হয়েছে। হ্যারিস এবং টোডারো মডেলের আলোচনা এই বিন্দু থেকে শুরু।

হ্যারিস এবং টোডারোর মতে, শহরের মজুরির 'প্রত্যাশিত' মূল্য যদি গ্রামীণ ক্ষেত্রে মজুরির হারের চেয়ে বেশি হয়, তাহলে গ্রাম থেকে শহরে শ্রমিক গমন চলতে থাকবে, যদিও শহরে বা শিল্পক্ষেত্রে দীর্ঘদিন বেকার থাকার ঝুঁকি রয়েছে। শহুরে বেকারির একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল, বেকারি কমানোর সাবেকি বা চিরাচরিত সুপারিশগুলি এক্ষেত্রে কাজ করে না। যেমন, শহরে শ্রমিক নিয়োগ বাড়ানোর জন্য ভরতুকি দিলে, শহরে নানা সুযোগ সুবিধা বাড়ালে তা অনেক সময় উল্টে শহুরে বেকারি বাড়িয়ে তোলে। এ বিষয়ে টোডারো (Todaro) একটি বাস্তব ঘটনা থেকে উদাহরণ দিয়েছেন। 1964 সালে কেনিয়া সরকার রাজধানী নাইরোবিতে বেকারি কমানোর জন্য 15 শতাংশ বাড়তি কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করে। কিন্তু ওই কর্মসূচি যখন শেষ হয় তখন দেখা গেল যে, নাইরোবিতে বেকারির হার কমেনি, বরং তা বেড়ে গিয়েছে। আসলে নতুন কাজ পাবার আশায় আরো বেশি সংখ্যক শ্রমিক গ্রাম থেকে শহরে (নাইরোবিতে) চলে এসেছে। ফলে বেকারির হার বেড়ে গিয়েছে। ভারত-সহ বহু দেশের ক্ষেত্রেই অনুরূপ অবস্থা ঘটেছে।

আর একটি বিষয়ও এই গ্রাম থেকে শহরে শ্রমিক স্থানান্তরের সমস্যাকে জটিলতর করেছে। শহরে বিধিবদ্ধ ক্ষেত্র (formal sector) ছাড়াও একটি বিশাল অ-বিধিবদ্ধ (informal) ক্ষেত্র থাকে। এই অ-বিধিবদ্ধ ক্ষেত্র বিধিবদ্ধ ক্ষেত্র অপেক্ষা খুব কম মজুরিতে নতুন স্থানান্তরিত শ্রমিককে কাজের সুযোগ দিয়ে থাকে। গ্রাম থেকে শহরে এসে শ্রমিকেরা হোটেল বেয়ারা, রাস্তার ফেরিওয়ালা, মুটে, গৃহভৃত্য, রিক্সাচালক ইত্যাদি নানা ছোটোখাটো কাজ সহজেই পেয়ে যায়। এর ফলে গ্রাম থেকে বেকার শ্রমিকেরা শহরে চলে আসে বিধিবদ্ধ ক্ষেত্রে কাজ খুঁজতে। বিশাল অ-বিধিবদ্ধ ক্ষেত্র তাদের সাময়িক দিন গুজরানের ব্যবস্থা করে দেয়। এভাবে অনুন্নত দেশগুলিতে আজকাল গ্রাম থেকে লোক শহরে এসে ভিড় করছে এবং গ্রামীণ প্রচ্ছন্ন বেকারি শহুরে উন্মুক্ত বেকারিতে পরিণত হচ্ছে। শহরে এসে তারা চায়ের দোকানে বেয়ারার কাজ, বাস স্ট্যান্ডে মুটের কাজ, রিক্সা বা ভ্যান চালানো প্রভৃতি ছোটোখাটো কাজ করছে। ভারতের ক্ষেত্রেও সাম্প্রতিক কালে তাই ঘটছে। এক্ষেত্রে নিয়োগের বিচারে ভারতে সেবা ক্ষেত্রের প্রসার ঘটেছে। কিন্তু তা উন্নয়নের কোনো উচ্চতর স্তর নির্দেশ করে না। ভারতের সাম্প্রতিক প্রসারকে অনেকে service-led growth বা সেবাক্ষেত্র চালিত উন্নয়ন বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু এটি ভারতীয় অর্থনীতির পরিণত স্তরের উন্নয়ন নির্দেশ করে না। বিষয়টি নিয়ে আমরা পরের বিভাগে (৬.৪ নং বিভাগ) বিস্তারিত আলোচনা করেছি।

ভারতের শ্রমশক্তির ক্ষেত্রগত স্থানান্তর

ক্লার্ক-ফিশার তত্ত্বের মতে, কোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে সাথে ওই দেশের উৎপন্ন কাঠামো ও জীবিকা কাঠামোয় পরিবর্তন ঘটে। যত দেশটির উন্নয়ন এগিয়ে চলে, দেশের মোট জাতীয় উৎপন্নে প্রাথমিক ক্ষেত্রের অবদান কমতে থাকে এবং মাধ্যমিক ক্ষেত্রের অবদান বাড়তে থাকে। উন্নয়নের আরো পরিণত স্তরে সেবাক্ষেত্রের অবদান বাড়ে। দেশটির জীবিকা কাঠামোতেও অনুরূপ পরিবর্তন ঘটে। উন্নয়নের একেবারে গোড়ার দিকে প্রাথমিক ক্ষেত্রে নিযুক্ত শ্রমিকের অনুপাত বেশি থাকে এবং মাধ্যমিক ও সেবাক্ষেত্রে নিযুক্ত শ্রমিকের অনুপাত কম থাকে। তারপর দেশটির উন্নয়নের সাথে সাথে প্রাথমিক ক্ষেত্রে নিযুক্ত শ্রমিকের অনুপাত কমে এবং মাধ্যমিক ক্ষেত্রে নিযুক্ত শ্রমিকের অনুপাত বাড়ে। দেশটি আরো উন্নত হলে সেবা ক্ষেত্রে নিযুক্ত শ্রমিকের অনুপাত বাড়ে। এককথায়, কোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে সাথে দেশটির শ্রমশক্তির প্রথমে প্রাথমিক ক্ষেত্র থেকে মাধ্যমিক ক্ষেত্রে এবং তারপর প্রাথমিক ও মাধ্যমিক ক্ষেত্র থেকে সেবা ক্ষেত্রে বা তৃতীয় ক্ষেত্রে স্থানান্তর ঘটে। উৎপন্ন কাঠামো ও জীবিকা কাঠামোর এই পরিবর্তনকে একসাথে বলা হয় কাঠামোগত পরিবর্তন। কোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে সাথে এরূপ কাঠামোগত পরিবর্তন ঘটতে থাকে। এটিই ক্লাক-ফিশার তত্ত্বের মূলকথা।

এখন, ভারতে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা শুরু হয় 1951 সালে এবং তা শেষ হয় 2017 সালে। এই দীর্ঘ পরিকল্পনাকালে এবং পরবর্তী সময়ে ভারতে মাথাপিছু আয়ের বৃদ্ধি ঘটেছে। যদি আমরা মাথাপিছু আয়কে অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাপকাঠি বলে ধরি, তাহলে বলতে হয় যে, 1951 সাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত ভারতে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটে চলেছে, যদিও তা অনেকটা ধীর গতিতে। চলতি দামস্তরে ভারতের মাথাপিছু নিট জাতীয় উৎপাদনে পরিকল্পনাকালে কেমন বৃদ্ধি ঘটেছে তা আমরা 6.1 নং সারণিতে দেখিয়েছি। যদিও আমরা চলতি দামস্তরে ভারতের মাথাপিছু আয়ের গতিপ্রকৃতি দেখিয়েছি, তবুও বলা যায় যে, 1950-51 থেকে 2016-17 সময়কালে ভারতের মাথাপিছু আয়ের অনেকটাই বৃদ্ধি ঘটেছে। সুতরাং ক্লার্ক-ফিশার তত্ত্ব অনুসারে ভারতের জীবিকা কাঠামোতেও পরিবর্তন ঘটা উচিত অর্থাৎ ভারতের শ্রমশক্তির প্রাথমিক ক্ষেত্র থেকে মাধ্যমিক ক্ষেত্রে এবং মাধ্যমিক ক্ষেত্র থেকে সেবা

সারণি 2.1

ভারতের মাথাপিছু নিট জাতীয় উৎপাদনের গতিপ্রকৃতি (1950-51 থেকে 2016-17)

(চলতি দামস্তরে)

বছর	মাথাপিছু নিট জাতীয় উৎপাদন (টাকায়)
1950-51	255
1960-61	359
1970-71	742
1980-81	1,784
1990-91	5,440
2000-01	16,688
2006-07	29,642
2012-13	71,593
2015-16	94,797
2016-17	1,04,880

সূত্র : Economic Survey, বিভিন্ন সংখ্যা

ক্ষেত্রে স্থানান্তর ঘটার কথা। ভারতের শ্রমশক্তির এরূপ স্থানান্তর ঘটেছে কিনা অর্থাৎ জীবিকা কাঠামোয় কীরূপ পরিবর্তন ঘটেছে তা আমরা পরের সারণিতে (সারণি 2.2) দেখিয়েছি। এই সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, পরিকল্পনাকালে অন্তত 2005-06 সাল পর্যন্ত ভারতে জীবিকা কাঠামোয় কোনো উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেনি। অন্যভাবে বলতে গেলে, 1950-51 থেকে 2005-06 এই সময়কালে ভারতের শ্রমশক্তির কোনো উল্লেখযোগ্য ক্ষেত্রগত স্থানান্তর ঘটেনি। এক্ষেত্রে জীবিকার ধরনে খুবই ধীর গতিতে

সারণি 2.2

ভারতে শ্রমশক্তির ক্ষেত্রগত

স্থানান্তর বা জীবিকার ধরন (1951-2020)

(শতকরা হিসাবে)

ক্ষেত্র	**1951**	**1971**	**1981**	**1991**	**2005-06**	**2020**
প্রাথমিক ক্ষেত্র	72.1	72.1	68.8	66.8	58.6	41.5
মাধ্যমিক ক্ষেত্র	10.7	11.2	13.5	12.7	18.5	26.2
সেবাক্ষেত্র	17.2	16.7	17.7	20.5	22.9	32.3
মোট	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

সূত্র : 1) 1951 থেকে 1991 পর্যন্ত : Census Reports

2) 2005-06 ও 2020 সালের সূত্র : NSSO

পরিবর্তন ঘটেছে। কেমবলমাত্র 2005-06 সালের পর থেকে ভারতের জীবিকা কাঠামোয় সামান্য কিছুটা পরিবর্তন ঘটেছে। ওই সালের পর থেকে প্রাথমিক ক্ষেত্র থেকে মাধ্যমিক ও সেবা ক্ষেত্রে শ্রমিকের কিছুটা স্থানান্তর ঘটছে। কিন্তু এটি ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পরিচায়ক কিনা, সে সম্পর্কে সন্দেহ আছে। ভারতে জীবিকা কাঠামোর এই অনড়তার পিছনে মূল কারণ হল জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং শিল্পে অগ্রগতির মন্থরতা। ভারতের শিল্পক্ষেত্রে কর্মসংস্থান বাড়েনি, ফলে বেকারি বেড়েছে। লোকে কাজের খোঁজে শহরের সেবাক্ষেত্রের অ-প্রথাগত কাজকর্মে নিযুক্ত হচ্ছে। ফেরিওয়ালা, মুটে, গ্যারাজের হেল্পার, চায়ের দোকানে এবং হোটেলে বেয়ারা ইত্যাদি বিচিত্র কাজ জুটিয়ে নিচ্ছে। এর ফলে সেবাক্ষেত্রে নিযুক্ত শ্রমিকের অনুপাত বেড়েছে। ভারতের সেবাক্ষেত্রে শ্রমিকের সাম্প্রতিক স্থানান্তর দেশটির কোনো উন্নয়নের নির্দেশক নয়।

২.৪.৪ স্বাধীনতা পরে পেশাগত কাঠামো

কোনো দেশের অর্থনীতিকে তিনটি প্রধান ক্ষেত্রে ভাগ করা হয়। প্রথমটি হল প্রাথমিক ক্ষেত্র যার মধ্যে রয়েছে কৃষি, বন, মৎস্য চাষ প্রভৃতি। দ্বিতীয়টি হল মাধ্যমিক ক্ষেত্র যার মধ্যে রয়েছে শিল্প, খনি, নির্মাণ কার্য, বিদ্যুৎ, গ্যাস সরবরাহ, জল সরবরাহ প্রভৃতি। তৃতীয়টি হল সেবা ক্ষেত্র যার মধ্যে রয়েছে ব্যাঙ্কিং, বিমা, বাণিজ্য, পরিবহন, যোগাযোগ প্রভৃতি। প্রাথমিক ক্ষেত্রে নিযুক্ত ব্যক্তিদের জীবিকাকে প্রাথমিক স্তরের জীবিকা (Primary occupation), মাধ্যমিক ক্ষেত্রে নিযুক্ত ব্যক্তিদের জীবিকাকে মাধ্যমিক স্তরের জীবিকা (Secondary occupation) এবং সেবা ক্ষেত্রে নিযুক্ত ব্যক্তিদের জীবিকাকে তৃতীয় স্তরের জীবিকা (Tertiary occupation) বলে। এখন, আমরা জানি যে, কোনো অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে সেই দেশের উৎপন্ন কাঠামো এবং জীবিকা কাঠামোর একটি সম্পর্ক আছে। ক্লার্ক এবং ফিশারের মতে, কোনো দেশে যখন অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটতে থাকে, তখন মোট জাতীয় উৎপন্নে প্রাথমিক ক্ষেত্রের অবদান-অনুপাত কমতে থাকে এবং মাধ্যমিক ও সেবা ক্ষেত্রের অবদান-অনুপাত বাড়তে থাকে। দেশের জীবিকা কাঠামোতেও অনুরূপ ধরনের পরিবর্তন ঘটে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে সাথে প্রাথমিক ক্ষেত্রে নিযুক্ত জনসংখ্যার অনুপাত হ্রাস পায় এবং মাধ্যমিক ও সেবা ক্ষেত্রে নিযুক্ত জনসংখ্যার অনুপাত বৃদ্ধি পায়। একে ক্লার্ক-ফিশার তত্ত্ব (Clark-Fisher Thesis) বলে। কোনো দেশের উৎপন্ন কাঠামোর পরিবর্তন এবং জীবিকা কাঠামোর পরিবর্তনকে একসাথে বলা হয় ওই দেশের কাঠামোগত পরিবর্তন। আমরা ইতিমধ্যে ভারতের উৎপন্ন কাঠামোর পরিবর্তনের ধরন নিয়ে আলোচনা করেছি। বর্তমান বিভাগে আমরা 1951 সাল থেকে ভারতের জীবিকা কাঠামোর পরিবর্তন নিয়ে আলোচনা করব।

1951 সাল থেকে 2020 সাল পর্যন্ত এই সময়কালে ভারতের জীবিকা কাঠামোর ধরন 2.3 নং সারণিতে দেখিয়েছি।

সারণি 2.3

ভারতে জীবিকা কাঠামোর ধরন :1951-2020 (শতকরা হিসাবে)

ক্ষেত্র	1951	1961	1971	1991	1999	2005-06	2020
প্রাথমিক	72.1	71.8	72.1	66.8	60.4	58.6	41.5
মাধ্যমিক	10.7	12.2	11.2	12.7	15.8	18.5	26.2
সেবা	17.2	16.0	16.7	20.5	23.8	22.9	32.3
মোট	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

সূত্র : 1) 1951 থেকে 1991 সাল পর্যন্ত : Census Reports

2) 1999 থেকে 2020 সাল পর্যন্ত : NSSO data

বিভিন্ন আদমশুমারির তথ্য এবং NSSO প্রাপ্ত তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে যে, 1951 সাল থেকে 1999 সাল পর্যন্ত ভারতের জীবিকা কাঠামোয় উল্লেখযোগ্য তেমন পরিবর্তন হয়নি। ওই সময়কালে ভারতের জনসংখ্যার প্রায় 60 শতাংশ বা তার বেশি প্রাথমিক ক্ষেত্রের কাজকর্মে নিযুক্ত ছিল। পরবর্তী সময়কালেও প্রাথমিক ক্ষেত্রে নিযুক্ত জনসংখ্যার অনুপাত তেমন কমেনি। আর এই প্রাথমিক ক্ষেত্রের মধ্যে কৃষিই প্রধান। আমরা উৎপন্ন কাঠামোর আলোচনায় দেখেছি যে, 1950-51 থেকে 2020-21 এই সময়কালে জাতীয় আয়ে প্রাথমিক ক্ষেত্রের অবদান উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে (সারণি 2.6 দ্রষ্টব্য)। তাহলে আমরা বলতে পারি যে, স্বাধীনতা-উত্তরকালে ভারতে কৃষি থেকে উদ্ভূত জাতীয় আয়ের অংশ কমে গেলেও কৃষিতে নিযুক্ত জনসংখ্যার অনুপাত তেমন কমেনি। মাধ্যমিক ও সেবা ক্ষেত্রে নিযুক্ত জনসংখ্যার অনুপাতও তেমন বাড়েনি। অথচ উৎপন্ন কাঠামোয় আমরা দেখেছি যে, এই দুই ক্ষেত্রের অবদান, বিশেষত সেবা ক্ষেত্রের অবদান, উল্লেখযোগ্য ভাবে বেড়েছে। সুতরাং, সব মিলিয়ে বলা যায় যে, ভারতের জাতীয় আয়ের কাঠামোয় পরিবর্তন ঘটলেও জীবিকা কাঠামোর বিশেষ কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। জীবিকা কাঠামোর এই অনড়তার পিছনে দুটি প্রধান বা উল্লেখযোগ্য কারণ হল : দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং শিল্পে অগ্রগতির মন্থরতা। শিল্প ক্ষেত্রের অগ্রগতি তেমন হয়নি। যেটুকু উন্নতি ঘটেছে, তাতে শ্রমিক নিয়োগ বাড়েনি। বাড়তি উৎপাদনের বড় অংশই পাওয়া গেছে মূলধন-নিবিড় কৌশল প্রয়োগের দ্বারা। অথচ পাশাপাশি জনসংখ্যা বেড়েছে। ফলে বাড়তি জনসংখ্যা কাজ না পেয়ে কৃষিতে ভিড় করেছে। ফলে কৃষিতে নিযুক্ত জনসংখ্যার অনুপাত কমেনি। জীবিকা কাঠামোর অনড়তার পিছনে আরো অনেক বিষয় কাজ করছে, যেমন, কৃষিতে চিরাচরিত উৎপাদন কৌশল, সেবা ক্ষেত্রের বিভিন্ন কাজকর্মে বৈদ্যুতিন পদ্ধতি এবং স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতির প্রয়োগ প্রভৃতি। সেবাক্ষেত্রের আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও বিমা সংস্থাগুলি এবং স্বাস্থ্য পরিষেবার বিভিন্ন কাজকর্মে ও পরিবহন ক্ষেত্রে অনেক কাজেই সাম্প্রতিক কালে বৈদ্যুতিন পদ্ধতি প্রযুক্ত হয়েছে। ফলে পূর্ণ সময়ের শ্রমিকের নিয়োগ বাড়েনি। ফলে জীবিকা কাঠামো অনেকটাই অনড় রয়ে গেছে। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, ভারতে জাতীয় উৎপাদনের কাঠামোর পরিবর্তন ক্লার্ক-ফিশার তত্ত্বমাফিক ঘটলেও জীবিকার কাঠামোর পরিবর্তন ওই তত্ত্বমাফিক হয়নি। অর্থনীতিবিদ ভি. কে. আর. ভি. রাও এই বৈশিষ্ট্যকে ভারতের কাঠামোগত অধোগামিতা (structural retrogression) বলে অভিহিত করেছেন। এটিকে তিনি ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমস্যা ও বিরোধাভাস (both the problem and the paradox of Indian economic development) বলে বর্ণনা করেছেন।

২.৫ কর্মসংস্থানের পরিবর্তন

কোনো দেশে মোট বিনিয়োগ বাড়লে উৎপাদন বাড়ে এবং উৎপাদন বাড়ার সাথে সাথে সাধারণত কর্মসংস্থান বাড়ে ও বেকারি কমে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ভারত-সহ কিছু দেশে এ ব্যাপারটি ঘটেনি। পরিকল্পনার যুগ থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত ভারতের মোট জাতীয় উৎপাদন যথেষ্ট বেড়েছে, কিন্তু কর্মসংস্থান তার সাথে তাল মিলিয়ে বাড়েনি। অনেক ক্ষেত্রে মোট নিয়োগ কমেছে। আসলে, নিয়োগ

কতটা বাড়বে, তা প্রধানত উৎপাদন কৌশলের উপর নির্ভর করে। যদি উৎপাদন কৌশল মূলধন-নিবিড় হয় তাহলে বিনিয়োগ বাড়লে উৎপাদন বাড়বে, কিন্তু কর্মসংস্থান বাড়বে না। ভারতের ক্ষেত্রে তাই ঘটেছে। বৃহদায়তন শিল্পে মূলধন-নিবিড় উৎপাদন কৌশল গ্রহণ করার ফলে কর্মসংস্থান বাড়ার সম্ভাবনা কমে যাচ্ছে। আরো একটি কারণে বৃহদায়তন শিল্পে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি ঘটছে না। সেটি হল অব্যবহৃত উৎপাদন ক্ষমতা (excess productive capacity)। ভারতের বেশ কিছু বৃহদায়ন শিল্পে উদ্‌বৃত্ত উৎপাদন ক্ষমতা রয়েছে। এমনকি এই অব্যবহৃত উৎপাদন ক্ষমতা ক্রমশ বাড়ছে। এরূপ ক্ষেত্রে ওই শিল্পের উৎপন্ন দ্রব্যের চাহিদা বাড়লে অব্যবহৃত উৎপাদন ক্ষমতার একটা অংশ ব্যবহার করে সেই চাহিদা সহজেই মেটানো যায়। কিন্তু তাতে কর্মসংস্থান বিশেষ বাড়ে না। তাই ভারতে পরিকল্পনার যুগে শিল্পোৎপাদন বেড়েছে কিন্তু কর্মসংস্থান তেমন বাড়েনি। ফলে বেকারি বেড়েছে। যেমন, 1970-76 সময়কালে ভারতে সংগঠিত শিল্পের মোট উৎপাদন 32 শতাংশ বেড়েছিল, কিন্তু কর্মসংস্থান বেড়েছিল মাত্র 13 শতাংশ। আবার, 1963 থেকে 1969 সালের মধ্যে বৃহৎ শিল্পের উৎপাদন বেড়েছিল 15 শতাংশ কিন্তু কর্মসংস্থান বেড়েছিল মাত্র 9 শতাংশ।

বিভিন্ন অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় ভারতের কর্মসংস্থান কতটা বেড়েছে এবং তা বেকারি কমাতে কতটা সাহায্য করেছে তা এখন বিচার করা যেতে পারে। প্রথম পরিকল্পনায় (1951-56) কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছিল 70 লক্ষ। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় (1956-61) মোট 100 লক্ষ (বা এক কোটি) কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়। তৃতীয় পরিকল্পনা (1961-66) মোট 145 লক্ষ কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করতে পেরেছিল। সুতরাং প্রথম তিনটি পরিকল্পনার সময়কালে (1951-66) মোট কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয় 315 লক্ষ বা 3 কোটি 15 লক্ষ। এরপর যুদ্ধ, খরা প্রভৃতি প্রতিকূল পরিস্থিতির জন্য চতুর্থ পরিকল্পনা যথাসময়ে শুরু করা যায়নি। পরিবর্তে তিনটি বার্ষিক পরিকল্পনা (1966-69) গৃহীত হয়। এই সময়কালকে ভারতীয় পরিকল্পনার ইতিহাসে ‘পরিকল্পনা থেকে ছুটি’ (plan holiday) বলে অভিহিত করা হয়। ওই সময় থেকে দীর্ঘ 15 বছর ধরে (1965-80) ভারতীয় অর্থনীতিতে মন্দা চলে। স্বভাবতই তিনটি বার্ষিক পরিকল্পনায় কর্মসংস্থান বৃদ্ধির হার মোটেই ভালো ছিল না। চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা থেকে বিভিন্ন পরিকল্পনায় মোট কত কর্মসংস্থান হয়েছিল তার কোনো তথ্য পরিকল্পনা কমিশনের হিসাব থেকে পাওয়া যায় না। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া প্রদত্ত তথ্য থেকে ভারতে সংগঠিত শিল্পে কত কর্মসংস্থান হয়েছে তার হিসাব পাওয়া যায়। এখানে সংগঠিত শিল্প বলতে সরকারি সংস্থা এবং দশ বা তার বেশি শ্রমিক নিয়োগকারী অ-কৃষিক্ষেত্রের বেসরকারি সংস্থাকে বোঝানো হচ্ছে। শ্রমিক নিয়োগকারী অ-কৃষিক্ষেত্রের বেসরকারি সংস্থাকে বোঝানো হচ্ছে। চতুর্থ পরিকল্পনায় (1969-74) এরূপ সংগঠিত ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছিল 193 লক্ষ। পঞ্চম পরিকল্পনায় (1974-79) এই সংখ্যাটি হল 223 লক্ষ। বিভিন্ন পরিকল্পনায় কর্মসংস্থান বৃদ্ধির হার তুলনা করলে দেখা যায় যে, তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির বার্ষিক হার ছিল 6 শতাংশ। কিন্তু তিনটি বার্ষিক পরিকল্পনার সময়ে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির হার বার্ষিক 1 শতাংশে নেমে আসে। চতুর্থ পরিকল্পনায় কর্মসংস্থান বৃদ্ধির হার অবশ্য বাড়ে (4 শতাংশ)। কিন্তু পঞ্চম পরিকল্পনায় তা আবার কমে বার্ষিক 2.8

শতাংশ দাঁড়ায়। অষ্টম পরিকল্পনার সময়ে (1992-97) মোট কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছিল 420 লক্ষ। কিন্তু দেশে মোট শ্রমিকের সংখ্যা বাড়ার ফলে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির হার বার্ষিক 2.5 শতাংশে নেমে আসে। আর একটি কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (1980-85) পর্যন্ত সরকারি ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির হার ছিল তুলনামূলকভাবে বেশি। অন্যভাবে বলতে গেলে, বেসরকারি ক্ষেত্রে যে হারে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পেয়েছে, সরকারি ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান তার চেয়ে বেশি হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। অর্থাৎ ভারতের সরকারি ক্ষেত্র কর্মসংস্থান বৃদ্ধিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে অন্তত 1980-র দশকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত। তবে এর পর থেকে সরকারি ক্ষেত্রের ভূমিকা জাতীয় অর্থনীতিতে কমতে থাকে। ওই সময় থেকেই ভারতে উদারীকরণ প্রক্রিয়া শুরু হয় যা চরম গতি লাভ করে 1991 সালের শিল্পনীতিতে। সরকারি ক্ষেত্রে বেসরকারিকরণ ও বিলগ্নিকরণ প্রক্রিয়া শুরু হয়। স্বভাবতই, মোট কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সরকারি ক্ষেত্রের অবদান কমে যায়। এই ক্ষেত্রে আমাদের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পগুলি কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারত। কেননা ক্ষুদ্র শিল্পগুলি খুবই শ্রম-নিবিড় উৎপাদন কৌশল গ্রহণ করে। ফলে এদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির ক্ষমতা খুব বেশি। 1969-70 সালে ভারতে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে নিযুক্ত মোট লোকের সংখ্যা ছিল 235 লক্ষ বা 2 কোটি 35 লক্ষ। ষষ্ঠ পরিকল্পনার সময় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে কর্মসংস্থানের পরিমাণ বেড়ে দাঁড়ায় 326 লক্ষ বা 3 কোটি 26 লক্ষ। অর্থাৎ পরিকল্পনায় 5 বছরে বাড়তি কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয় প্রায় 1 কোটি।

আর একটি কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। আমাদের প্রতিটি পরিকল্পনায় যে সংখ্যক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে, তার চেয়ে বেশি সংখ্যক নতুন কর্মপ্রার্থী শ্রমের বাজারে যোগ দিয়েছে। ফলে প্রতিটি পরিকল্পনার শেষে বকেয়া বেকারের সংখ্যা বেড়েছে। পরিকল্পনাকালে কর্মক্ষম ব্যক্তির শতাংশ হিসাবে বেকারদের অনুপাত বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রথম পরিকল্পনাকালে মোট কর্মক্ষম ব্যক্তির 2.9 শতাংশ ছিল বেকার। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় এটি বেড়ে হয় 3 শতাংশ। তৃতীয় পরিকল্পনায় এটি বেড়ে দাঁড়ায় 4 শতাংশ। আর তিনটি বার্ষিক পরিকল্পনায় মোট কর্মক্ষম ব্যক্তিদের শতাংশ হিসাবে বেকারদের অনুপাত বেড়ে হয় 9.6 শতাংশ। 1971 সালের বেকারের সংখ্যার একটি হিসাব ভগবতী কমিটির রিপোর্ট (1973) থেকে পাওয়া যায়। ওই রিপোর্টে দেখা যায় যে 1971 সালে ভারতে মোট কর্মক্ষম ব্যক্তির সংখ্যা ছিল 18.04 কোটি এবং মোট বেকারের সংখ্যা ছিল 1.87 কোটি। শতাংশের বিচারে, 1971সালে ভারতে বেকারের হার ছিল মোট কর্মক্ষম ব্যক্তির 10.4 শতাংশ।

জাতীয় নমুনা সমীক্ষা সংস্থা (NSSO) ভারতে বেকারত্বের পরিমাপের জন্য 1972 সাল থেকে তিন রকম বেকারত্বের ধারণা প্রবর্তন করে। সেই ধারণাগুলি হল প্রচলিত পদমর্যাদাসম্পন্ন বেকারত্ব (usual status unemployment), সাপ্তাহিক পদমর্যাদাসম্পন্ন বেকারত্ব (weekly status unemployment) এবং দৈনিক পদমর্যাদাসম্পন্ন বেকারত্ব (daily status unemployment)। কোনো কর্মক্ষম ব্যক্তি এক বছর বা তার বেশি সময়কাল বেকার থাকলে তাকে প্রচলিত পদমর্যাদসম্পন্ন বেকার বলে ধরা হয়েছে। এটি আসলে দীর্ঘকালীন বেকারত্বের (chronic unemployment) ধারণা প্রকাশ করে। অন্যদিকে, কোনো

কর্মক্ষম ব্যক্তি কোনো সপ্তাহে এক ঘণ্টার জন্যও কাজ না পেলে তাকে সাপ্তাহিক পদমর্যাদাসম্পন্ন বেকার বলে ধরা হয়। দৈনিক পদমর্যাদাসম্পন্ন বেকারত্বের ক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তি দিনে এক ঘণ্টা বা তার বেশি কিন্তু চার ঘণ্টার কম সময় কাজ করলে সে অর্ধদিবস কাজ করেছে বলে ধরা হয়। আর যদি কোনো ব্যক্তি দিনে চার ঘণ্টা বা তার বেশি সময় কাজ করে তবে ওই ব্যক্তি সারাদিন কর্মরত বলে ধরা হয়। সব হিসাবেই বা মাপকাঠিতেই ভারতে বেকারের সংখ্যা বেড়েছে। এই হিসাবগুলিতে কৃষিক্ষেত্রের প্রচ্ছন্ন বেকারদের বা স্বল্পসময়ের জন্য নিযুক্ত ব্যক্তিদের ধরা হয়নি। এদের ধরলে ভারতে বেকারত্বের হার আরও বেশি হবে। অবশ্য, গ্রামাঞ্চলে প্রচ্ছন্ন বেকারের সংখ্যা সম্পর্কে সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না। ভগবতী কমিটির রিপোর্ট থেকে এদের সংখ্যা সম্পর্কে একটি হিসাব পাওয়া যায়। এই কমিটির মতে, সপ্তাহে 14 ঘণ্টারও কম সময়ের (অর্থাৎ দৈনিক গড়ে দু-ঘণ্টা বা তার কম) জন্য কাজ পায় এরূপ ব্যক্তির সংখ্যা 97.5 লক্ষ। এদের কাজের পরিমাণ এত কম যে ভগবতী কমিটি এদের পূর্ণ বেকার হিসাবেই গণ্য করেছে। আর সপ্তাহে 28 ঘণ্টা (অর্থাৎ দৈনিক গড়ে 4 ঘণ্টা) কাজ পায় এমন ব্যক্তির সংখ্যা 2 কোটি 69 লক্ষ। এটি প্রচ্ছন্ন বেকারত্ব বা স্বল্প নিযুক্তির পরিমাণ। ভগবতী কমিটির মতে, ওই সময়ে (1971) ভারতে প্রচ্ছন্ন বেকারত্ব বা স্বল্প নিযুক্তির হার হল মোট কর্মক্ষম ব্যক্তিদের প্রায় 15 শতাংশ।

ভারতে শিক্ষিত বেকারদের সংখ্যা সম্পর্কেও নিখুঁত কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। ভারতে এরূপ বেকারদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা হয় এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ থেকে। কিন্তু এই তথ্যও ত্রুটিপূর্ণ। **প্রথমত,** অনেক শিক্ষিত বেকারই এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে নাম নথিভুক্ত করে না। **দ্বিতীয়ত,** অনেকে কাজ পাবার পরও তাদের নামের পুনর্নবীকরণ (renewal) করায়। কারণ তারা আরো ভালো কাজের সন্ধান করে। 2021 সালে ভারতে গ্র্যাজুয়েট এবং তার উপরে শিক্ষিত যুবক-যুবতীদের মধ্যে বেকারির হার ছিল 19.4 শতাংশ। দশম থেকে দ্বাদশ ক্লাস পর্যন্ত পড়াশোনা করেছে এরূপ লোকেদের ক্ষেত্রে বেকারির হার 10.3 শতাংশ। ষষ্ঠ থেকে নবম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করেছে এরূপ মানুষের মধ্যে বেকারির হার 1.5 শতাংশ। আর পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করা ব্যক্তিদের মধ্যে বেকারির হার 0.7 শতাংশ (সূত্র : www.statista.com)।

2020 সালের মার্চ মাসে ভারতে কোভিড মহামারি শুরু হয়। মহামারি নিয়ন্ত্রণ করতে ভারত সরকার 25 মার্চ, 2020 তারিখে সারাদেশে লকডাউন ঘোষণা করে। মোট চার দফায় 68 দিন সর্বভারতীয় স্তরে এই লকডাউন জারি ছিল (25 মার্চ থেকে 31 মে, 2020)। এই সর্বভারতীয় লকডাউনের সময় ভারতীয় অর্থনীতির যাবতীয় কর্মকাণ্ড বন্ধ ছিল। এছাড়া, রাজ্য ও স্থানীয় স্তরে জারি হয় অসংখ্য লকডাউন ও লোকের যাতায়াতের উপর নিয়ন্ত্রণ। ফলে কোভিড মহামারির বছর দুটিতে (2020-21 এবং 2021-22) অসংখ্য ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প বন্ধ হয়ে যায়। লক্ষ লক্ষ মানুষ তাদের জীবিকা হারায়। ফলে দুর্দশাগ্রস্ত হয় অসংগঠিত ক্ষেত্রের পরিযায়ী শ্রমিকেরা। স্বভাবতই কোভিড মহামারির সময় (যা কিছু দিনের মধ্যেই অতিমারিতে পরিণত হয়) ভারত-সহ পৃথিবীর বহু দেশেই বেকারি বৃদ্ধি পেয়েছে। CMIE (Centre for Monitoring Indian Economy) দ্বারা প্রকাশিত একটি হিসাব থেকে দেখা যাচ্ছে যে, 2021

সালের ডিসেম্বর মাসে ভারতে বেকারত্বের হার ছিল 7.9 শতাংশ। শহরে এই হার 9.3 শতাংশ এবং গ্রামীণ এলাকায় 7.3 শতাংশ। অনেকেই অবশ্য প্রকৃত সংখ্যাটা আরো বেশি বলে মনে করেন।

২.৬ পেশাগত কাঠামোর প্রবণতা

সারণি 2.4

ভারতে শ্রমিক নিয়োগ বন্টন

ক্ষেত্র	পুরুষ				মহিলা		
	1993-94	1999-00	2004-05	2009-10	1993-94	1999-00	2009-10
প্রাথমিক ক্ষেত্র	57.43	53.53	48.64	45.27	77.52	75.36	66.99
মাধ্যমিক ক্ষেত্র	16.76	18.16	21.09	24.02	11.24	12.00	16.82
তৃতীয় ক্ষেত্র	25.81	28.31	30.27	30.71	22.48	24.64	33.01
Total	100	100	100	100	100	100	100

সূত্র—বিভিন্ন রাউন্ডের NSS data.

এই টেবিলটিতে দেখা যাচ্ছে কেবল 8% পুরুষ কর্মী প্রাইমারী ক্ষেত্র থেকে দ্বিতীয় বা মাধ্যমিক ক্ষেত্রে বা তৃতীয় ক্ষেত্রে স্থানান্তরিত হয়েছে। অপরদিকে প্রায় 11% মহিলা কর্মী স্থানান্তরিত হয়েছে অর্থাৎ মহিলা কর্মী অনেক দ্রুত হারে তাদের ক্ষেত্রভিত্তিক পেশা পরিবর্তন করছে।

২.৭ পেশাগত কাঠামো এবং কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রগত বিভাজন

সারণি 2.5

পেশাগত নিয়োগ বন্টন ভারতবর্ষে

ক্ষেত্র	1993-94	2011-12
প্রাথমিক ক্ষেত্র	73.7	41.96
দ্বিতীয় ক্ষেত্র	16.8	28.79
তৃতীয় ক্ষেত্র	9.3	29.25

সূত্র—নিয়োগ ও বেকারী NSSO Rounds 1993-94 and 2011–12

ভারতের শ্রমশক্তির ক্ষেত্রগত স্থানান্তর

ক্লার্ক-ফিশার তত্ত্বের মতে, কোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে সাথে ওই দেশের উৎপন্ন কাঠামো ও জীবিকা কাঠামোয় পরিবর্তন ঘটে। যত দেশটির উন্নয়ন এগিয়ে চলে, দেশের মোট জাতীয় উৎপন্নে প্রাথমিক ক্ষেত্রের অবদান কমতে থাকে এবং মাধ্যমিক ক্ষেত্রের অবদান বাড়তে থাকে। উন্নয়নের আরো পরিণত স্তরে সেবাক্ষেত্রের অবদান বাড়ে। দেশটির জীবিকা কাঠামোতেও অনুরূপ পরিবর্তন ঘটে। উন্নয়নের একেবারে গোড়ার দিকে প্রাথমিক ক্ষেত্রে নিযুক্ত শ্রমিকের অনুপাত বেশি থাকে এবং মাধ্যমিক ও সেবাক্ষেত্রে নিযুক্ত শ্রমিকের অনুপাত কম থাকে। তারপর দেশটির উন্নয়নের সাথে সাথে প্রাথমিক ক্ষেত্রে নিযুক্ত শ্রমিকের অনুপাত কমে এবং মাধ্যমিক ক্ষেত্রে নিযুক্ত শ্রমিকের অনুপাত বাড়ে। দেশটি আরো উন্নত হলে সেবা ক্ষেত্রে নিযুক্ত শ্রমিকের অনুপাত বাড়ে। এককথায়, কোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে সাথে দেশটির শ্রমশক্তির প্রথমে প্রাথমিক ক্ষেত্র থেকে মাধ্যমিক ক্ষেত্রে এবং তারপর প্রাথমিক ও মাধ্যমিক ক্ষেত্র থেকে সেবা ক্ষেত্রে বা তৃতীয় ক্ষেত্রে স্থানান্তর ঘটে। উৎপন্ন কাঠামো ও জীবিকা কাঠামোর এই পরিবর্তনকে একসাথে বলা হয় কাঠামোগত পরিবর্তন। কোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে সাথে এরূপ কাঠামোগত পরিবর্তন ঘটতে থাকে। এটিই ক্লাক-ফিশার তত্ত্বের মূলকথা।

এখন, ভারতে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা শুরু হয় 1951 সালে এবং তা শেষ হয় 2017 সালে। এই দীর্ঘ পরিকল্পনাকালে এবং পরবর্তী সময়ে ভারতে মাথাপিছু আয়ের বৃদ্ধি ঘটেছে। যদি আমরা মাথাপিছু আয়কে অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাপকাঠি বলে ধরি, তাহলে বলতে হয় যে, 1951 সাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত ভারতে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটে চলেছে, যদিও তা অনেকটা ধীর গতিতে। চলতি দামস্তরে ভারতের মাথাপিছু নিট জাতীয় উৎপাদনে পরিকল্পনাকালে কেমন বৃদ্ধি ঘটেছে তা আমরা 2.6 নং সারণিতে দেখিয়েছি। যদিও আমরা চলতি দামস্তরে ভারতের মাথাপিছু আয়ের গতিপ্রকৃতি দেখিয়েছি, তবুও বলা যায় যে, 1950-51 থেকে 2016-17 সময়কালে ভারতের মাথাপিছু আয়ের অনেকটাই বৃদ্ধি ঘটেছে। সুতরাং ক্লার্ক-ফিশার তত্ত্ব অনুসারে ভারতের জীবিকা কাঠামোতেও পরিবর্তন ঘটা উচিত অর্থাৎ ভারতের শ্রমশক্তির প্রাথমিক ক্ষেত্র থেকে মাধ্যমিক ক্ষেত্রে এবং মাধ্যমিক ক্ষেত্র থেকে সেবা ক্ষেত্রে স্থানান্তর ঘটার কথা। ভারতের শ্রমশক্তির এরূপ স্থানান্তর ঘটেছে কিনা অর্থাৎ জীবিকা কাঠামোয় কীরূপ পরিবর্তন ঘটেছে তা

সারণি 2.6

ভারতের মাথাপিছু নিট জাতীয় উৎপাদনের গতিপ্রকৃতি (1950-51 থেকে 2016-17) (চলতি দামস্তরে)

বছর	মাথাপিছু নিট জাতীয় উৎপাদন (টাকায়)
1950-51	255
1960-61	359
1970-71	742
1980-81	1,784
1990-91	5,440
2000-01	16,688
2006-07	29,642
2012-13	71,593
2015-16	94,797
2016-17	1,04,880

সূত্র : Economic Survey, বিভিন্ন সংখ্যা

আমরা পরের সারণিতে (সারণি 2.7) দেখিয়েছি। এই সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, পরিকল্পনাকালে অন্তত 2005-06 সাল পর্যন্ত ভারতে জীবিকা কাঠামোয় কোনো উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেনি। অন্যভাবে বলতে গেলে, 1950-51 থেকে 2005-06 এই সময়কালে ভারতের শ্রমশক্তির কোনো উল্লেখযোগ্য ক্ষেত্রগত

সারণি 2.7

ভারতে শ্রমশক্তির ক্ষেত্রগত

স্থানান্তর বা জীবিকার ধরন (1951-2020)

(শতকরা হিসাবে)

ক্ষেত্র	1951	1971	1981	1991	2005-06	2020
প্রাথমিক ক্ষেত্র	72.1	72.1	68.8	66.8	58.6	41.5
মাধ্যমিক ক্ষেত্র	10.7	11.2	13.5	12.7	18.5	26.2
সেবাক্ষেত্র	17.2	16.7	17.7	20.5	22.9	32.3
মোট	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

সূত্র : 1) 1951 থেকে 1991 পর্যন্ত : Census Reports

2) 2005-06 ও 2020 সালের সূত্র : NSSO

স্থানান্তর ঘটেনি। এক্ষেত্রে জীবিকার ধরনে খুবই ধীর গতিতে পরিবর্তন ঘটেছে। কেমবলমাত্র 2005-06 সালের পর থেকে ভারতের জীবিকা কাঠামোয় সামান্য কিছুটা পরিবর্তন ঘটেছে। ওই সালের পর থেকে প্রাথমিক ক্ষেত্র থেকে মাধ্যমিক ও সেবা ক্ষেত্রে শ্রমিকের কিছুটা স্থানান্তর ঘটছে। কিন্তু এটি ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পরিচায়ক কিনা, সে সম্পর্কে সন্দেহ আছে। ভারতে জীবিকা কাঠামোর এই অনড়তার পিছনে মূল কারণ হল জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং শিল্পে অগ্রগতির মন্থরতা। ভারতের শিল্পক্ষেত্রে কর্মসংস্থান বাড়েনি, ফলে বেকারি বেড়েছে। লোকে কাজের খোঁজে শহরের সেবাক্ষেত্রের অ-প্রথাগত কাজকর্মে নিযুক্ত হচ্ছে। ফেরিওয়ালা, মুটে, গ্যারাজের হেল্পার, চায়ের দোকানে এবং হোটেলে বেয়ারা ইত্যাদি বিচিত্র কাজ জুটিয়ে নিচ্ছে। এর ফলে সেবাক্ষেত্রে নিযুক্ত শ্রমিকের অনুপাত বেড়েছে। ভারতের সেবাক্ষেত্রে শ্রমিকের সাম্প্রতিক স্থানান্তর দেশটির কোনো উন্নয়নের নির্দেশক নয়।

২.৮ পেশাগত কাঠামো এবং কর্মসংস্থানের উন্নতিকল্পে ব্যবস্থা

1991 সালের অর্থনৈতিক সংস্কার, বিশ্বায়ন, উদারীকরণ, বেসরকারিকরণ পেশাগত কাঠামোতে অনেক পরিবর্ত্তন আনতে পেরেছে তখন প্রাথমিক ক্ষেত্র থেকে দ্বিতীয় আবার দ্বিতীয় ক্ষেত্র থেকে তৃতীয় ক্ষেত্রে নিয়োগ স্থানান্তরিত হয়েছে। 1947 সালে স্বাধীনতার পর থেকে বিভিন্ন পরিকল্পনা বিশেষ করে দ্বিতীয় পরিকল্পনা দ্বিতীয় ক্ষেত্র অর্থাৎ শিল্পের জোয়ার আসে। বিভিন্ন শিল্প নীতি 1948, 1956 সালে

শিল্পের প্রতি অনেক গুরুত্ব আরোপ করা হয় এবং তার ফলে পেশাগত কাঠামো এবং কর্মসংস্থানের দিক পরিবর্তন হয়।

২.৯ সারাংশ

পেশাগত কাঠামোর পরিবর্ত্তন কর্মসংস্থান এর উন্নতিকল্পেই করা হয়। অন্যান্য দেশের ন্যায় ভারতেও স্বাধীনতার পর থেকে কাঠামোগত রূপান্তর (Structural Transformation) ঘটতে থাকে। প্রাথমিক ক্ষেত্র থেকে GDP-তে অবদান ধীরে ধীরে কমতে থাকে। শিল্পক্ষেত্রে এবং বিশেষ করে তৃতীয় ক্ষেত্রে অবদান ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে। একটি দেশ তার প্রাথমিক অর্থনৈতিক অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসতে সময় লাগে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রেও তৃতীয় ক্ষেত্রে কর্ম নিয়োগ বৃদ্ধি করে ঠিকই তার সুষম উন্নয়ন এর তত্ত্ব অনুযায়ী কৃষিক্ষেত্রও সমানভাবে অর্থনৈতিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। এটি একটি বড় অর্থনৈতিক সমস্যা যেখানে একদিকে চিরাচরিত শিল্প আবার অপরদিকে আধুনিক অধিক কর্মমুখী শিল্প। এই দুই-এর সহাবস্থান একান্ত জরুরী।

২.১০ অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত উত্তরের প্রশ্নাবলী

১. পেশাগত কাঠামো কি?

২. কর্মসংস্থানের কাঠামো কি?

৩. প্রাথমিক ক্ষেত্র কি?

৪. মাধ্যমিক বা দ্বিতীয় ক্ষেত্র কি?

৫. তৃতীয় ক্ষেত্র কি?

মাঝারি উত্তরের প্রশ্নাবলী

১. পেশাগত কাঠামোর কয়েকটি বৈশিষ্ট লেখ।

২. তিনটি ক্ষেত্র কর্মসংস্থানের ব্যাখ্যা কর।

৩. কর্মসংস্থানের উন্নতিকল্পে গৃহীত ব্যবস্থাগুলি ব্যাখ্যা কর।

দীর্ঘ উত্তরের প্রশ্নাবলী

১. বৃটিশ যুগে কাঠামোগত কাঠামো ব্যাখ্যা কর।

১. স্বাধীনতার পরবর্ত্তীকালে পেশাগত কাঠামো ব্যাখ্যা কর।

৩. পেশাগত কাঠামো এবং কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রগত বিভাজন ব্যাখ্যা কর।

সঠিক উত্তর নির্বাচনের প্রশ্নাবলী

১. প্রাথমিক ক্ষেত্র কি?

(ক) শিল্প (খ) কৃষি
(গ) সেবা (ঘ) কোনোটিই নয়

২. মাধ্যমিক ক্ষেত্র কি?

(ক) কৃষি (খ) শিল্প
(গ) সেবা (ঘ) কোনোটিই নয়

৩. তৃতীয় ক্ষেত্র কি?

(ক) কৃষি (খ) শিল্প
(গ) সেবা (ঘ) কোনোটিই নয়

৪. স্বাধীনতার ঠিক পরে কৃষিতে শতকরা নিয়োগ ছিল—

(ক) ২০% (খ) ১০%
(গ) ৭০% (ঘ) কোনোটিই নয়

২.১১ গ্রন্থপঞ্জি

1. Mishra Prui (2008) Indian Economy Himalaya Publishing House.
2. Kundu A (1997) Trends and structure of Employment in the 1990s. Economic and Political Weekly Vol. 32. No. June
3. Mitra Arup & Siddhartha Mitra (2005) Rural Non Farm sector, Edited Vol. 'Rural Transformation in India' Indian Institute of Human Development, New Delhi.

একক – ৩ ❑ উন্নয়ন ও পরিকল্পনা

গঠন

৩.১ উদ্দেশ্য

৩.২ প্রস্তাবনা

৩.৩ ভারতের উন্নয়নশীল দেশে রূপান্তর

৩.৪ ভারতের উন্নয়নের দুইটি পর্যায় বা পর্ব

৩.৪.১ ভারতের উন্নয়নের প্রথম পর্ব বা পর্যায় (1950–80)

৩.৪.২ ভারতের উন্নয়নের দ্বিতীয় পর্ব বা পর্যায় বাজারি ব্যবস্থার প্রাধান্য

৩.৫ সারাংশ

৩.৬ অনুশীলনী

৩.৭ গ্রন্থপঞ্জি

৩.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে ছাত্রছাত্রীরা জানতে পারবে

- ব্রিটিশ শাসনকালে ভারতে অর্থনৈতিক অবস্থা
- অনুন্নত অবস্থা থেকে উন্নয়শীল দেশে ভারতের রূপান্তর
- ভারতের উন্নয়নের বিভিন্ন পর্যায়
- ভারতে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা এবং তার বিবর্তন
- ভারতের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাগুলির সাফল্য ও ব্যর্থতা

৩.২ প্রস্তাবনা

1947 সালের 15 আগস্ট ভারত স্বাধীনতা লাভ করে। তার পূর্বে দীর্ঘ 150 বছর বিদেশি শাসনের অধীন ছিল। পলাশির যুদ্ধ (1757) থেকে সিপাহি বিদ্রোহ (1857) পর্যন্ত এই 100 বছর ভারত ছিল

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনের অধীন। 1857 থেকে 1947 সাল পর্যন্ত ভারত ছিল ব্রিটিশ রাজের (crown) অধীনে। সুতরাং ভারত স্বাধীনতার পূর্বে প্রায় দীর্ঘ 200 বছর (সঠিকভাবে বলতে গেলে 190 বছর) বিদেশি শাসকের দ্বারা শাসিত হয়েছে। এই ব্রিটিশ শাসনকালে (1757-1947) ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা ভালো ছিল না। বিদেশি শাসকদের মূল উদ্দেশ্যই ছিল ভারতকে ব্রিটেনের খাদ্যশস্য ও কাঁচামালের জোগানদার হিসাবে এবং ব্রিটিশ শিল্পজাত দ্রব্যের ক্রেতায় পরিণত করা। ঔপনিবেশিক শাসকদের সমস্ত নীতিই এই মূল উদ্দেশ্য সামনে রেখে রচিত হয়েছে। এই সমস্ত নীতির ফলে ভারতের গ্রামীণ শিল্প ধ্বংস হয়েছে অথচ আধুনিক শিল্প প্রসার লাভ করেনি। ফলে কৃষি হয়ে দাঁড়ায় জনাকীর্ণ। কৃষিতে প্রচ্ছন্ন বেকারি বাড়ে। আবার, জলসেচের প্রসার না ঘটায় কৃষি ছিল প্রকৃতি-নির্ভর। ফলে বছরে মাত্র কয়েকটি ঋতুতে কৃষিকার্য চলত। সেজন্য কৃষিতে মরশুমি বেকারত্বও বর্তমান ছিল। সব মিলিয়ে কৃষির উৎপাদনশীলতা ছিল খুবই কম। পাশাপাশি, যেটুকু বড় শিল্প গড়ে উঠেছিল ব্রিটিশ ভারতে, তার সুফলও ভারত পায়নি। পাট শিল্পের মালিকানার সবটাই ছিল বিদেশি। ফলে এই শিল্পের মুনাফার সবটাই বিদেশিরা ভোগ করেছে। ব্রিটিশ শাসনকালে কিছুটা রেলপথের প্রসার ঘটেছিল। কিন্তু রেলপথ ভারত থেকে কাঁচামাল কিনে ব্রিটেনে পাঠাতে এবং ভারতে ব্রিটিশ শিল্পজাত দ্রব্য বেচতে সাহায্য করেছে। অনেকে তাই ভারতে রেলপথের প্রসারকে 'শোষণের যান' (vehicles of exploitation) বা 'শোষণের চাকা' (wheels of exploitation) বলে অভিহিত করেছেন। কৃষির উন্নতিতে ব্রিটিশরা কোনো বিনিয়োগ করেনি। অনেকে মনে করেন যে, রেলপথ অপেক্ষা সেই সময়ে ভারতে জলসেচের প্রসার অধিকতর কাম্য ছিল। আবার, ভারতে যে ভূমি ব্যবস্থা ব্রিটিশরা প্রবর্তন করে, (যেমন, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বা জমিদারি ব্যবস্থা, রায়তওয়ারি ব্যবস্থা এবং মহালওয়ারি ব্যবস্থা) তা ছিল চাষিদের নিকট অত্যন্ত পীড়নমূলক ও শোষণমূলক। আর চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মূল উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশদের অনুগত জমিদার শ্রেণি তৈরি করা এবং এদের সাহায্যে গ্রামীণ ভারতে নিজেদের শাসন কায়েম রাখা। এসবের ফলে ব্রিটিশ ভারতে কৃষি উৎপাদনশীলতা ছিল খুবই কম। পাশাপাশি, শিল্পের তেমন উন্নতি ঘটেনি। স্বভাবতই, ভারতের ন্যায় কৃষিভিত্তিক অর্থনীতিতে জাতীয় ও মাথাপিছু আয়ও ছিল খুবই কম।

বৈদেশিক বাণিজ্য থেকেও ভারত লাভবান হয়নি। ভারতের দিক থেকে প্রধান রপ্তানি দ্রব্য ছিল সুতিবস্ত্র ও মশলা। ইংলন্ডের শিল্প বিপ্লবকে সাহায্য করার জন্য ভারতের সুতিবস্ত্রের উপর উচ্চহারে শুল্ক বসে। ফলে সুতিবস্ত্র রপ্তানির বদলে ভারতে সুতিবস্ত্রের আমদানি এবং ভারত থেকে কাঁচাতুলোর রপ্তানি শুরু হয়। এ ধরনের বাণিজ্যকে বলা হয় ঔপনিবেশিক ধরনের বাণিজ্য (colonial type of trade)। এ ধরনের বাণিজ্যে উপনিবেশ (colony) দেশটি লাভবান হয় না। লাভের বড় অংশই উপনিবেশকারী দেশটি (coloniser) আত্মসাৎ করে। এছাড়া, অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ হতে ভারত থেকে ইংলন্ডে একতরফা সম্পদ স্থানান্তর শুরু হয়। অনেকে এই সম্পদের স্থানান্তরকে 'অর্থনৈতিক নিঃসরণ' (economic drain) বলে অভিহিত করেছেন। ভারত থেকে ব্রিটেনে নানারূপে এই নিঃসরণ ঘটেছে। দাদাভাই নৌরজী, রমেশচন্দ্র দত্ত, ব্রুকস অ্যাডামস প্রমুখদের মতে, এই অর্থনৈতিক নিঃসরণ

ব্রিটিশ ভারতের দারিদ্র্যের পিছনে অন্যতম প্রধান কারণ। আর এই অর্থনৈতিক নিঃসরণে বৈদেশিক বাণিজ্যই ছিল ব্রিটিশদের মূল হাতিয়ার। ভারতের বাণিজ্য উদ্‌বৃত্ত দিয়ে তারা চিন থেকে আমদানির ব্যয় মেটাতো। এভাবে ভারত প্রয়োজনীয় মূলধন থেকে বঞ্চিত হতে লাগলো, আর সেই মূলধনে ব্রিটেনের শিল্প বিপ্লব পুষ্ট হতে লাগলো। এক কথায়, ব্রিটিশ শাসনের ফলাফল হিসেবে ভারত অনুন্নত দেশই রয়ে গেল। ড. করণ সিং-এর মতে, স্বাধীনতার প্রাক্কালে ভারতীয় অর্থনীতি ছিল অনুন্নত, অনড় বা নিশ্চল এবং আধা-সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ একে একটি হ্রাসপ্রাপ্ত অর্থনীতিতে পর্যবসিত করে। আর স্বাধীনতার সময়ে দেশবিভাগ ভারতীয় অর্থনীতিকে একটি বিচ্ছিন্ন বা বিয়োজিত অর্থনীতিতে পরিণত করে।

1947 সালে স্বাধীনতার সাথে সাথে এল দেশবিভাগজনিত সমস্যা। তৎকালীন পূর্ববঙ্গ থেকে এল বহুসংখ্যক শরণার্থী। অনেক উর্বর জমি পূর্ববঙ্গের ভাগে পড়ল, বিশেষত পাটচাষের উপযোগী উর্বর জমি। অথচ পাটকলগুলো রইল ভারতে। ফলে স্বাধীন ভারতের শুরুতে দেখা দিল খাদ্য ও কাঁচামালের সমস্যা। ওই সময়ে ভারতীয় অর্থনীতির প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি ছিল : নিম্ন মাথাপিছু আয় ও জীবনযাত্রার মান, কৃষির প্রাধান্য, পরিকাঠামোর অভাব, অব্যবহৃত প্রাকৃতিক সম্পদ, মূলধনের অভাব, উচ্চ জনসংখ্যার চাপ, অনুন্নত শিল্প, ব্যাপক বেকারত্ব, ঔপনিবেশিক ধরনের বাণিজ্য, জনসংখ্যার নিম্নমান প্রভৃতি। এগুলো সবই অনুন্নত অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য। নতুন স্বাধীন দেশের রাষ্ট্রনায়কেরা ভারতকে এই অনুন্নতির অবস্থা থেকে উপরে তুলতে ব্রতী হলেন। তাঁরা অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মাধ্যমে দেশটির উন্নতি ঘটাতে সচেষ্ট হলেন। এই পরিকল্পনা দেশটির কতটা উন্নতি ও রূপান্তর ঘটাতে সক্ষম হয়েছে, তাই-ই বর্তমান এককে বিবেচনা করা হবে।

৩.৩ ভারতের উন্নয়নশীল দেশে রূপান্তর

ব্রিটিশ শাসনের সময় ভারত ছিল অনড়, অনুন্নত ও অসংগঠিত অর্থনীতি। স্বাধীনতা লাভের পর দেশের কর্ণধারেরা পরিকল্পিত ভাবে অর্থনৈতিক উন্নয়নের কার্যক্রম শুরু করে। 1950-51 সাল থেকে ভারতে পরিকল্পনার যুগ শুরু হয় এবং 2017 সালে পরিকল্পিত উন্নয়নের এই দীর্ঘপথ শেষ হয়। নানা কারণে ভারতে এই পরিকল্পিত পথে যাত্রা শুরু হয়। প্রথমত, ভারতকে একটি কল্যাণব্রতী রাষ্ট্র (welfare state) হিসাবে গড়ে তোলার লক্ষ্য স্থির হয়। সেক্ষেত্রে কিছু অগ্রাধিকার ক্ষেত্রে উন্নয়নের উপর জোর দিতে হয়। বাজারি শক্তির উপর তা ছেড়ে দিলে অকাম্য দ্রব্যের উৎপাদন শুরু হতে পারে। তাই পরিকল্পিত ভাবে দেশের উৎপাদন কাঠামো গড়ে তোলা দরকার। দ্বিতীয়ত, ব্যক্তিগত উদ্যোগের বিশৃঙ্খলা দূর করতেও পরিকল্পনার প্রয়োজন। তৃতীয়ত, পরিকল্পনার দ্বারা দেশের সম্পদের কাম্য ব্যবহার নিশ্চিত করা যায়। চতুর্থত, অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য দেশের পরিকাঠামোর উন্নয়ন সর্বাগ্রে প্রয়োজন। রাস্তাঘাট, বিদ্যুৎ, জলসেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ, রেলপথ নির্মাণ, ডাক ও তার প্রভৃতিকে পরিকাঠামো বা সামাজিক বহিরঙ্গ

(social infrastructure) বলা হয়। সাধারণত ব্যক্তিগত মূলধন এসব ক্ষেত্রে বিনিয়োগে আগ্রহী হয় না। তাই সরকারকেই পরিকল্পনার মাধ্যমে এগুলির উন্নয়নে এগিয়ে আসতে হয়। পরিকাঠামোর উন্নতি ঘটলে তখন ব্যক্তিগত উদ্যোক্তারা শিল্পক্ষেত্রে বিনিয়োগে এগিয়ে আসে। পঞ্চমত, মূল ও ভারী শিল্পের উন্নয়নের জন্যও পরিকল্পনা প্রয়োজন। সর্বোপরি, দেশের আর্থিক ভাবে দুর্বল শ্রেণির জন্য শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা, ন্যূনতম প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী সরবরাহ প্রভৃতির জন্যও অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রয়োজন। ভারতে তাই অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় 1950 সালে এবং 1951 থেকে 2017 সাল পর্যন্ত পরিকল্পনার যুগ চলে। এই দীর্ঘ সময়ে ভারতে 12টি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং কয়েকটি বার্ষিক পরিকল্পনা রূপায়িত হয়। এ সমস্ত উন্নয়ন প্রচেষ্টার ফলে ভারতের অর্থনীতির উল্লেখযোগ্য রূপান্তর ঘটে। ভারত আর ব্রিটিশ আমলের অনুন্নত এবং অনড় অর্থনীতি নেই। ভারত বর্তমানে এক প্রগতিশীল এবং উন্নতিকামী অর্থনীতিতে রূপান্তরিত হয়েছে।

পরিকল্পনাকালে ভারতের অর্থনীতিতে নানা কাঠামোগত পরিবর্তন ঘটেছে। ভারতের জাতীয় আয় ও মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পাচ্ছে। কৃষি তথা প্রাথমিক ক্ষেত্রের গুরুত্ব কমে আসছে এবং শিল্প তথা মাধ্যমিক ক্ষেত্রের গুরুত্ব বাড়ছে। ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের কাঠামোতেও পরিবর্তন ঘটেছে। কৃষিজাত দ্রব্যসামগ্রীর রপ্তানি হ্রাস পাচ্ছে এবং শিল্পজাত দ্রব্যের রপ্তানি বৃদ্ধি পাচ্ছে। অনেক শিল্পজাত দ্রব্য যা আগে আমদানি করা হত, সেগুলি এখন দেশেই উৎপন্ন হচ্ছে। শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদনও অনেকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মাধ্যমে অর্থনৈতিক পরিকাঠামো গড়ে তোলা সম্ভব হয়েছে। সেচ, পরিবহন, বিদ্যুৎ, শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে যথেষ্ট উন্নতি ঘটেছে। মূল ও ভারী শিল্পের ভিত্তি সুদৃঢ় হয়েছে। দেশের মিশ্র অর্থনৈতিক কাঠামোয় সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান পাশাপাশি বিরাজ করছে। অবশ্য সম্প্রতি, বিশেষত 2010-এর দশক থেকে সরকারি ক্ষেত্রের গুরুত্ব কমছে। কৃষি ও শিল্পক্ষেত্রে অর্থ সরবরাহ করতে সরকার নানা আর্থিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছে। আবার, বিভিন্ন রুগ্ন শিল্পের পুনরুজ্জীবনের ও ওই সমস্ত শিল্পের শ্রমিকদের পুনর্বাসনের জন্য সরকার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারের জন্য ব্যাঙ্ক ও বিমা ক্ষেত্রের নানা সংস্কার কর্মসূচি রূপায়িত হচ্ছে। দেশের মানবিক মূলধনেও উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটেছে। সামগ্রিকভাবে শিল্পক্ষেত্রে প্রযুক্তির অভাবনীয় উন্নতি ঘটেছে। এর ফলে ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রক্রিয়া আরো গতিশীল হয়ে উঠেছে। এই সমস্ত কিছু মিলে ভারতীয় অর্থনীতির উল্লেখযোগ্য রূপান্তর ঘটিয়েছে। আমরা উল্লেখযোগ্য কিছু ক্ষেত্রে ভারতের এই অগ্রগতি বা রূপান্তরের বিষয়টি পর্যালোচনা করব। এতে ভারতের অর্থনীতির প্রধান অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্যগুলি যেমন অনুধাবন করা যাবে তেমনি অর্থনীতি হিসাবে তার প্রকৃতি বা চরিত্রও (nature) উপলব্ধি করা যাবে।

(১) **জাতীয় ও মাথাপিছু আয় :** পরিকল্পনাকালে ভারতের জাতীয় ও মাথাপিছু আয় যথেষ্ট বেড়েছে। যেমন, চলতি দাম স্তরে 1950-51 সালে ভারতের জাতীয় আয় ছিল 9,152 কোটি টাকা। 2006-07 সালে (অর্থাৎ দশম পরিকল্পনার শেষে) ওই মান দাঁড়ায় 35,25,817 কোটি টাকা।

1950-51 সালে চলিত দামে মাথাপিছু আয় ছিল মাত্র 255 টাকা। 2006-07 সালে তার পরিমাণ বেড়ে দাঁড়ায় 29,642 টাকা। আমরা দাম বৃদ্ধির প্রভাবকে আলাদা করতে স্থির দামে জাতীয় ও মাথাপিছু আয়ের পরিবর্তন বিচার করতে পারি। সেক্ষেত্রেও আমরা একই চিত্র পাচ্ছি অর্থাৎ জাতীয় ও মাথাপিছু আয় উভয়ই উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। যেমন, 2004-05 সালের দামস্তরে 1950-51 সালে ভারতের জাতীয় আয় ছিল 2,69, 724 কোটি টাকা। 2011-12 সালে (অর্থাৎ একাদশ পরিকল্পনার শেষ বছরে) ওই একই দামস্তরে জাতীয় আয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় 49,58, 849 কোটি টাকা অর্থাৎ প্রকৃত জাতীয় আয় ওই 51 বছরে প্রায় 19 গুণ বেড়েছে। এবার, মাথাপিছু আয়ের চিত্রটি দেখা যাক। 2004-05 সালের দামস্তরে 1950-51 সালে মাথাপিছু জাতীয় আয় ছিল 7,513 টাকা। 2011-12 সালে একই দামস্তরে মাথাপিছু আয়ের পরিমাণ ছিল 41,255 টাকা অর্থাৎ ওই সময়কালে মাথাপিছু আয় বেড়েছে প্রায় 5.5 গুণ। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে জাতীয় আয় অপেক্ষা মাথাপিছু আয় কম হারে বেড়েছে।

(২) **জাতীয় ও মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির হার :** ব্রিটিশ শাসনকালে ভারতের আয় বৃদ্ধির হার ছিল অত্যন্ত কম। শ্রী মণি মুখার্জী বিভিন্ন আয় সমীক্ষকের ফলাফল বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে, 1948-49 সালের দামস্তরে 1867-68 সালে ব্রিটিশ ভারতে মাথাপিছু আয় ছিল 169 টাকা। 1931-32 সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় 241 টাকা অর্থাৎ দীর্ঘ 65 বছরে ভারতের মাথাপিছু আয় দেড়গুণও বাড়েনি। পাশাপাশি স্বাধীন ভারতের চিত্রটি দেখা যাক। সমগ্র পরিকল্পনাকালে (1951-2017) নিট জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার গড়ে বার্ষিক 4.9 শতাংশ (1980-81 সালের দামস্তরে)। জনসংখ্যা বৃদ্ধির দরুন মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির হার ছিল অবশ্য গড় বার্ষিক 2.9 শতাংশ। ব্রিটিশ আমলের আয় বৃদ্ধির হারের চেয়ে এই হার অনেক বেশি। দশম (2002-97), একাদশ (2007-12) এবং শেষ তথা দ্বাদশ (2012-17) পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় জাতীয় আয় বৃদ্ধির গড় বার্ষিক হার ছিল যথাক্রমে 7.7%, 7.9% ও 6.9%। আর মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির গড় বার্ষিক হার ছিল যথাক্রমে 5.8%, 5.8% এবং 4.9% (সব হিসাবই 1980-81সালের দামস্তরে)।

(৩) **জাতীয় আয়ের ক্ষেত্রগত বণ্টন :** কোনো দেশের অর্থনীতিকে তিনটি ক্ষেত্রে ভাগ করা হয় : প্রাথমিক ক্ষেত্র, মাধ্যমিক ক্ষেত্র এবং সেবামূলক ক্ষেত্র। প্রাথমিক ক্ষেত্রের (primary sector) মধ্যে রয়েছে কৃষিকার্য, পশুপালন, বন, মৎস্যচাষ প্রভৃতি। মাধ্যমিক ক্ষেত্রের (secondary sector) মধ্যে রয়েছে খনি, শিল্প-কারখানা, গ্যাস, বিদ্যুৎ ও জল সরবরাহ প্রভৃতি। আর সেবা ক্ষেত্রের (tertiary sector) মধ্যে রয়েছে ব্যবসা-বাণিজ্য, ব্যাঙ্ক, বিমা প্রভৃতি। এখন, কোনো দেশের জাতীয় আয়ের ক্ষেত্রগত বণ্টনের সঙ্গে সেই দেশের উন্নয়নের স্তরের একটি সম্পর্ক দেখা যায়। অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে মোট জাতীয় উৎপাদনের মধ্যে প্রাথমিক ক্ষেত্র থেকে উৎপন্নের অনুপাত কমতে থাকে এবং মাধ্যমিক ক্ষেত্র ও সেবা ক্ষেত্র থেকে উৎপন্নের

অনুপাত বাড়তে থাকে। ঠিক তেমনি, উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে প্রাথমিক ক্ষেত্রে নিযুক্ত জনসংখ্যার অনুপাত হ্রাস পায় এবং মাধ্যমিক ক্ষেত্র ও সেবা ক্ষেত্রে নিযুক্ত জনসংখ্যার অনুপাত বৃদ্ধি পায়। একে ক্লার্ক-ফিশার তত্ত্ব (Clark-Fisher Thesis) বলা হয়। ভারতে 1950-51 সালে জাতীয় উৎপন্নে প্রাথমিক ক্ষেত্রের অবদান ছিল 55%, মাধ্যমিক ক্ষেত্রের অবদান ছিল 16% এবং সেবা ক্ষেত্রের অবদান ছিল 29%। 2020-21 সালে এই অবদান যথাক্রমে 16%, 30% এবং 54%। এই তথ্য ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নের দিকে অগ্রগতিই নির্দেশ করছে।

(৪) **জীবিকার গঠন :** ক্লার্ক-ফিশার তত্ত্বের মতে, কোনো দেশে উন্নয়ন প্রক্রিয়া যত এগিয়ে চলে, প্রাথমিক ক্ষেত্রে নিযুক্ত জনসংখ্যার অনুপাত হ্রাস পায় এবং মাধ্যমিক ক্ষেত্র ও সেবামূলক ক্ষেত্রে নিযুক্ত জনসংখ্যার অনুপাত বৃদ্ধি পায়। একে বলে জীবিকা কাঠামোর পরিবর্তন। এই জীবিকা কাঠামোর ধরন দেখেও কোনো দেশের উন্নয়নের ধরন বা রূপান্তরের স্তর সম্পর্কে ধারণা করা যায়। ভারতে উৎপন্ন কাঠামোর (output structure) পাশাপাশি জীবিকা কাঠামোতেও পরিবর্তন ঘটেছে। তবে উৎপন্ন কাঠামোয় যে পরিমাণে ও যে হারে পরিবর্তন ঘটেছে, জীবিকা কাঠামোয় সেরূপ পরিবর্তন ঘটেনি। যেমন, 1951 সালে ভারতের জনসংখ্যার 72 শতাংশ ছিল প্রাথমিক ক্ষেত্রে নিযুক্ত। মাধ্যমিক ক্ষেত্র ও সেবা ক্ষেত্রে নিযুক্ত জনসংখ্যার অনুপাত ছিল যথাক্রমে 11 ও 17 শতাংশ। NSSO-র একটি তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে যে, প্রাথমিক ক্ষেত্রে নিযুক্ত জনসংখ্যার অনুপাত 2020 সালে কমে দাঁড়ায় 42 শতাংশ। আর মাধ্যমিক ক্ষেত্রে এই অনুপাত বেড়ে দাঁড়ায় 26 শতাংশ। সেবা ক্ষেত্রে এই অনুপাত দাঁড়ায় 32 শতাংশ। দেখা যাচ্ছে, ভারতের জাতীয় আয়ের কাঠামোয় যথেষ্ট পরিবর্তন ঘটলেও জীবিকা কাঠামোয় বিশেষ পরিবর্তন ঘটেনি। জীবিকা কাঠামোর এই অনড়তার পিছনে নানা বিষয় কাজ করছে। তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি এবং শিল্পে নিয়োগের ক্ষেত্রে মন্থরতা। এ সম্পর্কে পরবর্তী এককে আমরা বিশদে আলোচনা করেছি।

(৫) **বৈদেশিক বাণিজ্যের গঠন :** ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের গঠনেও মৌলিক পরিবর্তন ঘটেছে। রপ্তানি দ্রব্যের ক্ষেত্রে আগে কৃষিজাত দ্রব্যের প্রাধান্য ছিল। এই দ্রব্যগুলি হল চা, কফি, পাটজাত দ্রব্য, মশলা, কাঁচা চামড়া প্রভৃতি। বর্তমানে এ সমস্ত দ্রব্যের প্রাধান্যের বদলে নানা নতুন দ্রব্যের প্রাধান্য স্থাপিত হয়েছে। এই দ্রব্যগুলির মধ্যে রয়েছে শিল্পজাত দ্রব্য, ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্য, রাসায়নিক দ্রব্য, হস্তনির্মিত দ্রব্য, তৈরি পোশাক-পরিচ্ছদ প্রভৃতি। এক কথায়, রপ্তানির ক্ষেত্রে কৃষিজাত দ্রব্যের বদলে শিল্পজাত দ্রব্যের প্রাধান্য বেড়েছে। আমদানি দ্রব্যের প্রকৃতিতেও পরিবর্তন এসেছে। পূর্বে আমদানি দ্রব্যের মধ্যে প্রধানত ছিল ভোগ্যপণ্য। বর্তমানে তার বদলে শিল্পের কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতির প্রাধান্য উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে।

(৬) **সঞ্চয় ও বিনিয়োগের হার :** পরিকল্পনা কালে ভারতের সঞ্চয় ও বিনিয়োগের হার যথেষ্ট

বৃদ্ধি পেয়েছে। 1950-51 সালে ভারতে সঞ্চয়ের হার ছিল স্থূল জাতীয় আয়ের (Gross Domestic Product বা GDP) 9.5 শতাংশ। 2017-18 সালে এই হার বেড়ে দাঁড়ায় 30.5 শতাংশ। এই সঞ্চয়ের প্রধান উৎস হল পরিবারের সঞ্চয়। গ্রামাঞ্চলে ব্যাঙ্ক, বিমা ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠার ফলে অসংখ্য গ্রামীণ পরিবারের সঞ্চয় সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে। এসবের ফলে ভারতে সঞ্চয়ের হার যথেষ্ট বেড়েছে। পরিকল্পনাকালে ভারতের মূলধন গঠন বা বিনিয়োগের হারও বেড়েছে। 1950-51 সালে ভারতে বিনিয়োগের হার ছিল GDP-র 10.9 শতাংশ। 2017-18 সালে এই হার বৃদ্ধি পেয়ে হয় 30.9 শতাংশ। এই বিনিয়োগের মধ্যে বেসরকারি শিল্প ক্ষেত্রের অবদানই প্রধান। বেসরকারি ক্ষেত্রের এই বিনিয়োগে অবদানের ফলে ভারতের জাতীয় আয় 2010-এর দশকে সন্তোষজনকভাবে বেড়েছে।

(৭) **নগরায়ণ :** 2011 সালের জনগণনার রিপোর্ট থেকে দেখা যাচ্ছে যে, 1951 সালের পর থেকে ভারতে শহরের সংখ্যা খুব দ্রুতহারে বেড়েছে। 1901 সালে ভারতে শহরবাসীর সংখ্যা ছিল 26 মিলিয়ন। 1951 সালে তা বেড়ে হয় 62 মিলিয়ন অর্থাৎ 50 বছরে ভারতে শহরবাসীর সংখ্যা বাড়ে 36 মিলিয়ন। কিন্তু তার পরের তিন দশকে (1951-81) শহরবাসীর সংখ্যা বাড়ে 94 মিলিয়ন। শুধুমাত্র 1981-91 দশকে শহরবাসীর সংখ্যা বাড়ে 59 মিলিয়ন। এই তথ্যগুলি ভারতের দ্রুত নগরায়ণের দিকেই অঙুলি নির্দেশ করে। 2011 সালে ভারতে নগরবাসীর সংখ্যা দাঁড়ায় 377 মিলিয়ন যা ওই সময়ের মোট জনসংখ্যার 31.2 শতাংশ। 1981 সালের পর থেকে প্রথম শ্রেণির শহরের সংখ্যা (যেগুলির জনসংখ্যা এক লক্ষ বা তার বেশি) খুব দ্রুত হারে বেড়েছে।

(৮) **প্রযুক্তিগত উন্নতি :** নতুন শতাব্দীতে ভারতের শিল্প ও পরিবহনের ক্ষেত্রে অভাবনীয় প্রযুক্তিগত উন্নতি ঘটেছে। অনেক কারখানাতেই বর্তমানে দ্রব্য উৎপাদনে সাম্প্রতিকতম কৌশল ব্যবহৃত হয়। এ সমস্ত ক্ষেত্রে তথ্য প্রযুক্তি ক্ষেত্রের অবদান অনস্বীকার্য। বিজ্ঞানের বহুক্ষেত্রে ভারতের উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটেছে। এছাড়া, রেল পরিবহন, রাস্তাঘাট নির্মাণ, বিমান পরিবহন, বন্দর রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদি বহু ক্ষেত্রে ভারতের আশাতীত প্রযুক্তিগত উন্নতি ঘটেছে।

উপরোক্ত বিষয়গুলি অবশ্যই ভারতীয় অর্থনীতির রূপান্তর নির্দেশ করে। কিন্তু এরই পাশাপাশি কতকগুলি ক্ষেত্রে ভারতের কৃতিত্ব হতাশাব্যঞ্জক। আমরা উপরের সাফল্যের দিকগুলির সঙ্গে ব্যর্থতার ক্ষেত্রগুলিও তুলে ধরছি।

(৯) **জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি :** পরিকল্পনা কালে ভারতে জনসংখ্যা বেশ দ্রুত হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। 1991 সালের জনগণনা অনুসারে ভারতে জন্মহার ছিল প্রতি হাজারে 29.5 এবং মৃত্যুহার ছিল প্রতি হাজারে 19.8। ফলে বছরে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ওই সময়ে ছিল প্রতি হাজারে 19.7 বা 1.97% অর্থাৎ জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার প্রায় 2 শতাংশ। বর্তমানে (2021) অবশ্য

জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার মোটামুটি 1 শতাংশে নেমে এসেছে। কিন্তু ভারতের মোট জনসংখ্যার আয়তন বড় হবার ফলে (2021 সালের ডিসেম্বর মাসে সংখ্যাটি 140 কোটি ছড়িয়ে গেছে) এই 1 শতাংশ হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধির অর্থ হল প্রতি বছর আরো 1.4 কোটি বাড়তি জনসংখ্যা। জনসংখ্যার এই বিপুল চাপ ভারতে বেকারত্ব, পরিবেশের অবনমন, শহরাঞ্চলে বস্তি জীবন ইত্যাদি নানা সমস্যার সৃষ্টি করছে। এছাড়া, ভারতের মোট জনসংখ্যার মোটামুটি 35% উৎপাদনের কাজে নিযুক্ত। বাকি 65 শতাংশ উৎপাদনের কাজে অংশগ্রহণ করে না। এরা উৎপাদনশীল জনসাধারণের উপর নির্ভরশীল। অন্যভাবে বলতে গেলে, ভারতে নির্ভরশীলতার বোঝা বা ভার (dependency load) খুব বেশি। দেশের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ মানুষ উৎপাদনের কাজে নিযুক্ত এবং বাকি দুই-তৃতীয়াংশ মানুষ পরনির্ভর। এর ফলে মাথাপিছু ভোগের পরিমাণ খুব কম।

(১০) **বেকারত্ব ও অর্ধ-বেকারত্ব :** অধিকাংশ স্বল্পোন্নত দেশের ন্যায় ভারতেও ব্যাপক বেকারত্বের সমস্যা বিদ্যমান। ভারতে বেকার ও অর্ধ-বেকারের সংখ্যা বিশাল এবং তা ক্রমবর্ধমান। এর পিছনে অন্যতম প্রধান কারণ হল জনসংখ্যা বৃদ্ধি। তাছাড়া, শিল্পক্ষেত্রে মূলধন-নিবিড় উৎপাদন কৌশল ব্যবহার এবং গ্রামীণ ও ক্ষুদ্র শিল্পের রুগ্নতা এই বেকারত্বের সমস্যাকে জটিলতর করে তুলেছে। এসবের ফলে বর্ধিত জনসংখ্যা কৃষিতে ভিড় করছে এবং কৃষিতে দেখা দিচ্ছে প্রচ্ছন্ন বেকারত্ব। আবার, পাশাপাশি, ভূমি বণ্টনে অসাম্য থাকায় ক্ষেতমজুরের সংখ্যাও বাড়ছে। আর রয়েছে ভারতে শিক্ষিত যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে বেকারি। শিক্ষিত বেকারির অন্যতম প্রধান কারণ হল বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রসার না-ঘটা। আমরা ভারতের বেকার সমস্যা নিয়ে পঞ্চম এককে বিশদে আলোচনা করেছি।

(১১) **ব্যাপক দারিদ্র্য :** অধিকাংশ স্বল্পোন্নত দেশের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হল সাধারণ জনগণের মধ্যে ব্যাপক দারিদ্র্য। ভারতেও এই বৈশিষ্ট্যটি লক্ষ করা যায়। বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ, যেমন, পি. ডি. ওঝা, দান্ডেকার ও রথ, বি. এস. মিনহাস, প্রণব বর্ধন, এম. এস. আলুওয়ালিয়া প্রমুখ ভারতের দারিদ্র্য পরিমাপের চেষ্টা করেছেন। এই সমস্ত সমীক্ষার ভিত্তিতে বলা যায় যে 1960-80 সময়কালে ভারতে মোট জনসংখ্যার মোটামুটি 40 শতাংশ দারিদ্র্যসীমার নীচে বাস করতো। অর্থাৎ 40 শতাংশ জনসাধারণ জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় ন্যূনতম দ্রব্যসামগ্রী সংগ্রহ করতে পারতো না। তেন্ডুলকরের অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক পরিমাপ (2004-05) থেকে দেখা যাচ্ছে যে, 2004-05 সালে ভারতীয় জনসংখ্যার 37.2 শতাংশ দারিদ্র্যসীমার নীচে বাস করতো। অবশ্য পরিকল্পনা কমিশনের মতে ঐ সময়ে দারিদ্র্যের পরিমাণ হল 27.5%। যাই হোক, বিভিন্ন পরিমাপের মধ্যে পার্থক্য থাকলেও অধিকাংশ অর্থনীতিবিদ মনে করেন যে ভারতে মোট জনসংখ্যার 25 থেকে 30 শতাংশ ব্যক্তি বর্তমানে (2022) দারিদ্র্যসীমার নীচে বাস করে। আমরা ভারতে দারিদ্র্যের বিষয়টি নিয়ে চতুর্থ এককে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছি।

(১২) **আয় ও সম্পদ বণ্টনে বৈষম্য :** ভারতে আয় ও সম্পদ বণ্টনে তীব্র বৈষম্য বিদ্যমান। জনসংখ্যার এক বিশাল অংশ দরিদ্র, কিন্তু মুষ্টিমেয় কিছু ধনীর হাতে আয় ও সম্পদ কেন্দ্রীভূত। NCAER (National Council of Applied Economic Research) প্রদত্ত একটি হিসাব থেকে জানা যায় যে, 1980 সালে ভারতের মোট আয়ের প্রায় অর্ধেক ভোগ করত সবচেয়ে ধনী 20 শতাংশ পরিবার। আর দরিদ্রতম 20 শতাংশ পরিবার পেত মোট আয়ের মাত্র সাত শতাংশ। সম্পদ বণ্টনের ক্ষেত্রে এই বৈষম্য আরো বেশি। 1960 সালে মহলানবিশ কমিটি লক্ষ করে যে, ভারতে দরিদ্রতম 10 শতাংশ লোক মোট আয়ের মাত্র 1.3 শতাংশ ভোগ করে। গ্রামের 25 শতাংশ পরিবারের নিজস্ব কোনো জমি নেই। অন্যদিকে, 5 শতাংশ পরিবারের হাতে 37 শতাংশ জমি কেন্দ্রীভূত হয়েছে। কমিটি আরো দেখেছিল যে, 1980 সালে জনসংখ্যার 5 শতাংশ জাতীয় আয়ের 20 শতাংশের বেশি ভোগ করত। আর 50 শতাংশ মানুষের ভাগে পড়েছে জাতীয় আয়ের মাত্র 20 শতাংশ। 2021 সালের ডিসেম্বরের শেষে প্রকাশিত হয়েছিল বিশ্ব ব্যাঙ্ক কর্তৃক ওয়ার্ল্ড ইনইকোয়ালিটি রিপোর্ট। সেই রিপোর্টে বলা হয়েছিল, ভারত একই সঙ্গে দরিদ্র এবং অতি বৈষম্যসম্পন্ন দেশ। সবচেয়ে ধনী 10 শতাংশের হাতে রয়েছে জাতীয় আয়ের 57 শতাংশ। এদের মধ্যে একেবারে শীর্ষের এক শতাংশ ধনীর কাছে রয়েছে জাতীয় আয়ের 22 শতাংশ। অন্যদিকে, দরিদ্রতম 50 শতাংশ মানুষের হাতে রয়েছে জাতীয় আয়ের মাত্র 13 শতাংশ। এই রিপোর্ট ভারতের ভয়াবহ এবং প্রকট আয় বৈষম্য তুলে ধরেছে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে পরিকল্পনাকালে ভারতীয় অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেমন অগ্রগতি ঘটেছে, তেমনি নানা ক্ষেত্রে ব্যর্থতাও কম নয়। অগ্রগতির ক্ষেত্রগুলি ভারতীয় অর্থনীতির অবশ্যই কিছুটা রূপান্তর ঘটিয়েছে। ভারতের জাতীয় ও মাথাপিছু আয় যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে; জাতীয় আয়ে শিল্প ও সেবাক্ষেত্রের অবদান বেড়েছে; জলসেচ, বিদ্যুৎ, সড়ক ও রেল পরিবহনে প্রভূত উন্নতি ঘটেছে; দেশে সঞ্চয় ও বিনিয়োগের হার বেড়েছে, উৎপাদনের বহু ক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত উন্নতি ঘটেছে, বৈদেশিক বাণিজ্যের কাঠামোতে পরিবর্তন এসেছে প্রভৃতি। কিন্তু পাশাপাশি, অর্থনীতির অনেক ক্ষেত্রেই এখনও অন্ধকারাচ্ছন্ন। জাতীয় উৎপাদন, বিশেষত শিল্পের উৎপাদন বাড়লেও শ্রমিক নিয়োগ বাড়েনি, ফলে বেকারি ও কর্মহীনতা বেড়েছে। অনেকে ভারতের এই বৃদ্ধি বা প্রসারকে তাই jobless growth বা নিয়োগহীন প্রসার বলে অভিহিত করেছেন। আর বেকারির উল্টোপিঠই হল দারিদ্র্য। ব্যাপক বেকারি ও ব্যাপক দারিদ্র্য একই মুদ্রারই এপিঠ ও ওপিঠ। দেশে প্রযুক্তিগত উন্নতি অবশ্যই ঘটেছে। শিক্ষার হারও বেড়েছে। কিন্তু জনসংখ্যার একটা বড় অংশ এখনও নিরক্ষর এবং সংস্কারাচ্ছন্ন। ভারতীয়দের গড় আয়ু অবশ্যই বেড়েছে, কিন্তু গ্রামাঞ্চলের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল এখনও আধুনিক চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত। বড় বড় শহর ও নগরের সংখ্যা যেমন বেড়েছে, তেমনি বস্তি জীবন, জল নিকাশি সমস্যা ইত্যাদিও বেড়েছে। আয় যেমন বেড়েছে, আয়ের বৈষম্যও বেড়েছে। শিল্পের, বিশেষত সাম্প্রতিক কালে বেসরকারি শিল্পের যথেষ্ট প্রসার ঘটেছে। কিন্তু শিল্পের অগ্রগতিতেও বৈষম্য রয়েছে। দেশের বেশ কিছু অঞ্চলে শিল্পের আদৌ প্রসার ঘটেনি। শিল্পের

এই আঞ্চলিক বৈষম্য আবার বিভিন্ন রাজ্যের উন্নয়নে বৈষম্য সৃষ্টি করেছে। আসলে, ভারত অর্থনীতির নানা ক্ষেত্রে রূপান্তর ঘটলেও এটি আসলে অধিকাংশ স্বল্পোন্নত দেশের ন্যায় দ্বৈত অর্থনীতি। এরূপ অর্থনীতিতে একটি উন্নত ক্ষেত্র এবং একটি অনুন্নত ক্ষেত্র পাশাপাশি সহাবস্থান করে। এরা যেন বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো। একটি ক্ষেত্র অপর ক্ষেত্রকে প্রভাবিত করতে পারে না। উন্নয়নের সুফল উন্নত ক্ষেত্র থেকে অনুন্নত ক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়ে না। একেই দ্বৈত অর্থনীতি বলে। ভারতীয় অর্থনীতিতেও তাই ঘটে চলেছে। এখানে, উন্নত ক্ষেত্রে উৎপাদনের কাজে আধুনিক কলাকৌশল গ্রহণ করা হয়, অন্যদিকে, অনুন্নত ক্ষেত্রটিতে উৎপাদন কৌশল প্রাচীন ও সাবেকি ধরনের। ফলে দুটি ভিন্ন ধরনের অর্থনীতি যেন পাশাপাশি বিরাজ করে। ভারতের তাই কিছু বিচ্ছিন্ন অঞ্চল খুবই আলোকিত, এবং বিস্তীর্ণ অঞ্চল তমসাচ্ছন্ন। উন্নয়নের এই আঞ্চলিক ভারসাম্যহীতা দূর করতে পারলে তবেই ভারতীয় অর্থনীতির প্রকৃত রূপান্তর ঘটেছে বলা যাবে। তার জন্য ভারতকে এখনও দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে হবে।

৩.৪ ভারতের উন্নয়নের দুইটি পর্যায় বা পর্ব

ভারতে পরিকল্পিত পথে উন্নয়নের প্রচেষ্টা শুরু হয় 1951 সালে। ওই বছর ভারতে প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা গৃহীত হয়। ভারতের এই পরিকল্পনার যুগ 2017 সাল পর্যন্ত চলে। ওই বছরটি ছিল দ্বাদশ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার (2012-17) শেষ বছর। ভারতের পরিকল্পনা কমিশনের বিকল্প প্রতিষ্ঠান হিসাবে গঠন করা হয় NITI (National Institution for Transforming India) আয়োগ। এটি গঠিত হয় 2015 সালের 1 জানুয়ারি। এটিই বর্তমানে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের policy think-tank বা বিকল্প নীতিসমূহের আধার। দ্বাদশ পরিকল্পনার সমাপ্তির পর (2017) থেকে মুখ্যত এই NITI আয়োগের পরামর্শমতো ভারতের প্রধান অর্থনৈতিক সিদ্ধান্তগুলি গ্রহণ করা হচ্ছে। 1950-51 সাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প গ্রহণ ও রূপায়ণের ফলে ভারতের অর্থনীতিতে নানা পরিবর্তন এসেছে। ভারতের সেই উন্নয়নে সরকারের ভূমিকা কতটা, তার ভিত্তিতে এই সমগ্র উন্নয়নকালকে দুটি প্রধান কালপর্বে ভাগ করা যায়। প্রথম পর্ব বা পর্যায় হল 1950 থেকে 1980 সাল। এই পর্যায়ে ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সুস্পষ্টভাবে সরকারি ক্ষেত্রের প্রাধান্য ও হস্তক্ষেপ পরিলক্ষিত হয়। আর দ্বিতীয় পর্ব বা পর্যায় হল 1980 সাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত। এই পর্বের উন্নয়নে সরকারের হস্তক্ষেপ বা সরকারি ক্ষেত্রের প্রাধান্য অপেক্ষা বাজারি শক্তির প্রাধান্য অনেক বেশি লক্ষ করা যায়। আমরা ভারতের উন্নয়নের এই দুই পর্যায় নিয়ে এখন আলোচনা করব।

৩.৪.১ ভারতের উন্নয়নের প্রথম পর্ব বা পর্যায় (1950–80) সরকারি ক্ষেত্রের প্রাধান্য

1947 সালে স্বাধীনতা লাবের পর ভারতের শিল্পজগতে এক অনিশ্চয়তার আবহ তৈরি হয়। নবগঠিত জাতীয় সরকার স্বাধীন ভারতের শিল্পের উন্নতিতে কীরূপ ভূমিকা নেবে, যে সম্পর্কে দেশের শিল্পপতিদের

মধ্যে কিছুটা দ্বিধা ও অনিশ্চয়তা ছিল। দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক কার্যকলাপে সরকার কতটা ভূমিকা নেবে সে সম্পর্কে সকলেই অজ্ঞাত ছিলেন। এই সংশয় ও অনিশ্চয়তা কাটাতেই ভারত সরকার 1948 সালের 6 এপ্রিল তার প্রথম শিল্পনীতি ঘোষণা করে। তৎকালীন শিল্পমন্ত্রী ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি সংসদে শিল্পনীতি পেশ করেন। এই শিল্পনীতির প্রধান ঐতিহাসিক গুরুত্ব হল এটি স্বাধীন ভারতকে মিশ্র অর্থনীতি হিসাবে গড়ে তোলার কথা প্রথম সরকারি ভাবে ঘোষণা করে।

আমরা জানি, যে অর্থনীতিতে সরকারি ক্ষেত্র ও বেসরকারি ক্ষেত্র সহাবস্থান করে, সেই অর্থনীতিকে মিশ্র অর্থনীতি (Mixed economy) বা মিশ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থা (mixed economic system) বলে। 1948 সালের শিল্পনীতিতে সরকার ভারতে মিশ্র অর্থনীতি প্রবর্তনের কথা ঘোষণা করে। এখন, এরূপ অর্থনীতিতে সরকারি ও বেসরকারি ক্ষেত্রের সহাবস্থান থাকলেও এই শিল্পনীতিতে সরকারি ক্ষেত্রের আপেক্ষিক গুরুত্ব কেমন ছিল তা বিচার করা যেতে পারে। 1948 সালের শিল্পনীতিতে শিল্পগুলিকে চার ভাগে ভাগ করা হয়। **প্রথম শ্রেণিতে** রাখা হয়েছিল জাতীয় দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ তিনটি শিল্প। এই শিল্প তিনটি হল অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণ, পরমাণু শক্তি উৎপাদন এবং রেল পরিবহন। 1948 সালের শিল্পনীতিতে বলা হয় যে, এই তিনটি শিল্প ভারত সরকারের সম্পূর্ণ একচেটিয়া থাকবে। **দ্বিতীয় শ্রেণিতে** ছিল শিল্প ও পরিকাঠামো উন্নয়নের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ কিছু শিল্প। এই তালিকার মধ্যে ছিল কয়লা, লৌহ-ইস্পাত, বিমান-নির্মাণ, জাহাজ-নির্মাণ, টেলিগ্রাফ ও বেতার যন্ত্রপাতি এবং খনিজ তৈল শিল্পাদি। এই শিল্পগুলির ক্ষেত্রে নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের অধিকার একমাত্র রাষ্ট্রেরই থাকবে। ইতিমধ্যে এই সমস্ত ক্ষেত্রে যে সমস্ত বেসরকারি পুরনো শিল্প রয়েছে তাদের আগামী 10 বছরের জন্য কাজ করতে অনুমতি দেওয়া হবে। 10 বছর পর এই শিল্পগুলি জাতীয়করণ করা হবে কিনা, সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। 1948 সালের শিল্পনীতিতে কুড়িটি শিল্পকে **তৃতীয় শ্রেণিতে** অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল বস্ত্র, সিমেন্ট, সার, কাগজ, লবণ, মোটরগাড়ি, ভারী যন্ত্রপাতি, মেশিন টুল্স প্রভৃতি। শিল্পনীতিতে বলা হয় যে, এই শিল্পগুলি সাধারণভাবে বেসরকারি মালিকানায় নির্মিত ও পরিচালিত হবে। তবে জাতীয় স্বার্থে প্রয়োজন হলে সরকার এদের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে পারবে। **চতুর্থ শ্রেণিতে** ছিল অবশিষ্ট শিল্পসমূহ। এই শিল্পগুলির জন্য বলা হয় যে, এগুলি সম্পূর্ণরূপে বেসরকারি মালিকানায় পরিচালিত হবে। তবে প্রয়োজন হলে সরকার এই শিল্পগুলোকেও নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, 1948 সালের শিল্পনীতিতে মিশ্র অর্থনীতি গড়ে তোলার কথা বলা হলেও সরকারি ক্ষেত্রের প্রাধান্যের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়। সরকার যে ভবিষ্যতে সরকারি ক্ষেত্রের প্রসার এবং জাতীয়করণের দিকে অগ্রসর হবে, তার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত এই শিল্পনীতিতে পুরোমাত্রায় বিদ্যমান ছিল। বিদেশি মূলধন সম্পর্কেও একথা প্রযোজ্য। 1948 সালের শিল্পনীতিতে বলা হয় যে, সাধারণ ভাবে বিদেশি শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাগরিষ্ঠ মালিকানা এবং নিয়ন্ত্রণের কার্যকর ক্ষমতা ভারতীয় নাগরিকদের হাতে রাখতে হবে। আরো ঘোষণা করা হয় যে, বিদেশি মূলধনের বিরুদ্ধে কোনোরূপ বৈষম্যমূলক আচরণ করা হবে না। এছাড়া, বিদেশি শিল্প ইউনিটগুলি তাদের মুনাফা বিদেশে পাঠাতে পারবে। এভাবে বিদেশি

বিনিয়োগকারীদের মনে যে সংশয় ও অনিশ্চয়তা কাজ করছিল, তা দূর করার চেষ্টা করা হয়। বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও সরকারি নীতির প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। 1948 সালের শিল্পনীতিতে বলা হয় যে, অবাঞ্ছিত বিদেশি প্রতিযোগিতার হাত থেকে দেশীয় শিল্পকে রক্ষা করার জন্য সংরক্ষণ দেওয়া হবে অর্থাৎ আমদানির উপর শুল্ক বসানো হবে। দেখা যাচ্ছে, 1948 সালের শিল্পনীতিতে বৈদেশিক বাণিজ্যকে বাজারি ব্যবস্থার উপর বা বাজারি শক্তির হাতে ছাড়া হয়নি। প্রয়োজনে সরকার হস্তক্ষেপ করবে, সেকথা ঘোষণা করা হয়।

1948 সালের প্রথম শিল্পনীতির পর দ্বিতীয় শিল্পনীতি গৃহীত হয় 1956 সালের এপ্রিল মাসে। 1954 সালে ভারতে সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ গড়ে তোলার লক্ষ্য ঘোষিত হয়। 1956 সালের শিল্পনীতিতে সেই লক্ষ্যের দিকে যাত্রা শুরু হয়। এই দ্বিতীয় শিল্পনীতিতে সমস্ত শিল্পগুলিকে তিন শ্রেণিতে ভাগ করা হয়। **প্রথম শ্রেণিতে** (Schedule A) ছিল 17টি শিল্প। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য শিল্পগুলি হল : প্রতিরক্ষা ও তার সাজসরঞ্জাম, আণবিক শক্তি, লৌহ-ইস্পাত, রেল পরিবহন, জাহাজ-নির্মাণ, বিমান-নির্মাণ, টেলিফোন, টেলিগ্রাফ ও বেতার যন্ত্রপাতি প্রভৃতি। শিল্পনীতিতে বলা হয় যে, এই শিল্পগুলির উন্নয়নের দায়িত্ব থাকবে সরকারের উপর। অবশ্য এই শিল্পগুলির ক্ষেত্রে তৎকালীন চালু বেসরকারি শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি বজায় রাখার অনুমতি দেওয়া হয়। তবে এই তালিকায় উল্লিখিত শিল্পগুলির ভবিষ্যৎ বিকাশের ভার সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রের হাতে থাকবে, তা বলা হয়। 1956 সালের শিল্পনীতিতে **দ্বিতীয় শ্রেণিভুক্ত** (schedule B) শিল্প ছিল 12টি। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল মিশ্র ধাতু, অ্যালুমিনিয়াম, রবার, মেশিন টুলস, রাসায়নিক সার, অ্যান্টিবায়োটিকস প্রভৃতি। শিল্পনীতিতে বলা হয় যে, এই শিল্পগুলিকে ধীরে ধীরে রাষ্ট্রীয় মালিকানায় আনা হবে। এই সকল ক্ষেত্রে নতুন উদ্যোগ স্থাপনের ভার সম্পূর্ণরূপে রাষ্ট্রের হাতেই থাকবে। **তৃতীয় শ্রেণিতে** (Schedule C) ছিল বাকি সমস্ত শিল্প। বলা হয় যে, এই সমস্ত শিল্পে বেসরকারি পুঁজিপতিরা বিনিয়োগ করতে পারবে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, 1948 সালের শিল্পনীতির তুলনায় 1956 সালের শিল্পনীতিতে সরকারি ক্ষেত্রের পরিসর আরো বিস্তীর্ণ করা হয়।

পরবর্তী উল্লেখযোগ্য শিল্পনীতি ঘোষিত হয় 1973 সালে। এই শিল্পনীতিতে শিল্পগুলিকে 4 শ্রেণিতে ভাগ করা হয়। এই চারটি শ্রেণি হল : মূল ক্ষেত্র (Core sector), ভারী বিনিয়োগ ক্ষেত্র (Heavy investment sector), মধ্যম স্থানীয় ক্ষেত্র (Middle sector) এবং সংরক্ষিত ক্ষেত্র (Reserve sector)। মূল ক্ষেত্রের মধ্যে ছিল 1956 সালের প্রথম শ্রেণিভুক্ত (Schedule A) 17টি শিল্প এবং আরো 9টি শিল্প। এই মূল ক্ষেত্রের 26টি শিল্প সরকারি ক্ষেত্রের জন্য সংরক্ষিত থাকবে বলে ঘোষিত হয়। অবশ্য কতকগুলো শিল্পে বেসরকারি শিল্পপতিরাও প্রবেশ করতে পারবে। ভারী বিনিয়োগ ক্ষেত্রটিও সাধারণভাবে রাষ্ট্রের হাতে থাকবে বলে ঘোষণা করা হয়। তবে প্রয়োজনে বেসরকারি শিল্প গোষ্ঠীকেও এই ক্ষেত্রে উৎপাদনের অনুমতি দেওয়া হবে। মধ্যম স্থানীয় ক্ষেত্রে বেসরকারি উদ্যোগ উৎপাদন করবে। আর সংরক্ষিত ক্ষেত্রটি ক্ষুদ্র শিল্পের জন্য সংরক্ষিত রাখা হয়। সুতরাং, 1973 সালের শিল্পনীতিতে সরকারি ক্ষেত্রের এলাকা আরও বিস্তৃত করা হয়।

1973 সালের শিল্পনীতির পর 1977 সালে জনতা সরকার নতুন শিল্পনীতি ঘোষণা করে। এই শিল্পনীতিতে শিল্পের বিকেন্দ্রীকরণের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এই শিল্পনীতির মূল লক্ষ্য ছিল দেশের ছোটো ছোটো শহরে এবং গ্রামাঞ্চলে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের বিস্তার ঘটানো। এই লক্ষ্য পূরণের জন্য ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের জন্য সংরক্ষিত দ্রব্যের সংখ্যা বাড়িয়ে 808টি করা হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, 1948, 1956 এবং 1973 সালের শিল্পনীতিতে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের বিকাশের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। শ্রমিক নিয়োগের ক্ষেত্রে এবং আয় বণ্টনের বৈষম্য কমাতে ক্ষুদ্র শিল্পের অবদানের কথা বিবেচনা করেই এই শিল্পের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এই নীতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে 1950-1980 এই সময়কালে ভারত সরকার ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নতির জন্য নানা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ব্যবস্থা হল : (i) 1955 সালে জাতীয় ক্ষুদ্র শিল্প কর্পোরেশন (National Small Industries Corporation বা NSIC) গঠন, (ii) 1957 সালে খাদি ও গ্রামীণ শিল্প কমিশন (Khadi and Village Industries Commission বা KVIC) স্থাপন, (iii) ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পকে অর্থ সাহায্য করার জন্য 1951 সালে রাজ্য অর্থ কর্পোরেশন (State Financial Corporations বা SFCs) আইন পাশ করে বিভিন্ন রাজ্যে এরূপ কর্পোরেশন গঠনের প্রচেষ্টা, (iv) 1960 সাল থেকে বিভিন্ন রাজ্যে রাজ্য শিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন (State Industrial Development Corporation বা SIDC) প্রতিষ্ঠা, v) ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পগুলিকে অর্থ সাহায্যের জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সহায়তায় 1956 সালে স্টেট ব্যাঙ্ক কর্তৃক পাইলট প্রকল্প গ্রহণ, (vi) 1969 সালে প্রথম দফায় 14টি ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে অধিক পরিমাণ ঋণদান, (vii) প্রথম পরিকল্পনার শেষ নাগাদ (1956) বেশ কয়েকটি বোর্ড গঠন করা হয় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উন্নতির জন্য। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল : অল ইন্ডিয়া হ্যান্ডলুম বোর্ড, ক্ষুদ্র শিল্প বোর্ড, সেন্ট্রাল সিল্ক বোর্ড, কয়ার (coir) বোর্ড প্রভৃতি।

সুতরাং, দেখা যাচ্ছে 1980 সাল পর্যন্ত ভারতের শিল্পের উন্নতিতে সরকারের ভূমিকাই মুখ্য; বেসরকারি উদ্যোগপতিদের বা বাজারি শক্তির ভূমিকা এক্ষেত্রে তুলনায় নগণ্য। বিমান পরিবহন, জাহাজ পরিবহন, সড়ক পরিবহন প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামো উন্নয়নের ক্ষেত্রেও সরকারি ক্ষেত্রের অবদান অনস্বীকার্য। 1980 সাল পর্যন্ত এসমস্ত ক্ষেত্রে বেসরকারি মূলধনের কোনো অস্তিত্বই ছিল না। শক্তিক্ষেত্রেও বর্তমান অগ্রগতির পিছনে রয়েছে সরকারি ক্ষেত্রের উদ্যম ও প্রচেষ্টা। 1956 সালে গঠিত হয় Oil and Natural Gas Corporation (ONGC), National Thermal Power Corporation Limited (NTPC) স্থাপিত হয় 1975 সালে, Oil India Limited (OIL) প্রতিষ্ঠিত হয় 1953 সালে ইত্যাদি। এই সমস্ত সংস্থা ভারতের শক্তিক্ষেত্রের বিকাশে বিপুল সাহায্য করেছে। আর এগুলি প্রতিষ্ঠিত হয় সরকারি ক্ষেত্র হিসাবেই। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়নের জন্য 1951 সালে পশ্চিমবঙ্গের খড়্গপুরে প্রতিষ্ঠিত হয় Indian Institute of Technology (IIT)। ওই সময়ের কাছাকাছি বোম্বে, মাদ্রাজ, কানপুর এবং দিল্লিতেও অনুরূপ প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হয়। এছাড়া 1960-এর দশকের শুরুতে স্থাপিত হয় আঞ্চলিক ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজসমূহ (Regional Engineering Colleges বা REC) যাদের বর্তমানে বলা হয় National Institute of Technology (or NIT)।

শিল্পের পাশাপাশি কৃষি ক্ষেত্রের উন্নতির জন্যও ভারতের সরকারি ক্ষেত্রে অবদান অনস্বীকার্য। আমরা জানি, কৃষি উন্নতির জন্য চাই জলসেচ ব্যবস্থার উন্নতি ও প্রসার। জলসেচ প্রসারের জন্য পরিকল্পনাকালে ভারতে বিভিন্ন বহুমুখী নদী-উপত্যকা প্রকল্প (Multipurpose River Valley Projects) গৃহীত ও রূপায়িত হয়েছে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল দামোদর উপত্যকা প্রকল্প (Damodar Valley Corporation বা DVC) যা স্থাপনের কাজ শুরু হয় 1949 সালে, ভাকরা নাঙ্গাল প্রকল্প (1963), নাগার্জুন সাগর প্রকল্প (1967), মহানদী (হীরাকুদ) প্রকল্প (1957), কোশি প্রকল্প (1954), চম্বল প্রকল্প (1954), তুঙ্গভদ্রা প্রকল্প (1953) প্রভৃতি। দেখা যাচ্ছে, এই প্রকল্পগুলি 1950 অথবা 1960 সালে রূপায়িত হয়েছে। এইসব বহুমুখী নদী-উপত্যকা প্রকল্পগুলি যে সমস্ত ক্ষেত্রে সাহায্য করেছে সেগুলি হল : জলসেচের প্রসার, জলবিদ্যুৎ উৎপাদন, মৎস্যচাষ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, বন সংরক্ষণ, ভূমিক্ষয় রোধ, পর্যটন কেন্দ্র স্থাপন প্রভৃতি। আর এই প্রকল্পগুলি গড়ে উঠেছে সরকারি উদ্যোগে।

ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রসারেও সরকারি ক্ষেত্রের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। 1950-80 এই সময়কালে ভারত সরকার শিল্পায়নের যে কৌশল অবলম্বন করেছে তাকে বলা হয় অন্তর্মুখী উন্নয়ন কৌশল (inward-looking strategy)। এক্ষেত্রে একদিকে যেমন রপ্তানি প্রসারের চেষ্টা করা হয়েছে, অন্যদিকে তেমনি আমদানি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টাও করা হয়েছে। দেশীয় শিল্পকে বিদেশি প্রতিযোগিতার হাত থেকে রক্ষা করে শিল্পায়ন ঘটানো ছিল এর মূল কথা। অর্থাৎ আমদানি নিয়ন্ত্রণ করে দেশের মধ্যে আমদানি দ্রব্যের পরিবর্ত দ্রব্য উৎপাদন করা। শিল্পায়নের এই নীতিকে বলা হয় আমদানি পরিবর্ততার নীতি (Policy of Import Substitution)। পাশাপাশি অবশ্য রপ্তানি প্রসারের উপরেও ভারত সরকার গুরুত্ব আরোপ করেছে। কেননা, ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হল লেনদেন ব্যালান্সে ক্রমবর্ধমান এবং দীর্ঘকালীন ভিত্তিতে ঘাটতি। এই ঘাটতি দূর করার জন্য একদিকে যেমন আমদানি নিয়ন্ত্রণ করে আমদানি ব্যয় কমানোর চেষ্টা করা হয়েছে, অন্যদিকে তেমনি রপ্তানির প্রসার (exportion promotion) ঘটিয়ে রপ্তানি আয় বাড়ানোর চেষ্টা করা হয়েছে। এই রপ্তানি প্রসারের লক্ষ্যে সরকার নানা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছে। 1950-80 সময়কালে স্থাপিত উল্লেখযোগ্য এরূপ প্রতিষ্ঠানগুলি হল : (i) রপ্তানি প্রসার পর্ষদ (Export Promotion Council) যা 1965 সালে স্থাপিত হয়, (ii) রপ্তানিকারীদের ঋণ ও রপ্তানি ঝুঁকির বিমার জন্য 1964 সালে স্থাপিত হয় Export Credit and Guarantee Corporation (ECGC), (iii) ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের রপ্তানি প্রসারের জন্য 1956 সালে গঠিত হয় Trade Development Authority (TDA) (iv) 1956 সালে স্থাপিত হয় State Trading Corporation of India (STCI) প্রভৃতি।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, কৃষি, শিল্প, বৈদেশিক বাণিজ্য প্রভৃতি সবক্ষেত্রেই ভারতের সরকারি ক্ষেত্র এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। 1980 সাল পর্যন্ত এই কথাটি বিশেষভাবে প্রযোজ্য। অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য সরকার সবকিছুকে বাজারি ব্যবস্থার উপর (অ্যাডাম স্মিথ যাকে বলেছেন অদৃশ্য হস্ত বা invisible hand) ছেড়ে দেয়নি। কোনো ক্ষেত্রে সরকারি নিয়ন্ত্রণের দ্বারা,

আবার কোনো ক্ষেত্রে উৎসাহ-প্রদানের (incentive) দ্বারা সরকার অর্থনৈতিক উন্নয়নের চেষ্টা করেছে। 1950-80 সময়কালে ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নে তাই সরকারি ক্ষেত্রেরই প্রাধান্য লক্ষ করা যায়। কিন্তু 1980 সালের পর থেকে সরকার বিভিন্ন অর্থনৈতিক কার্যকলাপ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিতে শুরু করে। পরিবর্তে সরকার বাজারি ব্যবস্থার উপর নির্ভর করতে শুরু করে। ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নের এই দ্বিতীয় পর্ব বা পর্যায় নিয়ে আমরা এবার আলোচনা করব।

৩.৪.২ ভারতের উন্নয়নের দ্বিতীয় পর্ব বা পর্যায় : বাজারি ব্যবস্থার প্রাধান্য

1950-80 সময়কালকে ভারতের উন্নয়নে সরকারি ক্ষেত্রের প্রাধান্যের কাল বলা যায়। ওই সময়কালে গৃহীত উন্নয়ন কৌশলকে আমরা বলে থাকি অন্তর্মুখী উন্নয়ন কৌশল। কিন্তু 1980 সালের পর থেকে ভারত সরকারের উন্নয়ন সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটতে থাকে। 1980 সালে কংগ্রেস সরকার ক্ষমতায় ফিরে যে শিল্পনীতি ঘোষণা করে, তাতে সরকারি হস্তক্ষেপের চেয়ে প্রতিযোগিতা বা বাজার ব্যবস্থার উপর জোর দেওয়া হয়। 1980 সালের শিল্পনীতির মূল বিষয়গুলি ছিল : (i) সরকারি ক্ষেত্রের কার্যকরী পরিচালনা, (ii) বেসরকারি ক্ষেত্রের প্রসার, বিশেষত পিছিয়ে পড়া জেলায়, (iii) ক্ষুদ্র শিল্পের সংজ্ঞার উদারীকরণ এবং (iv) বৃহৎ শিল্পের আয়তন প্রসারের ক্ষেত্রে স্বয়ংক্রিয় অনুমতি। ওইভাবে, 1980 সালের শিল্পনীতির প্রধান লক্ষ্য ছিল অভ্যন্তরীণ বাজারে প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি এবং আধুনিক কলাকৌশল গ্রহণ। এছাড়া, রপ্তানির প্রসার এবং বিদেশি মূলধনকে উৎসাহদান ছিল এই শিল্পনীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। 1980-র শিল্পনীতির আর একটি মুখ্য বৈশিষ্ট্য হল শিল্প লাইসেন্স নীতি উদার ও সরল করা। এক কথায়, 1980 সালের শিল্পনীতির মূল কথা হল উদারীকরণ।

এই উদারীকরণের নীতি চরম রূপ পায় 1991 সালের শিল্পনীতিতে। 1991 সালের নতুন শিল্পনীতির 5টি উল্লেখযোগ্য দিক আমরা সংক্ষেপে উল্লেখ করতে পারি। সেগুলি হল : (i) শিল্প লাইসেন্স সংক্রান্ত সরকারের নীতি, (ii) বিদেশি বিনিয়োগ সম্পর্কে নীতি, (iii) বিদেশি প্রযুক্তি সম্পর্কে নীতি, (iv) সরকারি ক্ষেত্র সম্পর্কিত নীতি এবং (v) একচেটিয়া এবং নিষেধমূলক কাজকর্ম সংক্রান্ত নীতি। এই নতুন শিল্পনীতিতে সরকারি ক্ষেত্রের জন্য শুধুমাত্র 8টি শিল্পকে সংরক্ষিত করা হয়েছে। 1973 সালের শিল্পনীতিতে এই সংখ্যাটি ছিল 26 যেগুলি মূল ক্ষেত্রের (core sector) অধীনে সরকারি ক্ষেত্রের জন্য সংরক্ষিত থাকবে বলা হয়েছিল। 1991 সালের শিল্পনীতিতে সরকারি ক্ষেত্রের জন্য 8টি সংরক্ষিত শিল্প হল : প্রতিরক্ষার জন্য অস্ত্রশস্ত্র উৎপাদন, আণবিক শক্তি, কয়লা ও লিগনাইট, খনিজ তেল প্রভৃতি। তবে বলা হয়েছিল যে প্রয়োজনে এসব ক্ষেত্রেও ব্যক্তিগত উদ্যোগকে প্রবেশ করার অনুমতি দেওয়া হতে পারে। শিল্প লাইসেন্স নীতি সম্পর্কে বলা হয় যে, মাত্র 18টি শিল্পের ক্ষেত্রে লাইসেন্স গ্রহণ আবশ্যিক। বাকি সমস্ত শিল্পের ক্ষেত্রে কোনোরূপ লাইসেন্সের প্রয়োজন হবে না। এভাবে নতুন শিল্পনীতিতে উদারীকরণের (liberalisation) নীতি গ্রহণ করা হয়। বিদেশি বিনিয়োগকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য কতকগুলি শিল্পকে অগ্রাধিকার প্রাপ্ত শিল্প হিসাবে 1991 সালের শিল্পনীতিতে চিহ্নিত করা হয়েছে। এইসব

শিল্পের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল বয়লার, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি, বৈদ্যুতিক মোটর, পরিবহন, কৃষি যন্ত্রপাতি প্রভৃতি। এগুলির ক্ষেত্রে কোনো কোম্পানির শেয়ারের 51 শতাংশ পর্যন্ত বিদেশি বিনিয়োগের অনুমতি দেওয়া হবে। এই উদ্দেশ্যে FERA (Foreign Exchange Regulation ACT) আইনের সংশোধনের কথা বলা হয়। আরো বলা হয় যে, অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত তালিকার শিল্পগুলিকে বিদেশি প্রযুক্তি গ্রহণ করার জন্য অবাধে অনুমতি দেওয়া হবে। বিদ্যুতের ক্ষেত্রে বিদেশি বিনিয়োগ 100% পর্যন্ত হতে পারবে বলা হয়। এছাড়া কোনো অনাবাসী ভারতীয় অগ্রাধিকার প্রাপ্ত ক্ষেত্রে 100% পর্যন্ত বিনিয়োগ করতে পারবে। সরকারি ক্ষেত্রের শিল্পগুলি সম্পর্কে বলা হয় যে, দীর্ঘকাল ধরে যে সব সরকারি উদ্যোগ রুগ্ন হয়ে রয়েছে, সেগুলিকে অন্য শিল্পের সঙ্গে যুক্ত করা বা বন্ধ করে দেওয়া হবে। এছাড়া, সরকারি ক্ষেত্রের কিছু শেয়ার মিউচুয়াল ফান্ড, আর্থিক প্রতিষ্ঠান অথবা সাধারণ শ্রমিক বা নাগরিকদের কাছে বিক্রি করে দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়। অর্থাৎ সরকারি ক্ষেত্রের বেসরকারিকরণ (Privatisation) করার কথা বলা হয়। তা ছাড়া, বড় বড় শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির সম্প্রসারণের পথে আগে যা বাধা ছিল, সেগুলি MRTP (Monopolies and Restrictive Trade Practices) আইনের সংশোধন করে অপসারণ করা হবে বলে শিল্পনীতিতে ঘোষণা করা হয়। পাশাপাশি, ভারত সরকার বিশ্বায়ন (globalisation) প্রক্রিয়াও শুরু করে। কোনো অর্থনীতির বিশ্বায়ন বলতে সেই অর্থনীতির সঙ্গে বিশ্ব অর্থনীতির সংযুক্তিকরণকে বোঝায়। ভারতে এই বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার শুরু 1980-র দশকের প্রথম দিকে। তবে এই প্রক্রিয়া জোর গতি পায় 1991 সালে নতুন অর্থনৈতিক নীতি এবং নতুন শিল্পনীতি গ্রহণ করার পর থেকে। ভারতীয় অর্থনীতির প্রসঙ্গে বিশ্বায়ন বলতে বোঝায় বিদেশি মূলধনের অবাধ প্রবেশ, ভারতীয় কোম্পানিগুলিকে বিদেশি কোম্পানির সঙ্গে সহযোগিতা করতে (collaboration) অনুমতি দেওয়া, ভারতীয় কোম্পানির বিদেশে যৌথ উদ্যোগ স্থাপন করতে অনুমতি দেওয়া ও আমদানি উদারীকরণ প্রভৃতি। মোটামুটি ভাবে, 1985 সাল থেকেই ভারত এই ধরনের কর্মসূচি গ্রহণ করে আসছে। বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার সহায়ক হিসাবে তিনটি গৃহীত ব্যবস্থা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য : (i) বৈদেশিক বাণিজ্যের চলতি খাতে টাকার রূপান্তরযোগ্যতা স্থাপন, (ii) আমদানি উদারীকরণ এবং (iii) বিদেশি মূলধনের প্রবেশ অবাধ করা।

এভাবে সরকার নতুন শিল্পনীতি (1991) এবং নতুন আর্থিক নীতির (New Economic Policy) মাধ্যমে যে কর্মসূচি গ্রহণ করেছে তাকে বলা হচ্ছে উদারীকরণ, বেসরকারিকরণ এবং বিশ্বায়ন বা ভুবনীকরণ (Liberalisation, Privatisation and Globalisation বা, সংক্ষেপে LPG)। এই নীতির দ্বারা ভারত সরকার দেশে অবাধ অর্থনীতি বা প্রতিযোগিতার অর্থনীতি প্রবর্তন করতে চেয়েছে। সরকারের যুক্তি মূলত তিনটি : (i) অর্থনৈতিক কাজকর্মে নিয়ন্ত্রণ কমালে দেশে বিদেশি মূলধন ও প্রযুক্তির আগমন হবে (ii) শিল্পে নিয়ন্ত্রণ তুলে নিলে প্রতিযোগিতা বাড়বে। বাজার ব্যবস্থা দক্ষতা বাড়াতে সাহায্য করে। ফলে শিল্পক্ষেত্রে দক্ষতা বাড়বে। (iii) সরকারি ক্ষেত্রের উন্নতি আদৌ আশাব্যঞ্জক নয়। অনেক সরকারি কোম্পানি লোকসানে চলছে এবং রুগ্ন হয়ে পড়েছে। তাই, সরকারি ক্ষেত্রের পরিধি কমালে সম্পদের অপচয় কমবে। তাই বলা হল যে, সরকারি শিল্পগুলিকে আর 'holy cow' বলে বিবেচনা করা হবে না। এমনকি, 1990-

এর দশকে ভারত সরকার মুনাফা অর্জনকারী কিছু সরকারি শিল্পোদ্যোগের শেয়ার বেসরকারি শিল্পপতিদের কাছে বিক্রির কার্যক্রম গ্রহণ করে। একে বিলগ্নিকরণ কর্মসূচি (disinvestment programme) বলা হয়। নতুন শতাব্দীতে ভারতে এটাই বেসরকারিকরণের প্রধান পন্থা বা পদ্ধতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। সরকারকে এ বিষয়ে পরামর্শ দেবার জন্য 1996 সালের আগস্ট মাসে Disinvestment Commission গঠন করা হয়। 1998 সালের 31 মার্চ পর্যন্ত প্রধান প্রধান যে সমস্ত সরকারি শিল্পে বিলগ্নিকরণ হয়েছে, তার একটি তালিকা নীচে দেওয়া হল।

সারণি : ভারতে প্রধান প্রধান বিলগ্নিকরণ (31. 3. 1998 পর্যন্ত)

ক্রমিক নং	কোম্পানির নাম	বিলগ্নিকৃত শেয়ারের শতকরা অংশ
1	Mahanagar Telephone Nigam Ltd	43.80
2	Bharat Earthmovers Ltd.	34.19
3	Bharat Petroleum Corporation Ltd.	33.80
4	Videsh Sanchar Nigam Ltd.	33.04
5	Bharat Heavy Electricals Ltd.	32.28
6	Hindustan Zinc Ltd.	24.08
7	Hindustan Petrochemicals Corporation Ltd	22.98

2000 সাল থেকে এই বিলগ্নিকরণ কর্মসূচি আরো গতি পেয়েছে। রেল, ব্যাঙ্ক, বিমা, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ইত্যাদি ক্ষেত্রেও বেসরকারিকরণ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। এভাবে সরকার বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে নিজেকে সরিয়ে নিচ্ছে এবং সেখানে অবাধ বাজার ব্যবস্থা বা প্রতিযোগিতার আবহ সৃষ্টি করতে চাইছে। একথা ঠিক যে, 2017 সাল পর্যন্ত ভারতে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা চালু ছিল। কিন্তু সপ্তম পরিকল্পনার পর থেকেই ভারত সরকার শিল্প বাণিজ্যের প্রসারের ক্ষেত্রে বেসরকারি পুঁজির উপর বেশি বেশি নির্ভর করেছে। সরকারের এই উন্নয়ন কৌশলকে বলা হচ্ছে বহির্মুখী উন্নয়ন কৌশল (outward-looking strategy)। বিদেশি মুদ্রার উপর নিয়ন্ত্রণ কমাতে FERA আইন তুলে দেওয়া হয়েছে। পরিবর্তে আনা হয়েছে FEMA (Foreign Exchange Management Act) যা পূর্বের আইনের চেয়ে অনেক শিথিল এবং উদার। এছাড়া, দেশের শিল্পক্ষেত্রে বড় বড় শিল্পপতিদের আধিপত্য নিয়ন্ত্রিত করতে এবং এদের প্রতিযোগিতার হাত থেকে ছোটো ও মাঝারি শিল্পগুলোকে রক্ষা করতে সেই 1969 সালে পাশ হয়েছিল MRTP আইন (Monopolies and Restrictive Trade Practices Act)। উদ্দেশ্য ছিল, দেশে অর্থনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন রোধ করা এবং বড় ফার্মের একচেটিয়া কাজকর্ম বন্ধ করা। 1991 সালের শিল্পনীতিতে এই

আইন তুলে দেওয়ার কথা বলা হয়। ফলে MRTP আইনের বদলে তৈরি হল ভারতের প্রতিযোগিতা কমিশন (Competition Commission of India বা CCI)। এটি 2009 সালের মে মাস থেকে পূর্ণভাবে কার্যকর হয়েছে। ঐ বছর সেপ্টেম্বর মাসে MRTP Act বাতিল করা হয় এবং অক্টোবর মাসে MRTP কমিশন বিলোপ করা হয়। যুক্তি দেওয়া হল, নতুন বিশ্বজনীন প্রতিযোগিতার বাজারে বড় আয়তনের ফার্মই শুধু টিকে থাকতে পারবে। তাই ফার্মের আয়তনের উপর কোনো বাধা সৃষ্টি করা ঠিক নয়। শুধুমাত্র ফার্মগুলির প্রতিযোগিতা বিরোধী কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণ করবে এই প্রতিযোগিতা কমিশন। এভাবে সুস্থ বাজার ব্যবস্থা বা প্রতিযোগিতা নিশ্চিত করতেই তৈরি হল ভারতের প্রতিযোগিতা কমিশন। আবার, ভারতের পরিকল্পনা কমিশনও তুলে দেওয়া হয়েছে। পরিবর্তে 2015 সালের 1 জানুয়ারি প্রতিষ্ঠিত হল NITI (National Institution for Transforming India) আয়োগ। সুতরাং পরিকল্পনার মাধ্যমে সরকারি হস্তক্ষেপের শেষ জায়গাটুকুও এখন আর নেই। দ্বাদশ পরিকল্পনা (2012-17) ছিল ভারতের শেষ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা। বর্তমানে NITI আয়োগ ভারত সরকারের পলিসি থিঙ্ক-ট্যাঙ্ক হিসাবে কাজ করছে। সরকারের নীতি নির্ধারণে অঙ্গরাজ্যগুলিকে সামিল করে এগিয়ে যাওয়ার লক্ষ্য ঘোষণা করেছে NITI আয়োগ। এভাবে যুক্তরাষ্ট্রীয় আর্থিক ব্যবস্থাকে মজবুত করার লক্ষ্য নিয়ে NITI আয়োগ কাজ করে চলেছে। সরাসরি অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে এখন সরকারের ভূমিকা অনেকটাই অপ্রত্যক্ষ। বরং বিভিন্ন বিপর্যয় মোকাবিলার (যেমন, সাম্প্রতিক কোভিড অতিমারি, আয়লা জলোচ্ছ্বাস, আমফান ও ইয়াস ঘূর্ণিঝড় প্রভৃতি) ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলির আরও সদর্থক ভূমিকা গ্রহণ করার প্রচেষ্টা লক্ষ করা যাচ্ছে। 1980 সালের পরবর্তী সময়ে ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নে তাই মূলত বাজারি ব্যবস্থার প্রাধান্যই বলা যায়।

৩.৫ সারাংশ

১. ভারতের উন্নয়শীল দেশে রূপান্তর :

স্বাধীনতার প্রাক্কালে ভারত ছিল একটি অনুন্নত ও অসংগঠিত অর্থনীতি। একে উন্নয়নশীল দেশে রূপান্তরের জন্য 1950-51 সাল থেকে পরিকল্পিত ভাবে উন্নয়নের কার্যক্রম শুরু হয়। এই পরিকল্পিত পথে যাত্রার শুরুর পিছনে প্রধান কারণগুলি হল : (i) ভারতকে কল্যাণব্রতী রাষ্ট্র হিসাবে গড়ে তোলা, (ii) ব্যক্তিগত উদ্যোগের বিশৃঙ্খলা দূর করা, (iii) দেশের সম্পদের কাম্য ব্যবহার ঘটানো, (iv) দেশের পরিকাঠামোর উন্নতি ঘটানো, (v) মূল ও ভারী শিল্প গড়ে তোলা, এবং (vi) দেশের দুর্বল শ্রেণির জন্য শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পানীয় জল প্রভৃতি সরবরাহ করা। 2017 সালের মার্চ মাস পর্যন্ত ভারতে 12টি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং কয়েকটি বার্ষিক পরিকল্পনা গৃহীত ও রূপায়িত হয়েছে। এসবের ফলে ভারত তার প্রাক্-স্বাধীনতা পর্বের অনড়তা কাটিয়ে উঠেছে। ভারতের জাতীয় ও মাথাপিছু আয় বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে, মূল ও ভারী শিল্প গড়ে উঠেছে, সেচ, পরিবহন, বিদ্যুৎ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি ক্ষেত্রে অনেক

উন্নতি ঘটেছে, জাতীয় আয়ের ক্ষেত্রগত বণ্টনে কাম্যদিকে পরিবর্তন ঘটেছে, বৈদেশিক বাণিজ্যের কাঠামোতেও পরিবর্তন ঘটেছে, দেশে সঞ্চয় ও বিনিয়োগের হার বেড়েছে, শিল্প ও পরিবহনের ক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত উন্নতি ঘটেছে, অনেক শহর ও নগরের পত্তন হয়েছে ইত্যাদি। কিন্তু এরই পাশাপাশি, ভারতীয় অর্থনীতিতে কিছু ভয়ানক সমস্যাও রয়ে গেছে। সেই সমস্যাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল দারিদ্র্যের সমস্যা, বেকারত্বের সমস্যা, জনসংখ্যার সমস্যা, আয় ও সম্পদ বণ্টনে বৈষম্যের সমস্যা, কালো টাকা বা সমান্তরাল অর্থনীতির সমস্যা প্রভৃতি। 2022 সালের জানুয়ারি মাসে ভারতের মোট জনসংখ্যা 140 কোটি ছাড়িয়ে গেছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার পরিকল্পনাকালে সামান্য কমলেও প্রতিবছর বাড়তি জনসংখ্যার আয়তনও খুব বেশি। এই বিপুল জনসংখ্যার একটা বড় অংশকে কাজ দেওয়া সম্ভব হয়নি। ফলে ভারতে রয়েছে বিপুল সংখ্যক বেকার শ্রমিক। আর তারা বেকার বা কর্মহীন বলেই দরিদ্র। ভারতের জনসংখ্যার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ ব্যক্তি দারিদ্র্য সীমার নীচে বাস করে। পরিকল্পনাকালে উৎপাদন বেড়েছে, কিন্তু কর্মনিয়োগ বাড়েনি। অনেকে এটিকে তাই কর্মহীন প্রসার (jobless growth) বলে অভিহিত করেছেন। এছাড়া, ভারতে আয় ও সম্পদ বণ্টনে তীব্র অসাম্য রয়েছে। এছাড়া রয়েছে কালো টাকার সমস্যা বা কর-বহির্ভূত আয়ের সমস্যা। তাছাড়া, সাধারণ দ্রব্যের ক্ষেত্রে দীর্ঘদিন যাবৎ মুদ্রাস্ফীতি বা দামস্তরের বৃদ্ধি ঘটে চলেছে। এর ফলেও সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার ব্যয় তথা দুর্দশা বেড়েছে। ব্যাপক বেকারত্ব ও অর্ধ-বেকারত্বের পাশাপাশি এই মুদ্রাস্ফীতি সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতাকে ভীষণভাবে কমিয়ে দিয়েছে। এভাবে ভারতে কিছু সংখ্যক ব্যক্তি প্রাচুর্যের মধ্যে জীবন কাটাচ্ছে, এবং অন্যদিকে জনসংখ্যার এক বিরাট অংশ দারিদ্র্য ও বেকারির মধ্যে দিনাতিপাত করছে। উন্নত অর্থনীতির সোপানে উঠতে গেলে ভারতকে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে হবে।

২. ভারতের উন্নয়নের দুটি পর্ব বা পর্যায় :

1951 সাল থেকে 2017 সাল পর্যন্ত ভারতে ছিল পরিকল্পনার যুগ। এরপর ভারতের পরিকল্পনা কমিশনের বদলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে NITI (National Institution for Tranforming India) আয়োগ। এই NITI আয়োগ বর্তমানে সরকারের পলিসি থিঙ্ক-ট্যাঙ্ক হিসাবে কাজ করছে। পরিকল্পনা শুরুর বছর থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত ভারতের অর্থনীতিতে নানা পরিবর্তন, নানা ওঠা-নামা ঘটেছে। সমগ্র সময়কালটিকে আমরা দুটি পর্যায় বা পর্বে ভাগ করতে পারি। প্রথম পর্ব বা পর্যায়টি হল 1950 সাল থেকে 1980 সাল পর্যন্ত এবং 1981 সাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত হল দ্বিতীয় পর্ব বা পর্যায়। প্রথম পর্ব বা পর্যায়টি হল সরকারি ক্ষেত্রের প্রাধান্যের পর্ব। আর দ্বিতীয় পর্ব বা পর্যায়টি হল বেসরকারি ক্ষেত্র বা বাজারি শক্তির প্রাধান্যের পর্ব। স্বাধীনতার পর 1980 সাল পর্যন্ত ভারতে 3টি প্রধান শিল্পনীতি ঘোষিত হয় : 1948 সালের শিল্পনীতি, 1956 সালের শিল্পনীতি এবং 1973 সালের শিল্পনীতি। 1948 সালের শিল্পনীতিতে মিশ্র অর্থনীতি গড়ে তোলার কথা বলা হলেও সরকারি ক্ষেত্রের প্রাধান্যের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়। ভবিষ্যতে সরকারি ক্ষেত্রের প্রসার এবং জাতীয়করণের দিকে যে সরকার অগ্রসর হবে তা 1948 সালের শিল্পনীতিতে স্পষ্ট করে দেওয়া হয়। 1956 সালের শিল্পনীতিতে সরকারি ক্ষেত্রের

পরিসর আরো বিস্তৃত করা হয়। যেমন, প্রথম শ্রেণিতে (schedule A) 1948 সালের শিল্পনীতিতে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ শিল্প রাখা হয়েছিল 3টি। 1956 সালে ওই তালিকায় রাখা হয় 17টি শিল্প। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য শিল্পগুলি হল প্রতিরক্ষা, আণবিক শক্তি, লৌহ-ইস্পাত, রেল পরিবহন, জাহাজ নির্মাণ, বিমান নির্মাণ, টেলিফোন, টেলিগ্রাফ ও বেতার যন্ত্রপাতি প্রভৃতি। শিল্পনীতিতে বলা হয় যে, এই শিল্পগুলির উন্নয়নের দায়িত্ব থাকবে সরকারের উপর। এছাড়া, দ্বিতীয় শ্রেণিতে (schedule B) ছিল 12টি শিল্প। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য শিল্পগুলি হল অ্যালুমিনিয়াম, রবার, রাসায়নিক সার, মেশিন টুলস প্রভৃতি। 1956 সালের শিল্পনীতিতে বলা হয় যে, এই তালিকার অন্তর্গত শিল্পগুলিকে ধীরে ধীরে রাষ্ট্রীয় মালিকানায় আনা হবে। সুতরাং, 1956 সালের শিল্পনীতিতে সরকারি ক্ষেত্রের প্রাধান্য বহুল পরিমাণে বাড়ানো হয়। এর পরের উল্লেখযোগ্য শিল্পনীতি হল 1973 সালের শিল্পনীতি। এই শিল্পনীতিতে প্রথম শ্রেণিতে বা মূল ক্ষেত্রে (core sector) 1956 সালের শিল্পনীতির 17টি শিল্পের সঙ্গে আরো 9টি শিল্প যুক্ত করা হয়। এর অর্থ হল, সম্পূর্ণ সরকারি ক্ষেত্রের জন্য সংরক্ষিত শিল্পের সংখ্যা দাঁড়াল 26। সুতরাং, 1973 সালের শিল্পনীতিতে সরকারি ক্ষেত্রের এলাকা আরো বিস্তৃত করা হল। বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও একথা প্রযোজ্য। বস্তুত, 1980 সাল পর্যন্ত ভারতের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সরকারি প্রাধান্য বজায় ছিল।

৩.৬ অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত উত্তরের প্রশ্নাবলী

১. ভারতে কোন্ সালে ব্রিটিশ রাজ্যের অধীনে আসে?

২. সামাজিক পরিকাঠামো কোনগুলি?

৩. অর্থনীতির রূপান্তর যে কোনো দুইটি উল্লেখ কর।

৪. জীবিকা কাঠামোর পরিবর্ত্তন কি?

৫. NCAER কি?

৬. মিশ্র অর্থনীতি কাকে বলে?

মাঝারি উত্তরের প্রশ্নাবলী

১. ভারতের উন্নয়নের প্রথম পর্বে 1948-এর শিল্পনীতির কি ভূমিকা ছিল?

২. 1956 সালের দ্বিতীয় শিল্প নীতিটি ব্যাখ্যা কর।

৩. 1973 এবং 1977 সালের শিল্পনীতির মধ্যে কিরূপ পার্থক্য ছিল?

৪. 1991 সালের শিল্পনীতি উল্লেখযোগ্য দিকগুলি ব্যাখ্যা কর।

৫. নয়া অর্থনীতির মূল বৈশিষ্ট্যগুলি ব্যাখ্যা কর।

দীর্ঘ উত্তরের প্রশ্নাবলী

১. স্বাধীনতার পর ভারতের উন্নয়নশীল দেশ হিসাবে কীরূপ রূপান্তর ঘটেছে বলে তুমি মনে কর? তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও।

২. 1950-80 এই সময়কালে ভারতের উন্নয়নের বর্ণনা দাও।

৩. উদারীকরণের পূর্বের যুগে ভারতের উন্নয়নকে কি সরকার-চালিত উন্নয়ন বলা যায়?

৪. 1980 সালের পর ভারতের উন্নয়নের ধরন বর্ণনা কর।

৫. 1985 সালের পর ভারতের অগ্রগতিকে কি বাজার-ব্যবস্থাভিত্তিক উন্নয়ন বলে তুমি মনে কর? তোমার উত্তরের সমর্থনে যুক্তি দাও।

৬. ব্রিটিশ শাসনকালে ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থার একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা দাও।

সঠিক উত্তর নির্বাচনের প্রশ্নাবলী (MCQ)

১. প্রথম শিল্পনীতি ভারতীয় অর্থনীতিতে কোন সালে হয়েছিল—

(ক) 1948 (খ) 1950
(গ) 1952 (ঘ) কোনোটিই নয়

২. মিশ্র অর্থনীতি কি?

(ক) সরকারী ক্ষেত্র এবং অন্যান্য ক্ষেত্র (খ) বেসরকারী ক্ষেত্র এবং অন্যান্য ক্ষেত্র
(গ) সরকারী ক্ষেত্র এবং বেসরকারী ক্ষেত্র (ঘ) কোনোটিই নয়

৩. 1948, 1956 এবং 1973 সালের শিল্পনীতিতে কোন শিল্পের প্রসারের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়—

(ক) বৃহৎ শিল্প (খ) মাঝারি শিল্প
(গ) ক্ষুদ্র ও কুটীর শিল্প (ঘ) কোনোটিই নয়

৪. আমদানি পরিবর্তাতা কি?

(ক) আমদানী বৃদ্ধি পাওয়া
(খ) রপ্তানি হ্রাস পাওয়া
(গ) আমদানী দ্রব্যের পরিবর্ত্ত দ্রব্য উৎপাদন করা
(ঘ) কোনোটিই নয়

৫. 1991 সালে যে নয়া আর্থিক নীতি প্রণয়ন করা হয় তা কি?

(ক) বেসরকারিকরণ (খ) বিশ্বায়ন

(গ) উদারিকরণ (ঘ) (ক), (খ) এবং (গ) তিনটি একসাথে

৩.৭ গ্রন্থপঞ্জি

১. সরখেল, জয়দেব ও সেখ সেলিম (2022) : ভারতীয় অর্থনীতি, বুক সিন্ডিকেট প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা।

২. Datt, Gaurav & Ashwani Mahajan (2020) : *Indian Economy*, S. Chand and Company Limited, New Delhi.

৩. Puri, V. K. and S. K. Misra (2020) : *Indian Economy*, Himalaya Publishing House, Mumbai.

৪. Kapila, Uma (2017-18) : Indian Economy, Academic Foundation, New Delhi

একক – ৪ ❑ ভারতবর্ষে পরিকল্পনা

গঠন

৪.১ উদ্দেশ্য

৪.২ প্রস্তাবনা

৪.৩ উন্নয়নের লক্ষে ভারতে পরিকল্পনার প্রবর্তন ও বিবর্তন

৪.৪ ভারতীয় পরিকল্পনার উদ্দেশ্যসমূহ এবং লক্ষমাত্রা

৪.৫ **NITI** আয়োগ স্থাপন এবং পরিকল্পনার সমাপ্তি

৪.৬ ভারতীয় পরিকল্পনার সাফল্য

৪.৭ ভারতীয় পরিকল্পনার ব্যর্থতা

৪.৮ সারাংশ

৪.৯ অনুশীলনী

৪.১০ গ্রন্থপঞ্জি

৪.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে ছাত্রছাত্রীরা জানতে পারবে

- ভারতে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ও উন্নয়নের পক্ষে তার প্রবর্তন ও বিবর্তন
- স্বাধীনতার পরবর্ত্তীযুগে ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থার বেহাল দশা এবং সেই কারণে পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা
- ভারতীয় পরিকল্পনার উদ্দেশ্যসমূহ এবং লক্ষমাত্রা
- ভারতীয় পরিকল্পনার সফলতার দিকগুলি কি কি এবং ব্যর্থতার দিকগুলিও কি কি?

৪.২ প্রস্তাবনা

1947 সালে ভারত স্বাধীন হওয়ার পর ভারত সরকার অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়নের অনুসরণে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার নীতি গ্রহণ করে। 1950 সালের মার্চ মাসে ভারতের

তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুর সভাপতিত্বে দেশের আর্থিক সম্পদের সুষম ও যথাযথ ব্যবহারের উদ্দেশে পরিকল্পনা তৈরীর জন্য সরকারি প্রশাসনিক নির্দেশের দ্বারা ভারতের পরিকল্পনা কমিশন গঠন করা হয়। ভারতের পরিকল্পনা কমিশন হল একটি পরামর্শদাতা সংস্থা মাত্র। সাধারণভাবে বলা যায়, কাম্য লক্ষে পৌছানোর জন্য বর্তমানের সম্ভাব্য উপাদানের ভিত্তিতে নির্দ্দিষ্ট সময়ভিত্তিক যে কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়, তাকে পরিকল্পনা বলে। উন্নত এবং উন্নয়নশীল উভয় অর্থব্যবস্থায় অর্থনৈতিক পরিকল্পনার প্রয়োজন আছে। ভারতের ন্যায় উন্নয়নশীল দেশে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার যৌক্তিকতা এবং প্রয়োজনীয়তা অনেক বেশী ছিল এবং সেই অনুযায়ী ১৯৫১ সাল থেকে প্রথম পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় এবং পরবর্ত্তীকালে মোট বারটি পরিকল্পনার দ্বারা ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থাকে একটি সুদৃঢ় জায়গায় আনা সম্ভব হয়েছে। তাছাড়া উদ্দেশ্যের মধ্যে যেমন স্বল্পকালীন লক্ষ্য আছে, তেমনি আছে দীর্ঘকালীন লক্ষ। অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা অর্জনের লক্ষে ভারত অনেক দূর অগ্রসর হয়েছে। যেমন খাদ্য শস্যের ব্যাপারে ভারত প্রায় স্বনির্ভরতা অর্জন করেছে যা ভারতীয় পরিকল্পনার একটি উল্লেখযোগ্য সাফল্য, এছাড়া মূলধনী দ্রব্যের তৈরী ইঞ্জিনিয়ারিং দ্রব্য, পরিবহন সরঞ্জাম, লৌহ ও ইস্পাত ক্ষেত্রেও স্বনির্ভরতা অর্জন করেছে। শুধু তাই নয়, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে ভারতের স্বনির্ভরতা উল্লেখযোগ্য। ভারত একন দেশীয় যন্ত্রপাতি ও দেশীয় প্রযুক্তি দিয়ে বৃহৎ উৎপাদন প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে। ফলে বিদেশী সাহায্যের উপর ভারতের নির্ভরতা কিছুটা হ্রাস পেয়েছে।

৪.৩ উন্নয়নের লক্ষে ভারতে পরিকল্পনার প্রবর্তন ও বিবর্তন

1947 সালে ভারত যখন স্বাধীনতা অর্জন করে, তখন ভারত ছিল এক সমস্যাসংকুল দেশ। দীর্ঘ 190 বছর দেশটি বিদেশি শাসনের অধীনে ছিল (1757-1947)। সেই পরাধীনতার যুগে দেশটি বিদেশি শাসকের দ্বারা নানা ভাবে শোষিত হয়েছে। স্বাধীনতার সাথে এল দেশবিভাগ। অখণ্ড ভারত ভেঙে তৈরি হল ভারত ও পাকিস্তান এই দুই স্বাধীন রাষ্ট্র। দেশবিভাগও নিয়ে এল শরণার্থী সমস্যা-সহ অন্যান্য নানা সমস্যা। দেশটির অর্থনৈতিক ভিত আদৌ শক্ত ছিল না। তার সাথে যুক্ত হল বাড়তি জনসংখ্যার সমস্যা ও ভালো কৃষিজমির ঘাটতি। এরূপ অর্থনৈতিক বিপন্নতার সময় দেশটির উন্নয়ন ঘটাতে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার প্রবর্তন করা হয়। এরূপ অনুন্নত দেশের উন্নয়ন ঘটাতে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার গুরুত্ব অপরিসীম। পরিকল্পনা ছাড়া এরূপ অনুন্নত দেশের উন্নয়ন ঘটানো খুবই দুঃসাধ্য। নানা কারণে এ সমস্ত দেশে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রয়োজন। প্রথমত, অনুন্নত দেশে বাজারি শক্তি তেমন শক্তিশালী নয়। ফলে দাম ব্যবস্থা বা বাজার ব্যবস্থার দ্বারা সম্পদের কাম্য বণ্টন ঘটে না। তাই বাজার ব্যবস্থার অসম্পূর্ণতা দূর করতে এসব দেশে পরিকল্পনা প্রয়োজন। দ্বিতীয়ত, ব্যক্তিগত উদ্যোগকে যদি অবাধে কাজ করতে দেওয়া হয়, তাহলে তা নানা বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে। এতে সামাজিক সম্পদের অপচয় হয়, আয় ও সম্পদ বণ্টনে বৈষম্য তৈরি হয় প্রভৃতি। অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মাধ্যমেই এই অকাম্য বিষয়গুলি দূর করা যায় বা তাদের তীব্রতা কমানো যায়। তৃতীয়ত, অনুন্নত দেশে দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র কাজ করে। অর্থনীতিবিদ

নার্কস্-এর মতে, এই দুষ্টচক্রের পিছনে প্রধান কারণ হল মূলধনের স্বল্পতা। পরিকল্পনার মাধ্যমেই মূলধন সংগ্রহ করা এবং সেই মূলধন উৎপাদনশীল বিনিয়োগে নিয়োজিত করা সম্ভবপর হয়। চতুর্থত, অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য দেশের পরিকাঠামো শিল্প উন্নত হওয়া প্রয়োজন। বিদ্যুৎ, জলসেচ, পরিবহন, যোগাযোগ ইত্যাদি হল পরিকাঠামোর উদাহরণ। ব্যক্তিগত উদ্যোক্তারা সাধারণত পরিকাঠামো শিল্পে বিনিয়োগ করতে আগ্রহী হয় না, কেননা এতে বড় আকারের মূলধন লাগে এবং প্রতিদান পেতে দীর্ঘ সময় লাগে। দেশের সরকারকেই তাই পরিকল্পনার মাধ্যমে পরিকাঠামোর উন্নতি ঘটাতে হয়। পরিকাঠামো উন্নত হলে তখন ব্যক্তিগত উদ্যোক্তরা শিল্পের নানা ক্ষেত্রে বিনিয়োগে আগ্রহী হয়।

এ সমস্ত কারণে উন্নত এবং অনুন্নত উভয় প্রকার দেশেই অর্থনৈতিক পরিকল্পনার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। তবে ভারতের ন্যায় স্বল্পোন্নত দেশে পরিকল্পনার প্রয়োজন আরো বেশি। 1950 সাল নাগাদ ভারতের প্রধান সমস্যাগুলি ছিল : জনসাধারণের দারিদ্র্য, মাথাপিছু আয়ের স্বল্পতা, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে অর্থনীতির বিশৃঙ্খলা, দেশবিভাগের ফলে শরণার্থীর চাপ, বেকারি, আয় বৈষম্য, শিল্পের অনগ্রসরতা প্রভৃতি। এ সমস্ত সমস্যা দূর করতে ভারতেও তাই অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। 1951 সাল থেকে ভারতে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার যুগ শুরু হয় এবং 2017 সালের 31 মার্চ তা শেষ হয়। দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য অর্থনৈতিক পরিকল্পনাকে একটি উপায় হিসাবে গ্রহণ করা হয়। ভারতে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা বা যৌক্তিকতাকে নিম্নলিখিত যুক্তির সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত করা যায়।

প্রথমত, 1950 সালে ভারতে সংবিধান গৃহীত হয়। এই সংবিধানে ভারতকে একটি কল্যাণব্রতী রাষ্ট্র (Welfare state) হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার কথা বলা হয়। অর্থাৎ দেশের সরকারের অন্যতম লক্ষ্য হল জনসাধারণের দারিদ্র্য দূর করা ও কল্যাণ বৃদ্ধি করা। আর সেটি করতে গেলে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার প্রয়োজন। অপরিকল্পিত অর্থনীতিতে (unplanned economy) সম্পদের কাম্য বণ্টন হয় না। সেখানে ব্যক্তিগত উদ্যোক্তারা নিজেদের মুনাফার দিকে লক্ষ্য রেখে উৎপাদন করে। ফলে অনেক সময় দেশে অকাম্য দ্রব্যের উপাদন ঘটে। এতে জনগণের কল্যাণ ব্যাহত হয়। তাই স্বাধীনতার পর পরিকল্পনার মাধ্যমে জনসাধারণের অর্থনৈতিক কল্যাণ বৃদ্ধির প্রচেষ্টা শুরু হয়। তাছাড়া, দারিদ্র্য দূর করে জীবনযাত্রার মান বাড়ানোর জন্যও পরিকল্পনার প্রয়োজন।

দ্বিতীয়ত, শুধুমাত্র উন্নয়ন ঘটালেই চলবে না, দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটাতে হবে। তবেই উন্নত দেশের সঙ্গে অনুন্নত দেশের ব্যবধান কমবে। নতুবা, অনুন্নত দেশটি চিরকাল আপেক্ষিক ভাবে অনুন্নতই থেকে যাবে। অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মাধ্যমেই সরকার দেশের দ্রুত উন্নয়ন ঘটাতে পারে। দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটানোর লক্ষ্যেই ভারতে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গৃহীত হয়।

তৃতীয়ত, ভারতের ন্যায় স্বল্পোন্নত দেশে আয় ও সম্পদ বন্টনে তীব্র বৈষম্য বর্তমান। তা দূর করতে হলে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রয়োজন। অপরিকল্পিত অর্থনীতিতে মুষ্টিমেয় ব্যক্তিগত উদ্যোক্তাদের হাতে মুনাফা জমতে থাকে। অন্যদিকে, দেশের ব্যাপক জনসাধারণ নিম্ন আয় ও দারিদ্র্যের আবর্তে নিমজ্জিত

থাকে। তাছাড়া, এখানে দেশের প্রাকৃতিক সম্পদেরও কাম্য বণ্টন ঘটে না। এসব অবস্থা দূর করতে হলে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার প্রয়োজন। পরিকল্পনার মাধ্যমেই দেশের অকাম্য দ্রব্যের উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করা যায় এবং কাম্য দ্রব্যের উৎপাদন বাড়ানো যায়।

চতুর্থত, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটাতে গেলে মূল ও ভারী শিল্পের প্রসার প্রয়োজন। এগুলো সাধারণত মূলধনি দ্রব্য উৎপাদনকারী শিল্প। কিন্তু ভারতের ন্যায় স্বল্পোন্নত দেশে এধরনের মূলধনি দ্রব্য শিল্পের অভাব। ফলে এখানে মূলধন গঠনের হার খুব কম হয়। ভারতের ন্যায় স্বল্পোন্নত দেশে মূলধন গঠনের হার বৃদ্ধির জন্যও অর্থনৈতিক পরিকল্পনার প্রয়োজন। ব্যক্তিগত উদ্যোগীরা যেমন দেশের পরিকাঠামোর উন্নতিতে বিনিয়োগে আগ্রহী হয় না, তেমনি একই কারণে তারা মূলধনি দ্রব্য উৎপাদনে আগ্রহী হয় না। তাই মূল ও ভারী শিল্প বা মূলধনি দ্রব্যের শিল্প গড়ে তুলতে হলে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রয়োজন। ভারতে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রবর্তনের পিছনে অন্যতম উদ্দেশ্য বা কারণ ছিল দেশে মূলধনি শিল্প গড়ে তোলা।

পঞ্চমত, ভারতের ন্যায় স্বল্পোন্নত দেশে আয় ও সম্পদ বণ্টনের ক্ষেত্রে তীব্র বৈষম্য বর্তমান। এই বৈষম্য হ্রাস করার জন্যও অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রয়োজন। আমরা আগেই বলেছি যে, অপরিকল্পিত অর্থনীতিতে অল্প সংখ্যক ব্যক্তির হাতে আয় ও সম্পদ কেন্দ্রীভূত হয়। পরিকল্পিত অর্থ ব্যবস্থায় উৎপাদন, বণ্টন, ভোগ, বিনিয়োগ প্রভৃতি সম্পর্কে পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে। সাধারণ জনগণের কাছে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সরবরাহ করার জন্যও পরিকল্পনার প্রয়োজন। দরিদ্র ব্যক্তিরা যাতে জীবনধারণের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী পায় তার ব্যবস্থা করাও পরিকল্পনার অন্যতম উদ্দেশ্য।

ষষ্ঠত, স্বাধীনতার আগে থেকেই ভারতে বেকারি এক গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। এই সমস্যার সমাধান করতে হলে শ্রম-নিবিড় উৎপাদন কৌশল গ্রহণ করতে হবে। উপযুক্ত কর্মসূচির দ্বারা ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের প্রসার ঘটাতে হবে। কেননা এই শিল্পগুলিই শ্রম নিবিড় উৎপাদন কৌশল অবলম্বন করে। পাশাপাশি, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্যও নানা দীর্ঘমেয়াদি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। আবার, কৃষিতে রয়েছে বিপুল আয়তনের প্রচ্ছন্ন বেকারত্ব। শিল্পের প্রসারের দ্বারা এই উদ্বৃত্ত শ্রমিকদের কৃষি থেকে শিল্পে সরিয়ে নিয়ে যেতে হবে। এছাড়া, ভারতে রয়েছে শিক্ষিত যুবকদের মধ্যে কর্মহীনতা। উপযুক্ত নিয়োগনীতি প্রবর্তন করে এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রসার ঘটিয়ে এই সমস্যা দূর করা যেতে পারে। আর এই সমস্ত কর্মসূচি বা প্রকল্প গ্রহণ এবং তা রূপায়ণের জন্য অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রয়োজন।

সপ্তমত, 1950 সালের পূর্বে ভারতে কোনো অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ছিল না। ফলে দেশের কিছু অঞ্চলে শিল্পের প্রসার ঘটেছে এবং বাকি অঞ্চল শিল্পে অনুন্নত রয়ে গেছে। অন্যভাবে বলতে গেলে, দেশে শিল্পের বিকাশের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক বৈষম্য দেখা গেছে। শিল্পের ক্ষেত্রে এই আঞ্চলিক বৈষম্য দূর করতেও অর্থনৈতিক পরিকল্পনার প্রয়োজন। পরিকল্পনার মাধ্যমে দেশের অনুন্নত অঞ্চলে শিল্পের বিকাশ ঘটতে পারে। ওই সব অঞ্চলে শিল্পের বিকাশের জন্য নানা সুযোগ-সুবিধা দেওয়া যেতে পারে। এর

ফলে ব্যক্তিগত উদ্যোক্তরা ওই অঞ্চলে শিল্প স্থাপনে আগ্রহী হবে। করের সুবিধা, সস্তায় জল ও বিদ্যুৎ সরবরাহ ইত্যাদি সুবিধা দেওয়া যেতে পারে। পরিকল্পনার মাধ্যমেই তা করা সম্ভব।

অষ্টমত, পূর্বে ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য ছিল ঔপনিবেশিক ধরনের অর্থাৎ ভারত মূলত কৃষিজাত দ্রব্য রপ্তানি ও শিল্পজাত দ্রব্য আমদানি করত। এক্ষেত্রে বাণিজ্য হার সাধারণত রপ্তানি দ্রব্যের প্রতিকূলে থাকে। এই ঔপনিবেশিক ধরনের বাণিজ্য কাঠামো পরিবর্তনের জন্যও ভারতের ন্যায় দেশের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রয়োজন। এর জন্য দেশটির রপ্তানির বৈচিত্র্য সাধন করতে হবে এবং রপ্তানি প্রসারের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। পাশাপাশি, অনাবশ্যক আমদানি নিয়ন্ত্রণ করাও প্রয়োজন। এই রপ্তানি প্রসার ও আমদানি নিয়ন্ত্রণের জন্যও অর্থনৈতিক পরিকল্পনার প্রয়োজন।

সবশেষে, ভারতের ন্যায় স্বল্পোন্নত দেশে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা আরো নানা কারণে প্রয়োজন। সংক্ষেপে সেগুলি হল : অগ্রাধিকার ক্ষেত্রে উন্নয়ন ঘটানো, সমাজের দুর্বল শ্রেণির জন্য কিছু বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ, দেশে মুদ্রাস্ফীতি রোধ করা এবং অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা (stability) বজায় রাখা, সামাজিক ন্যায়-বিচার প্রতিষ্ঠা করা, এবং সর্বোপরি, অর্থনৈতিক স্বয়ম্ভরতা (economic self-sufficiency) অর্জন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, ভারতের ন্যায় স্বল্পোন্নত দেশে একাধিক কারণে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার প্রয়োজন। পরিকল্পনাই দেশটিকে দ্রুত অভীষ্ট লক্ষ্য পূরণে সাহায্য করতে পারে। এজন্যই স্বাধীনতা লাভের পর 1951 সালে ভারত অর্থনৈতিক পরিকল্পনার কর্মসূচি গ্রহণ করে এবং ওই বছর প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রবর্তন করে।

সমগ্র পরিকল্পনাকালে (1951-2017) ভারতীয় পরিকল্পনাগুলির উদ্দেশ্যে, অর্থসংস্থান, কৌশল ইত্যাদি ক্ষেত্রে নানা বিবর্তন ঘটেছে। ভারত সরকার উদারীকরণের নীতি গ্রহণ করতে শুরু করে 1980-র দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে। এই উদারীকরণের নীতি জোর গতি পায় 1991 সালে। ওই বছর 24 জুলাই ভারত সরকার নতুন শিল্পনীতি প্রবর্তন করে। ওই শিল্পনীতিতে উদারীকরণের নীতি পূর্ণরূপ গ্রহণ করে। সরকার বিভিন্ন অর্থনৈতিক কাজকর্মে নিয়ন্ত্রণ তুলে দেয়। একে বলা হয় উদারীকরণ। আবার, সরকারি ক্ষেত্রের জন্য সংরক্ষিত এলাকায় বেসরকারি মূলধন প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয়। পাশাপাশি, অনেক সরকারি উদ্যোগও বেসরকারি মূলধনের কাছে সম্পূর্ণ অথবা অংশত বিক্রির প্রস্তুতি শুরু হয়। একে বলা হয় বেসরকারিকরণ। আবার, আমদানি-রপ্তানির উপর এযাবৎ চালু থাকা নানা বিধিনিষেধ তুলে দিয়ে ভারতীয় অর্থনীতিকে বিশ্ব অর্থনীতির সঙ্গে সংযুক্ত করার উদ্যোগ শুরু হয়। একে বলা হয় বিশ্বায়ন বা ভুবনীকরণ। ভারত সরকারের নয়া আর্থিক নীতি (1991)-কে তাই বলা হয় উদারীকরণ, বেসরকারিকরণ ও বিশ্বায়ন বা ভুবনীকরণের নীতি (Liberalisation, Privatisation and Globalisation বা সংক্ষেপে LPG)। এই নতুন নীতি গ্রহণের পূর্বে ভারতে 7টি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও কয়েকটি বার্ষিক পরিকল্পনা রচিত ও রূপায়িত হয়। সংস্কার নীতি গ্রহণের পূর্বে শেষ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ছিল সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা। এর কার্যকাল ছিল 1 এপ্রিল 1985 থেকে 31 মার্চ 1990। সুতরাং সপ্তম পরিকল্পনার

পর থেকে পরবর্তী পরিকল্পনাগুলিতে উদারনীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে পরিকল্পনা গৃহীত হয়। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাগুলির উদ্দেশ্যগুলিরও পরিবর্তন ঘটে। উদারীকরণের যুগে ভারতের পরিকল্পনাগুলিতে যে সমস্ত পরিবর্তন ঘটেছে, সেগুলি নিম্নলিখিতভাবে সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করা যেতে পারে :

1. সংস্কার-পরবর্তী পরিকল্পনাগুলিতে সরকারি ক্ষেত্র থেকে বেসরকারি ক্ষেত্রে গুরুত্ব সরে গেছে। আমরা আগেই বলেছি যে, অনেক শিল্প যেগুলি পূর্বে সরকারি ক্ষেত্রের জন্য সংরক্ষিত ছিল, তা এখন বেসরকারি মূলধনের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে।

2. আর্থিক ক্ষেত্রেও গুরুত্ব বেসরকারি মূলধনের অনুকূলে সরে গেছে। নরসিংহম কমিটি এবং মালহোত্রা কমিটির সুপারিশক্রমে ব্যাঙ্কিং ও বিমা ক্ষেত্রে বেসরকারি মূলধনকে ভারতে ব্যবসা করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। ICICI ব্যাঙ্ক হল বর্তমানে ভারতের বেসরকারি ক্ষেত্রে অন্যতম বড় ব্যাঙ্ক। বিদেশি ব্যাঙ্ককেও ভারতে শাখা খোলার অনুমতি দেওয়া হচ্ছে। বিমা ক্ষেত্রেও অনেক বেসরকারি মূলধন প্রবেশ করেছে।

3. ভারতের প্রথম দিকের পরিকল্পনাগুলিতে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে উন্নয়নের উপজাত ফল হিসাবে বিবেচনা করা হত। কিন্তু 1980 সালের পর থেকে অর্থাৎ ষষ্ঠ পরিকল্পনা থেকে কর্মসংস্থানের বিষয়টি সরাসরি গুরুত্ব পেতে শুরু করে।

4. দারিদ্র্য দূরীকরণের ক্ষেত্রেও চতুর্থ পরিকল্পনা পর্যন্ত সরাসরি বা প্রত্যক্ষ কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। পঞ্চম পরিকল্পনা থেকে দারিদ্র্য দূরীকরণ কর্মসূচি গুরুত্ব লাভ করতে থাকে।

5. বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও পরিকল্পনার দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটেছে। 1950-80 এই সময়কালে সরকারের নীতি ছিল অন্তর্মুখী উন্নয়ন কৌশল বা দৃষ্টিভঙ্গি (inward looking approach)। এই নীতির মূলকথা হল আমদানির উপর নিয়ন্ত্রণ এবং আমদানি-পরিবর্ত দ্রব্য দেশের মধ্যে উৎপাদন। একে বলা হয় আমদানি পরিবর্ততার নীতি (Policy of import substitution)। কিন্তু উদারীকরণের নীতি গ্রহণ করার পর থেকেই বৈদেশিক বাণিজ্য সম্পর্কে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি বদলাতে থাকে। ভারত সরকার আমদানি ও রপ্তানি উভয় ক্ষেত্রেই উদারীকরণের নীতি গ্রহণ করে। যুক্তি হিসাবে বলা হল, রপ্তানি বাড়াতে গেলে সব দেশকেই আমদানি সম্পর্কে উদারনীতি গ্রহণ করতে হবে। একে বলা হয় **বহির্মুখী উন্নয়ন কৌশল** (outward-looking approach)। ফলে অষ্টম পরিকল্পনা থেকে পরবর্তী পরিকল্পনাগুলিতে এই নীতির প্রতিফলন ঘটেছে। এই পরিকল্পনাগুলিতে মূলধনি দ্রব্য আমদানির ক্ষেত্রে উদারনীতি গ্রহণ করা হয়েছে। তাছাড়া, সংস্কার পরবর্তী পরিকল্পনাগুলিতে রপ্তানি প্রসারের উদ্দেশ্যেও নানা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল (Special Economic Zone বা SEZ) গঠন করে সেখানে রপ্তানি দ্রব্য উৎপাদনের জন্য নানা সুবিধা ও ছাড় দেওয়া হচ্ছে।

6. দশম, একাদশ ও দ্বাদশ পরিকল্পনায় অর্থাৎ 2002-17 এই সময়কালে পূর্বের পরিকল্পনাগুলির তুলনায় প্রাথমিক শিক্ষা ও সময়কালে পূর্বের পরিকল্পনাগুলির তুলনায় প্রাথমিক শিক্ষা ও গ্রামীণ উন্নয়নের উপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এই পরিকল্পনাগুলিতে সমভাগী উন্নয়নের (inclusive growth) উপর জোর দেওয়া হয়।

7. 1991 সালের পূর্বের পরিকল্পনাগুলিতে সরকার সেগুলির রূপায়ণের জন্য সরকারি নিয়ন্ত্রণ ও বিধিনিষেধের উপর বেশি নির্ভর করত। কিন্তু 1991 সালের পরের পরিকল্পনাগুলি অর্থাৎ সপ্তম পরিকল্পনার পরের পরিকল্পনাগুলি রূপায়ণের জন্য সরকার বেসরকারি মূলধন ও বাজার-ব্যবস্থার উপর বেশি নির্ভর করেছে।

8. উদারীকরণের যুগের পূর্বের পরিকল্পনাগুলি অনেক প্রত্যক্ষ বা সরাসরি। এদের ব্যাপকতাও ছিল বেশি। কিন্তু উদারীকরণের যুগের পরিকল্পনাগুলি বেসরকারি মূলধনের উপর বেশি নির্ভরশীল ছিল তাদের উদ্দেশ্যগুলি পূরণের জন্য। স্বভাবতই এর ফলে পরিকল্পনাগুলির ক্ষেত্র বা ব্যাপকতা কিছুটা হলেও কমেছে।

9. নবম পরিকল্পনা থেকে অর্থাৎ 1997 সাল থেকে সরকারি শিল্পক্ষেত্রে ব্যয়বরাদ্দ কমতে থাকে। পঞ্চম পরিকল্পনায় (1974-79) মোট ব্যয়ের 22.8 শতাংশ ব্যয় করা হয় খনি ও শিল্পক্ষেত্রে। আর নবম পরিকল্পনায় (1997-2002) এই ক্ষেত্রে ব্যয়িত হয় মোট ব্যয়ের মাত্র 4.7 শতাংশ। দশম পরিকল্পনায় (2002-07) মাত্র 4.0 শতাংশ। আর একাদশ ও শেষ তথা দ্বাদশ পরিকল্পনার ক্ষেত্রে এই ব্যয়বরাদ্দ ছিল 5 শতাংশের মতো। আসলে, উদারীকরণের যুগে ভারত সরকার শিল্পের উন্নতির জন্য বেসরকারি ক্ষেত্রের উপর বেশি বেশি নির্ভর করেছে।

10. পরিকল্পনার অর্থসংস্থানের ধরনেও পরিবর্তন ঘটেছে। অর্থসংস্থানের ধরনের ভিত্তিতে সমগ্র পরিকল্পনা কালকে আমরা দুটি ভাগে ভাগ করতে পারি। প্রথম পর্ব বা ভাগটি হল 1951 থেকে 1969 সাল পর্যন্ত এবং দ্বিতীয় পর্ব বা ভাগটি হল 1969 থেকে 2017 সাল পর্যন্ত। প্রথম সময়কালে বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীলতা ক্রমাগত বেড়েছে। মূল ও ভারী শিল্পের জন্য আমদানি বৃদ্ধিই এর প্রধান কারণ। এরপর চতুর্থ পরিকল্পনা (1969-74) থেকে আত্মনির্ভরশীলতার উপর জোর দেওয়া হয়। পরিকল্পনার অর্থসংস্থানের জন্য অভ্যন্তরীণ উৎসের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। ফলে চতুর্থ পরিকল্পনা থেকে সপ্তম পরিকল্পনা পর্যন্ত বৈদেশিক সাহায্যের অংশ ক্রমাগত কমেছে। এই দ্বিতীয় পর্যায়ের আর একটি বৈশিষ্ট্য হল, অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে সংগৃহীত সরকারি ঋণের পরিমাণ ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েছে। সরকারের ঋণ পরিশোধ ও সুদ বাবদ ব্যয় বেড়েছে। সরকার যেন ঋণ ফাঁদের (debt trap) দিকে এগিয়ে চলেছে।

৪.৪ ভারতীয় পরিকল্পনার উদ্দেশ্যসমূহ এবং লক্ষমাত্রা

বহু গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য পূরণের লক্ষ্যে ভারতে 1951 সাল থেকে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রবর্তন করা হয়। 2017 সাল পর্যন্ত ভারতে 12টি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও কয়েকটি বার্ষিক পরিকল্পনা রূপায়িত হয়। প্রতিটি পরিকল্পনাতেই কতকগুলি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য বা লক্ষমাত্রা ধার্য করা হয়েছিল। বিভিন্ন পরিকল্পনার সেই উদ্দেশ্যগুলি সব পরিকল্পনার ক্ষেত্রে এক নয়, তাদের মধ্যে কিছু পার্থক্য থাকাই স্বাভাবিক। তবে ভারতের এই 12টি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং বার্ষিক পরিকল্পনাগুলির উদ্দেশ্যসমূহকে বিশ্লেষণ করলে আমরা এদের প্রধান উদ্দেশ্যগুলির একটি তালিকা তৈরি করতে পারি। অধ্যাপক প্রমিত চৌধুরী বলেছেন যে, ভারতের পরিকল্পনাগুলিতে বর্ণিত উদ্দেশ্যগুলিকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়।

প্রথম ভাগে রয়েছে সমগ্র অর্থনীতির দিক থেকে অর্থাৎ সর্বভারতীয় স্তরে কাম্য উদ্দেশ্যসমূহ। এদের মধ্যে রয়েছে : (i) জাতীয় ও মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি, (ii) পর্যাপ্ত কর্মসংস্থান সৃষ্টি, (iii) সঞ্চয় ও বিনিয়োগের হার বৃদ্ধি, (iv) দামস্তরে স্থিতিশীলতা বজায় এবং (v) বৈদেশিক বাণিজ্যে ভারসাম্য রক্ষা।

দ্বিতীয় ভাগে রয়েছে দেশের নির্দিষ্ট কিছু অঞ্চলের সুবিধার জন্য গৃহীত উদ্দেশ্যসমূহ। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল : (i) আয় ও সম্পদ বণ্টনে বৈষম্য হ্রাস, (ii) উন্নয়নের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক বৈষম্য হ্রাস, (iii) কৃষির উন্নয়ন এবং (iv) শিল্পের উন্নয়ন।

তৃতীয় ভাগে রয়েছে ভারতীয় অর্থনীতিতে কাঠামোগত পরিবর্তন আনার জন্য গৃহীত উদ্দেশ্যসমূহ। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল : (i) কৃষি উপকরণের মালিকানা নিয়ন্ত্রণ এবং (ii) কৃষি-বহির্ভূত অন্যান্য ক্ষেত্রের উপকরণগুলির ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন নিয়ন্ত্রণ ও হ্রাস করা। এই উদ্দেশ্যগুলির মধ্যে কিছু উদ্দেশ্য আবার একে অপরের অন্তর্ভুক্ত (mutually inclusive)। যেমন, আয় ও সম্পদ বণ্টনে বৈষম্য দূর করতে হলে কৃষি ও শিল্পক্ষেত্রে উপকরণের মালিকানা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। আবার, কৃষির উন্নয়ন, শিল্পের উন্নয়ন, দামস্তরে স্থিতিশীলতা প্রভৃতি উদ্দেশ্যগুলিকে 'অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা' এই উদ্দেশ্যের অধীনে আনা যায়। আমরা ভারতীয় পরিকল্পনার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যগুলি এখন সংক্ষেপে আলোচনা করবো।

1. **জাতীয় ও মাথাপিছু আয়ের বৃদ্ধি :** ভারতীয় পরিকল্পনাগুলির অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হল জাতীয় ও মাথাপিছু আয়ের সন্তোষজনক হারে বৃদ্ধি। আসলে, যেকোনো অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মৌল উদ্দেশ্য হল, দেশের জনসাধারণের জীবনযাত্রার মানে উন্নয়ন ঘটানো। এর জন্য জাতীয় ও মাথাপিছু আয়ের বৃদ্ধি প্রয়োজন। সাধারণভাবে বলা যায় যে, মাথাপিছু আয়ের বৃদ্ধি ঘটলে জীবনযাত্রার মানে উন্নতি ঘটে। আর মাথাপিছু আয় বাড়াতে গেলে জনসংখ্যা অপেক্ষা জাতীয় আয়কে বেশি হারে বাড়তে হবে। তবেই মাথাপিছু আয় বাড়বে এবং জীবনযাত্রার মানের উন্নতি ঘটবে। স্বভাবতই, ভারতীয় পরিকল্পনার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য ছিল জাতীয় ও মাথাপিছু আয়ের দ্রুত বৃদ্ধি।

2. **কর্মসংস্থান বৃদ্ধি :** আমরা জানি, ভারতে জনসংখ্যার চাপ খুব বেশি। এই জনবহুল দেশে শিল্পের উন্নতি না ঘটায় তীব্র বেকার সমস্যা রয়েছে। অথচ দেশে বেকার সমস্যা থাকলে জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান বাড়বে না। কর্মসংস্থানের সুযোগ না বাড়লে বেকারত্ব কমবে না এবং জীবনযাত্রার মান বাড়বে না। তাই বেকারত্ব কমাতে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির উপর গুরুত্ব দেওয়া দরকার। অবশ্য ভারতের প্রথম দিকের পরিকল্পনাগুলিতে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির বিষয়টি অবহেলিত হয়েছে। পরিকল্পনা রচয়িতারা ধরে নিয়েছিলেন যে, জাতীয় আয় বা উৎপাদন বাড়লেই কর্মসংস্থানও বাড়বে। কর্মসংস্থানকে তাঁরা আয়বৃদ্ধির উপজাত বিষয় (by-product) বলে ধরে নিয়েছিলেন। কিন্তু এই অনুমান সর্বদা ঠিক নয়। উৎপাদন বাড়লে শ্রম নিয়োগ বাড়বে কিনা, তা উৎপাদন কৌশলের উপর নির্ভর করে। উৎপাদন কৌশল যদি মূলধন নিবিড় হয়, তাহলে শ্রমিক নিয়োগ না বেড়েও উৎপাদন বাড়তে পারে। ভারতের প্রথম দিকের পরিকল্পনাগুলির এই ভ্রান্তি পঞ্চম পরিকল্পনা পর্যন্ত চলেছিল। ওই পরিকল্পনা পর্যন্ত ভারতে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির উপর সরাসরি জোর দেওয়া হয়নি। অবশেষে ষষ্ঠ পরিকল্পনা (1980-85) পরিকল্পনা থেকে সরাসরি কর্মসংস্থান বৃদ্ধির কথা বলা হয়। ষষ্ঠ থেকে শেষ দ্বাদশ পরিকল্পনা (2012-17) পর্যন্ত শ্রমনিয়োগ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের প্রসারের উপর কিছু না কিছু কর্মসূচি রাখা হয়। পাশাপাশি, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের উপরও গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

3. **সঞ্চয় ও বিনিয়োগের হার বৃদ্ধি :** Harrod-Donar মডেলের মতে, কোনো দেশের আয় বৃদ্ধির হার হল সঞ্চয়ের হার ও মূলধন-উৎপন্নের অনুপাত। মূলধন-উৎপন্নের অনুপাত অপরিবর্তিত অবস্থায় সঞ্চয়ের হার যত বেশি হবে, জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার তত বেশি হবে। (সঞ্চয়ের হার হল দেশের মোট সঞ্চয় (S) ও জাতীয় আয়ের (Y) অনুপাত অর্থাৎ সঞ্চয়ের হার = $S \div Y$)। তাহলে জাতীয় আয় বৃদ্ধির হারকে বাড়াতে হলে সঞ্চয়ের হার বাড়াতে হবে এবং সেই সঞ্চয়কে উৎপাদনশীল কাজে বিনিয়োজিত করতে হবে। এজন্যই ভারতের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাগুলিতে সঞ্চয় ও বিনিয়োগের হার বৃদ্ধি অন্যতম উদ্দেশ্য বলে গৃহীত হয়েছিল। সঞ্চয়ের পরিমাণ বৃদ্ধির উদ্দেশে গ্রামাঞ্চলে ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার প্রসার ঘটানোর চেষ্টা করা হয়। আর বিনিয়োগের হার বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে মূল ও ভারী শিল্পের প্রসারের উপর জোর দেওয়া হয়।

4. **আয় ও সম্পদ বণ্টনে বৈষম্য হ্রাস করা :** ব্রিটিশ শাসনের আমল থেকেই ভারতে আয় ও সম্পদ বণ্টনে তীব্র বৈষম্য রয়েছে। দেশের জাতীয় আয়ের একটা বড় অংশ মুষ্টিমেয় কিছু লোকের হাতে পুঞ্জীভূত হয়; আর দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ জাতীয় উৎপন্নের সামান্য অংশই ভোগ করে। দেশের সম্পদের মালিকানার ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। এককথায়, দেশের অর্থনৈতিক ক্ষমতা স্বল্প সংখ্যক ব্যক্তি ও শিল্পপতি বা শিল্পগোষ্ঠীর হাতে কেন্দ্রীভূত। এজন্যই ভারতীয় পরিকল্পনাগুলির একটা প্রধান উদ্দেশ্য ছিল আয় ও সম্পদ বণ্টনে বৈষম্য হ্রাস করা

এবং অর্থনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন রোধ করা। কেননা, অর্থনৈতিক পরিকল্পনার উদ্দেশ্য শুধু জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধি করাই নয়, সেই বর্ধিত উৎপাদন দেশের জনগণের মধ্যে সুষম বন্টন করাও পরিকল্পনার একটি প্রধান উদ্দেশ্য। সরকার তথা পরিকল্পনা রচয়িতাদের লক্ষ রাখতে হয়, উন্নয়নের সুফল থেকে সাধারণ দরিদ্র মানুষ যেন বঞ্চিত না হয়। এজন্য উৎপাদনের উপকরণগুলির মালিকানা নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন এবং শিল্প ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন রোধ করা দরকার। তা না হলে উন্নয়নের সুফল দেশের অল্প সংখ্যক কিছু লোক ভোগ করবে। তাতে অর্থনৈতিক সাম্য ও সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হবে না। ভারতের পরিকল্পনাগুলির তাই একটি প্রধান উদ্দেশ্য ছিল অর্থনৈতিক সাম্য ও সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা। শেষের পরিকল্পনাগুলিতে সমভাগী উন্নয়নের (inclusive growth) লক্ষ্য বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়।

5. **বৈদেশিক বাণিজ্যে ভারসাম্য রক্ষা :** প্রথম পরিকল্পনা কাল (1951-56) বাদ দিলে সমগ্র পরিকল্পনাকালেই ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যে ঘাটতি দেখা গেছে। বৈদেশিক বাণিজ্যের এই ভারসম্যহীনতা দূর করা প্রয়োজন। এজন্য ভারতীয় পরিকল্পনাগুলির আর একটি বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল বৈদেশিক বাণিজ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা। এজন্য একদিকে আমদানি নিয়ন্ত্রণ করা বা কমানো প্রয়োজন এবং অন্যদিকে রপ্তানি বাড়ানো প্রয়োজন। তাহলে বিদেশি মুদ্রার তহবিল তৈরি হবে। এই তহবিল ব্যবহার করে বিদেশ থেকে প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জাম ও কলাকৌশল আমদানি করা সম্ভব হবে। এর ফলে জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার বাড়বে।

6. **অর্থনৈতিক স্বয়ম্ভরতা :** যে-কোনো অর্থনৈতিক পরিকল্পনার প্রধান লক্ষ্য হল অর্থনৈতিক স্বয়ম্ভরতা অর্জন। ভারতের অর্থনৈতিক পরিকল্পনারও মুখ্য উদ্দেশ্য হল স্বয়ম্ভরতা অর্জন। এখানে স্বয়ম্বরতা বলতে অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্বয়ম্ভরতা বা আত্মনির্ভরশীলতা বোঝানো হচ্ছে। যেমন, একটি লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য হল খাদ্যে স্বয়ম্ভরতা অর্জন। এর জন্য কৃষি উৎপাদন বাড়াতে হবে। সেজন্য বিভিন্ন পরিকল্পনায় কৃষির উন্নতির উপর জোর দেওয়া হয়েছিল। আবার, স্বয়ম্ভরতা বলতে বিদেশের উপর নির্ভরতা দূর করাও বোঝায়। এক্ষেত্রে স্বয়ম্ভরতা অর্জন করতে হলে আমদানি দ্রব্যের পরিবর্ত দ্রব্য উৎপাদন করতে হবে, বিদেশি কলাকৌশলের বদলে দেশীয় কলাকৌশল উদ্ভাবন করতে হবে, শিল্পের উৎপাদনে বৈচিত্র্য আনতে হবে। এই স্বয়ম্ভরতার লক্ষ্য অর্জনের জন্য তাই ভারতের বিভিন্ন পরিকল্পনায় কৃষি ও শিল্পের উপর জোর দেওয়া হয়েছিল। আবার, অর্থনৈতিক স্বয়ম্ভরতা অর্জন করতে হলে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করতে হবে এবং দামস্তরের স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে হবে। নতুবা অনেক উন্নয়ন পরিকল্পনার হিসাব বিপর্যস্ত হয়ে যাবে এবং অর্থনীতিতে নানা বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে। তাছাড়া, দামস্তর নিয়ন্ত্রণে না রাখা গেলে বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও সমস্যা দেখা দেবে। দামস্তর বাড়লে আমদানি বাড়বে এবং রপ্তানি কমবে। এর ফলে বৈদেশিক বাণিজ্যে ঘাটতি বাড়বে। ঘাটতি মেটাতে

সরকারকে বিদেশি সূত্র থেকে ঋণ নিতে হবে। সুতরাং দেশটিকে তখন স্বনির্ভর বলা যাবে না। তাই ভারতীয় পরিকল্পনাগুলির অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল দামস্তরের স্থিতিশীলতা বজায় রাখা।

তবে এই সমস্ত উদ্দেশ্যগুলির পিছনে মূল উদ্দেশ্য হল দারিদ্র্য দূর করা। জাতীয় আয় বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, কৃষির উন্নতি, শিল্পের অগ্রগতি, বৈদেশিক বাণিজ্যের পুনর্গঠন ইত্যাদি সমস্ত উদ্দেশ্যের মূলে ছিল দারিদ্র্য দূর করার উদ্দেশ্য। অবশ্য পঞ্চম পরিকল্পনার পূর্বে উদ্দেশ্য হিসাবে দারিদ্র্য দূরীকরণের কথা প্রত্যক্ষ ভাবে উল্লেখ করা হয়নি। চতুর্থ পরিকল্পনার শেষে দেখা গেল, ভারতের জাতীয় আয় বেশ কিছুটা বেড়েছে কিন্তু দেশ থেকে দারিদ্র্য দূরীভূত হয়নি। লক্ষ করা গেল যে, দারিদ্র্যসীমার নীচে জনসংখ্যার পরিমাণ ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। ভাবা হয়েছিল যে, দ্রুত হারে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটলে স্বাভাবিকভাবেই দারিদ্র্যের প্রকোপ কমবে এবং দারিদ্র্যসীমার নীচে অবস্থিত জনসংখ্যার পরিমাণ হ্রাস পাবে। কিন্তু চারটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অভিজ্ঞতায় তা ভুল প্রমাণিত হল। তাই পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (1974-79) দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য কয়েকটি প্রত্যক্ষ ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলা হয়। এই পরিকল্পনার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল দুটি : (i) দারিদ্র্য দূর করা এবং (ii) স্বনির্ভরতা অর্জন করা। এই প্রথম দারিদ্র্য দূরীকরণকে উদ্দেশ্য হিসাবে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হল। এর পর অবশ্য ষষ্ঠ ও সপ্তম পরিকল্পনায় অন্যতম উদ্দেশ্য হিসাবে দারিদ্র্য হ্রাসের কথা উল্লেখ করা হয়।

বিভিন্ন পরিকল্পনায় যে সমস্ত উদ্দেশ্যের কথা উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলি সম্পর্কে কিছু সমালোচনার সুরও শোনা গেছে। **প্রথমত,** অনেকে এই উদ্দেশ্যগুলিকে উচ্চাশাপূর্ণ বলে মনে করেছেন। উদ্দেশ্যগুলি পূরণ হতে গেলে দেশের প্রকৃত অবস্থা যেমন হওয়া প্রয়োজন, বাস্তবে তা ছিল না। অর্থাৎ পরিকল্পনার উদ্দেশ্য নির্ধারণের সময় পরিকল্পনা রচয়িতারা কিছু বিষয় অনুমান করে নিয়েছিলেন। সেই অনুমানগুলি অনেক ক্ষেত্রেই ছিল বাস্তবতা- বর্জিত আশাবাদী অনুমান। **দ্বিতীয়ত,** অধ্যাপক প্রমিত চৌধুরী এবং আরো অনেকে মনে করেন যে, বিভিন্ন পরিকল্পনায় গৃহীত উদ্দেশ্যগুলি পরস্পরের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। যেমন, আয় ও সম্পদ বণ্টনের বৈষম্য কমালে দেশে ভোগ ব্যয় বাড়বে এবং সঞ্চয়ের হার কমবে। আবার, সঞ্চয়ের হার কমলে জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার কমবে। এক্ষেত্রে জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার বাড়ানো এবং আয় ও সম্পদ বণ্টনে বৈষম্য কমানো এই দুটি লক্ষ্য পরস্পরের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ বা সংগতিপূর্ণ নয়। এটি অবশ্য সর্বত্রই প্রযোজ্য। বাস্তবে সামাজিক ন্যায় এবং প্রসারের মধ্যে একটি দুর্ভাগ্যজনক বিরোধ বা টানাপোড়েন (Unfortunate conflict or trade off between growth and justice) থাকে। একটি লক্ষ্য অর্জন করতে গেলে অপর লক্ষ্যটি দূরে সরে যায়। **তৃতীয়ত,** অনেকে মনে করেন যে, ভারতের পরিকল্পনার উদ্দেশ্যগুলি ছিল অতিমাত্রায় কল্যাণমুখী। এক্ষেত্রে অর্থনৈতিক দক্ষতার উপর বেশি জোর না দিয়ে জনগণের কল্যাণের উপর বেশি জোর দেওয়া হয়েছিল। **চতুর্থত,** অনেকের মতে, ভারতীয় পরিকল্পনার উদ্দেশ্যগুলিকে সঠিক এবং সুনির্দিষ্টভাবে প্রকাশ করা হয়নি। এগুলিকে কেবল সাধারণভাবে বর্ণনা করা হয়েছিল। অন্যভাবে বলতে গেলে, এগুলিকে বস্তুগতভাবে (objectively) বা পরিমাণগত ভাবে (quantitatively) প্রকাশ করা হয়নি। ফলে উদ্দেশ্যগুলি কতটা সফল হল বা কতটা লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হল, তা পরিমাপ করা যায়নি।

পরিকল্পনাগুলির উদ্দেশ্যও যথাযথভাবে পূরণ হয়নি। বরং অনেক ক্ষেত্রেই আমাদের পরিকল্পনাগুলি উদ্দেশ্য পূরণে ব্যর্থ হয়েছে। **প্রথমত**, পরিকল্পনাকালে জাতীয় আয় বেড়েছে বটে, তবে জনসংখ্যা বাড়ার ফলে মাথাপিছু আয় খুব কম হারে বেড়েছে। **দ্বিতীয়ত**, 12টি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা রূপায়ণের পরও ভারতের জনসংখ্যার প্রায় এক-চতুর্থাংশ ব্যক্তি দারিদ্র্য সীমার নীচে বাস করে। **তৃতীয়ত**, পরিকল্পনাকালে কর্মসংস্থান সামান্যই বেড়েছে। ফলে ভারতে বেকার সমস্যা এক ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। **চতুর্থত**, পরিকল্পনাকালে ভারতে আয় ও সম্পদ বণ্টনের বৈষম্য কমেনি, বরং তা আরো বেড়েছে। **পঞ্চমত**, অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতার লক্ষ্যও বাস্তবে পূরণ হয়নি। উন্নত কলাকৌশলের জন্য ভারত আজও বিদেশের উপর বিভিন্ন ক্ষেত্রে নির্ভরশীল। **ষষ্ঠত**, বৈদেশিক বাণিজ্যে ভারসাম্য রক্ষার লক্ষ্যও বাস্তবে পূরণ হয়নি। প্রথম পরিকল্পনার পর প্রায় সমগ্র পরিকল্পনাকালে লেনদেন ব্যালান্সে ঘাটতি বেড়েছে। আমরা ভারতের পরিকল্পনাগুলির সাফল্য ও ব্যর্থতা নিয়ে এই এককের শেষের দিকে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছি। পরিকল্পনাগুলির যেমন অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে কিছু উল্লেখযোগ্য সাফল্য রয়েছে, তেমনি কিছু ক্ষেত্রে ব্যর্থতার আয়তনও কম নয়। ভারতের পরিকল্পনাগুলির সব চেয়ে বড় ব্যর্থতা হল দারিদ্র্য ও বেকারি দূরীকরণে ব্যর্থতা। পরিকল্পনাকালে ভারতের জাতীয় আয়ের যে প্রসার ঘটেছে তা অনেকটাই কর্মসংস্থানহীন প্রসার (jobless growth)। জনসংখ্যার এক বিশাল অংশের কর্মসংস্থান হয়নি। আর কর্মসংস্থান হয়নি বলেই তারা দরিদ্র। দারিদ্র্য ও বেকারি হল একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। এই দুই যৌথ সমস্যার সমাধান করা যায়নি বলেই ভারতীয় জনসংখ্যার এক বিশাল অংশের কাছে পরিকল্পনা তাৎপর্যহীন হয়ে পড়েছিল। অর্থনৈতিক পরিকল্পনা সম্পর্কে সরকারেরও মোহভঙ্গ হতে শুরু করে। তাই পরিকল্পনা কমিশন ভেঙে দিয়ে 2015 সালের 1 জানুয়ারি প্রতিষ্ঠা করে NITI (National Institution for Transforming India) আয়োগ। এই NITI আয়োগই বর্তমানে পরিকল্পনা কমিশনের বদলে ভারত সরকারের পলিসি থিঙ্ক-ট্যাঙ্ক হিসাবে কাজ করছে। দ্বাদশ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (2012-17) ছিল ভারতের পরিকল্পনার ইতিহাসে শেষ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা।

৪.৫ NITI আয়োগ স্থাপন এবং পরিকল্পনার সমাপ্তি

ভারতের পরিকল্পনাগুলির সাফল্যের পাশাপাশি নানা ব্যর্থতাও রয়েছে। পরিকল্পনাগুলির অন্যতম লক্ষ্যমাত্রাগুলি ছিল : দারিদ্র্য দূরীকরণ, বেকারি হ্রাস, সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, দামস্তরে স্থায়িত্ব, আয় ও সম্পদ বণ্টনে বৈষম্য হ্রাস প্রভৃতি। এই লক্ষ্যগুলি পূরণ করতে ভারতীয় পরিকল্পনাগুলি ব্যর্থ হয়েছে। দীর্ঘ 65 বছরের (1951-2017) পরিকল্পনার পর ভারতে এখনও জনসংখ্যার এক-চতুর্থাংশ দারিদ্র্য সীমার নীচে রয়েছে, অর্থনীতিতে ব্যাপক বেকারি ও কর্মহীনতা, দ্বিতীয় পরিকল্পনার সময় (1960) থেকে দামস্তর বৃদ্ধি ঘটে চলেছে, আয় ও সম্পদ বণ্টনে রয়েছে তীব্র বৈষম্য, সামাজিক ন্যায় ও সমতা প্রতিষ্ঠা করা যায়নি প্রভৃতি। পরিকল্পনার অনেক প্রকল্পই যথাসময়ে সমাপ্ত হয়নি। প্রকল্প রূপায়ণের এই ব্যর্থতার জন্য অর্থনীতিবিদেরা প্রকল্পের স্থান নির্বাচন, প্রকল্পের আয়তন, প্রকল্পের ধরন বা প্রকার প্রভৃতিকে

দায়ী করেছেন। অধ্যাপক সুখময় চক্রবর্তীর মতে, তিনটি ব্যবস্থা বা বিষয় ভারতের পরিকল্পনাগুলির রূপায়ণগত ব্যর্থতার জন্য দায়ী। সেই তিনটি ব্যবস্থা বা বিষয় হল :

(i) পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন প্রকল্প সম্পর্কে সঠিক ও প্রাসঙ্গিক তথ্য সংগ্রহে আদৌ দক্ষতা দেখাতে পারেনি।

(ii) অবস্থার পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়াতে পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ অনেক দীর্ঘ সময় নিয়েছে।

(iii) পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ যে সমস্ত এজেন্সির মাধ্যমে পরিকল্পনা রূপায়ণ করার চেষ্টা করেছে, সেই এজেন্সিগুলির এই সমস্ত কাজে সক্ষমতা এবং অনুপ্রেরণা কোনোটাই ছিল না অথবা থাকলেও তা ছিল অতি সামান্য।

এই সমস্ত অবস্থার ফলে ভারতীয় পরিকল্পনাগুলির যথাযথ রূপায়ণ হয়নি, সেগুলি ব্যর্থ হয়েছে। আর এই ব্যর্থতার দরুন ভারতে পরিকল্পনা সম্পর্কে আশাভঙ্গ হয়েছে। বর্তমান শতকের শুরু থেকেই অনেক অর্থনীতিবিদ ভারতের পরিকল্পনা কমিশন ভেঙে দেওয়ার বা তুলে দেওয়ার সুপারিশ করতে থাকেন। ভারত সরকারেরও পরিকল্পনা সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটতে থাকে। পরিকল্পনার প্রকল্প রূপায়ণের ব্যর্থতা সম্পর্কে সরকারও অনেক অর্থনীতিবিদের সঙ্গে সহমত পোষণ করতে থাকে। অবশেষে 2015 সালের 1 জানুয়ারি ভারত সরকার ভারতের পরিকল্পনা কমিশনের বদলি বা পরিবর্ত হিসাবে গঠন করে NITI (National Institution for Transforming India) আয়োগ। পদাধিকারবলে ভারতের প্রধানমন্ত্রীই হলেন এর সভাপতি (Chairman)। (ভারতের পরিকল্পনা কমিশনেরও সভাপতি বা চেয়ারম্যান হতেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী)। জানুয়ারি 2015 থেকে আগস্ট 2017 পর্যন্ত NITI আয়োগের প্রথম সহ-সভাপতি (Deputy Chairman) ছিলেন অরবিন্দ পানাগড়িয়া। 2021 সালের 1 জুন NITI আয়োগের সহ-সভাপতি নিযুক্ত হন ডঃ রাজীব কুমার। এই সহ-সভাপতিই হলেন NITI আয়োগের সর্বপ্রধান কার্যনির্বাহক। ভারতের দ্বাদশ পরিকল্পনা (2012-17) শেষ হয় 2017 সালের 31 মার্চ। এরপর ভারতে আর কোনো পরিকল্পনা প্রবর্তন করা হয়নি। দ্বাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাই ছিল ভারতের পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক রচিত ও রূপায়িত সর্বশেষ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা।

ভারত সরকারের দ্বারা প্রচারিত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে যে, NITI আয়োগ সরকারের পলিসি থিঙ্ক ট্যাঙ্ক (Policy think-tank) হিসাবে কাজ করবে। সেই অনুযায়ী এই আয়োগ ভারত সরকারকে নানা গুরুত্বপূর্ণ নীতি নির্ধারণে সহায়তা করে আসছে। পাশাপাশি, এই NITI আয়োগের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য হল সরকারের নীতি নির্ধারণে অঙ্গরাজ্যগুলিকে সামিল করা। সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে এভাবে নীচের থেকে উপরে সিদ্ধান্ত নেবার পদ্ধতি শুরু হল। পরিকল্পনা কমিশনের সময় যে পদ্ধতি চালু ছিল তাকে বলা যেতে পারে উপর থেকে নীচে সিদ্ধান্তগ্রহণ। এই পদ্ধতি ছিল যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর বিরোধী। এই পদ্ধতিতে রাজ্যগুলি নিজেদের অবহেলিত ভাবতো। বাস্তবিকই তখন কেন্দ্রীয় স্তরে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ রাজ্য এবং স্থানীয় স্তরের প্রশাসনের উপর চাপিয়ে দেওয়া হত। NITI আয়োগ ব্যবস্থায় সেই পদ্ধতির

অবসান ঘটলো। এক্ষেত্রে বলা হল যে, রাজ্য ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানের বক্তব্য, কর্মসূচি ও প্রকল্প শোনার পর কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন বিষয়ে নীতি নির্ধারণ করবে। এটিই প্রকৃত যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা (federal system)।

ভারতের তৎকালীন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী (2014-19) শ্রী অরুণ জেটলি পরিকল্পনা কমিশনের বদলে NITI আয়োগ স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করেন। তাঁর যুক্তি ছিল, 66 বছরের পুরনো পরিকল্পনা কমিশন বর্তমানে এর প্রাসঙ্গিকতা হারিয়েছে। এটি একটি বাড়তি অকেজো (redundant) সংস্থায় পরিণত হয়েছিল। এ ধরনের পরিকল্পনা কমিশন পূর্ণ সমাজতান্ত্রিক দেশের ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক। সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি হল সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রিত ও আদেশভিত্তিক অর্থনীতি (command economy)। সেখানে কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ (central planning authority) অর্থনীতির ছোটো-বড় সব বিষয়েই সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে। ভারতের ন্যায় গণতান্ত্রিক, যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয় এই কেন্দ্রীয় স্তরের পরিকল্পনা ব্যবস্থা আদৌ প্রাসঙ্গিক নয়। মি. জেটলি-র মতে, ভারত একটি বৈচিত্র্যপূর্ণ দেশ। এর অঙ্গরাজ্যগুলি উন্নয়নের বিভিন্ন স্তরে রয়েছে অর্থাৎ অঙ্গরাজ্যগুলির উন্নয়নে আঞ্চলিক বৈষম্য রয়েছে। স্বভাবতই তাদের শক্তি ও দুর্বলতাও ভিন্ন ভিন্ন রকমের। সুতরাং, তাদের প্রত্যেকের উন্নয়ন পরিকল্পনা ভিন্ন ভিন্ন রকমের হতে হবে। অর্থনৈতিক পরিকল্পনার ক্ষেত্রে ‘‘সবার জন্য একনীতি’’ (one size fits all) এরূপ দৃষ্টিভঙ্গি কাজ করে। ভারতের ক্ষেত্রে এই দৃষ্টিভঙ্গি একেবারেই অপ্রযোজ্য। তিনি দাবি করেন যে, এই দৃষ্টিভঙ্গি ভারতের ক্ষেত্রে নানা বিশৃঙ্খলা তৈরি করবে এবং ভারতকে বর্তমানের বিশ্বায়িত অর্থনীতিতে উপযুক্ত প্রতিযোগী হিসাবে গড়ে তুলতে পারবে না। ভারত বিশ্ব অর্থনীতিতে প্রতিযোগিতায় মার খাবে। তাই পুরনো কেন্দ্রীভূত পরিকল্পনা পদ্ধতি তুলে দিয়ে তার বদলে এল NITI আয়োগ, যা অনেকখানি বিকেন্দ্রীভূত ব্যবস্থা।

2015 সালে ভারত সরকার এক প্রেস বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে। এই বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় যে, ভবিষ্যৎ উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ পরিচালনগত ও কৌশলগত উপকরণ (input) প্রদান করবে NITI আয়োগ। আরো বলা হয় যে, পরিকল্পনার যুগের বৈশিষ্ট্য ছিল কেন্দ্র থেকে রাজ্যগুলির দিকে একমুখী প্রবাহ (one way flow)। সেখানে রাজ্যগুলির মতামতের বিশেষ সুযোগ ছিল না। NITI আয়োগ এই ব্যবস্থার বদল ঘটাবে। নতুন ব্যবস্থায় রাজ্যগুলির প্রকৃত ও নিরন্তর অংশগ্রহণ থাকবে। এভাবে NITI আয়োগ একটি সহযোগিতামূলক যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা (co-operative federalism) গড়ে তুলতে সাহায্য করবে। নতুন এই ব্যবস্থায় স্বীকার করা হয়েছে যে, শক্তিশালী অঙ্গরাজ্যগুলিই শক্তিশালী জাতি গঠন করে (Strong states make a strong nation)। তাই অঙ্গরাজ্যগুলিকে সাথে নিয়েই সারা দেশের উন্নয়ন ঘটাতে হবে।

এছাড়া বলা হয়েছে যে, NITI আয়োগ গ্রামভিত্তিক পরিকল্পনা তৈরি করবে। তারপর এই পরিকল্পনাগুলির সমষ্টিগত (macroeconomic) রূপ নির্ণয় করা হবে সরকারের ধাপে ধাপে উচ্চস্তরে। যারা এ যাবৎ সমাজে বঞ্চিত, অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুবিধা যে স্তরের ব্যক্তিরা পায়নি, NITI আয়োগ

তাদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি ও মনোযোগ দেবে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরের দক্ষ ও কলাকুশলীদের সাহায্য করবে NITI আয়োগ। সরকারের প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে যে, জ্ঞান, উদ্ভাবনশক্তি এবং উদ্যোগ শক্তির সাহায্যকেন্দ্র হিসাবে NITI আয়োগ কাজ করবে। এই আয়োগ অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রের উন্নয়ন প্রকল্পগুলির দ্রুত রূপায়ণের ব্যবস্থা করবে, এদের যথাযথ বাস্তবায়নের জন্য উপযুক্ত ক্ষেত্র প্রদান করবে। পাশাপাশি, এই উন্নয়ন কর্মসূচিগুলির নিয়ন্ত্রণ ও মূল্যায়নও করবে এই NITI আয়োগ।

ভারত এক বৈচিত্র্যপূর্ণ দেশ। এর সমস্যাগুলিও বিচিত্র এবং জটিল। ভারতীয় অর্থনীতি যাতে এই সমস্যাগুলির যথাযথ মোকাবিলা করতে পারে সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখবে NITI আয়োগ। এই লক্ষ্য পূরণের উদ্দেশ্যে NITI আয়োগ নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করবে :

(i) দেশের সমস্ত কর্মক্ষম ব্যক্তির উৎপাদন ক্ষমতার পূর্ণ ব্যবহার। এর জন্য শিক্ষা, দক্ষতা বৃদ্ধি, লিঙ্গ বৈষম্য দূরীকরণ এবং নিয়োগ বৃদ্ধির উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে।

(ii) দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং প্রতিটি ভারতবাসীর মর্যাদা ও আত্মসম্মানের সহিত জীবনযাপন।

(iii) লিঙ্গগত, জাতিগত এবং ধনসম্পদভিত্তিক বৈষম্যের প্রতিবিধান।

(vi) উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় গ্রামগুলির সংযুক্তিকরণ।

(v) কর্মসংস্থান সৃষ্টির উদ্দেশ্যে 50 মিলিয়নের বেশি ক্ষুদ্র ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকে আর্থিক সাহায্য প্রদান।

(vi) দেশের পরিবেশগত সম্পদগুলির উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণ।

এভাবে গ্রাম ও ব্লকস্তরের উন্নয়ন প্রকল্পগুলিকে রাজ্য ও কেন্দ্রস্তরের প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত করে NITI আয়োগ একটি যথার্থ সহযোগিতামূলক যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা গড়ে তোলার উপর গুরুত্ব দিয়েছে। NITI আয়োগকে দক্ষ ব্যক্তিদের সহযোগিতায় Think-tank হিসাবে গড়ে তোলার চেষ্টা জারি রয়েছে। এই আয়োগ কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলিকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে উপযুক্ত নীতি গ্রহণের পরামর্শ প্রদান করবে। আগে পরিকল্পনা কমিশন কেন্দ্রীয় স্তরে এই কাজ করত। সেটি সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি বা নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতির পক্ষেই উপযুক্ত ছিল। ওইরূপ অর্থনীতিতে সমস্ত অর্থনৈতিক বিষয়ই পরিকল্পনা দ্বারা নির্ধারিত। সেখানে বাজারি শক্তির কোনো ভূমিকা নেই। কিন্তু ভারতীয় অর্থনীতি বর্তমানে অনেকটাই নিয়ন্ত্রণমুক্ত। উদারীকরণের নীতি গ্রহণের (1991) পর ভারতীয় অর্থনীতি এখন অনেকটাই বাজারের শক্তির দ্বারা চালিত। বর্তমান পরিস্থিতিতে তাই প্রতিটি রাজ্যেরই নিজস্ব এবং ভিন্ন ভিন্ন নীতি-কাঠামো প্রয়োজন। এই নতুন NITI আয়োগ ব্যবস্থায় রাজ্যগুলির পরিকল্পনা নির্মাণ এবং উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় অর্থাৎ প্রকল্পগুলির রূপায়ণের ক্ষেত্রে নিজেদের বক্তব্য তুলে ধরার অনেক সুযোগ রয়েছে। এভাবে পূর্বের "কেন্দ্র থেকে রাজ্যে" নীতির প্রবাহের পরিবর্তে এসেছে সহযোগিতামূলক যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা। এখন বিভিন্ন নীতি সম্পর্কে সুপারিশ করে NITI আয়োগ। অবশ্য তা রূপায়ণের এক্তিয়ার সরকারের। প্রকল্প বা নীতি রূপায়ণের

ক্ষমতা NITI আয়োগের নেই। পূর্বের ব্যবস্থার সঙ্গে আরো একটি বড় পার্থক্য আছে। পূর্বের ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় তহবিলের রাজ্যগুলির মধ্যে বণ্টনের ক্ষমতা পরিকল্পনা কমিশনের ছিল। NITI আয়োগের সেই ক্ষমতা নেই। নতুন ব্যবস্থায় সেই ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছে ভারতের অর্থ মন্ত্রকের উপর।

NITI আয়োগ ব্যবস্থা সম্পর্কে পূর্ণ মূল্যায়ন করতে হলে আমাদের আরো কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে। Anand Kalyanaraman এই ব্যবস্থার সম্ভাব্য ভালো ও খারাপ দিক দুটিই উল্লেখ করেছেন। তিনি আশা প্রকাশ করেছেন যে, নতুন এই ব্যবস্থায় রাজ্যগুলির হাতে বেশি নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা থাকবে। ফলে গজদন্ত মিনারে (ivory tower) বসে নীতি নির্ধারিত না হয়ে তা অনেকটা তৃণমূল স্তরেও নির্ধারিত হবে। ফলে নীতিগুলি আরো বাস্তবসম্মত হবে। তবে একই সঙ্গে তিনি সতর্ক করেছেন যে, পরিকল্পনা কমিশন বা নীতি আয়োগ যে নামেই ডাকা হোক না কেন, আসল কাজ হল নীতি রূপায়ণের। ভারতে উন্নত ও বিশদে বিস্তারিত নীতির অভাব নেই; সমস্যা হল সেগুলির গুরুত্ব দিয়ে রূপায়ণ। তাছাড়া কেন্দ্রের অর্থ মন্ত্রকের দ্বারা একতরফা কেন্দ্রীয় তহবিল বণ্টনের ক্ষেত্রে পক্ষপাতিত্ব দেখা দিতে পারে; বিশেষত যদি কেন্দ্র ও রাজ্যে ভিন্ন রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় থাকে। সেজন্যই অনেক রাজ্য (বিশেষত অ-বিজেপি দল দ্বারা শাসিত রাজ্যগুলি) এরূপ একতরফা তহবিল বণ্টনের নীতির বিরোধিতা করেছে। তাদের আশঙ্কা, কেন্দ্রের বিজেপি সরকার তহবিল বণ্টনে তাদের প্রতি বৈষম্যমূলক (discriminatory) আচরণ করবে। তাই এই রাজ্যগুলি NITI আয়োগের মাধ্যমে তহবিল বণ্টনের দাবি তুলেছে। সেক্ষেত্রে তারা নিজেদের বক্তব্য পেশ করার সুযোগ পাবে। আবার, পশ্চিমবঙ্গ-সহ অনেক রাজ্য অভিযোগ করেছে যে, কেন্দ্রীয় সরকার অনেক ক্ষেত্রেই যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রথা ও রীতিনীতি মানছে না। রাজ্যের মতামত না নিয়েই কেন্দ্র এক তরফাভাবে অনেক কিছু নির্ধারণ ও ঘোষণা করছে। এটি যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। যেমন, অনেক কেন্দ্রপোষিত স্কিমের (centrally sponsored scheme) বরাদ্দ কেন্দ্রীয় সরকার একতরফাভাবে ছাঁটাই করছে অথবা বরাদ্দ অর্থ প্রদান করতে অনেক দেরি করছে। অনেক রাজ্যই কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে অধিক অর্থ দাবি করে আসছে এবং কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে সমন্বয়ের ব্যাপারে আরো স্বচ্ছতা দাবি করছে। এছাড়া, কেন্দ্রীয় সরকার বাজার অর্থনীতির উপর বড় বেশি জোর দিয়েছে। এর ফলে গুজরাতের ন্যায় বড় ও শিল্পোন্নত রাজ্যগুলি অধিক আর্থিক সুবিধা পাবে এবং আসামের ন্যায় ছোটো ও পিছিয়ে পড়া রাজ্যগুলি আর্থিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আসামের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈই অনুরূপ আশঙ্কা ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন। আমরা বলতে পারি যে, সহযোগিতামূলক যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা বাস্তবে কতখানি রূপায়িত হবে তা অনেকাংশে কেন্দ্রীয় সরকারের সদিচ্ছার উপর নির্ভর করে। ভারতীয় সংবিধান রাজ্যগুলির তুলনায় কেন্দ্রীয় সরকারকে অনেক বেশি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা দান করেছে। আমাদের শাসনব্যবস্থা যুক্তরাষ্ট্রীয় হলেও তাতে এককেন্দ্রিকতার দিকে ঝোঁক বেশি। তাই ভারতে কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে সহযোগিতামূলক যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা কতখানি গড়ে উঠবে তা অনেকখানি নির্ভর করছে কেন্দ্রীয় সরকার এবিষয়ে কতটা আন্তরিক (serious) তার উপর।

৪.৬ ভারতীয় পরিকল্পনার সাফল্য

ভারতে পরিকল্পনার যুগ শুরু হয় 1950-51 সালে এবং তা শেষ হয় 2017 সালের মার্চ মাসে। এই দীর্ঘ 66 বছরে বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (12টি) এবং কিছু বার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণের এবং রূপায়ণের ফলে ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নের হার বৃদ্ধি পেয়েছে। 1950-65 সময়কালে ভারতের জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার ছিল মাত্র 3.57 শতাংশ। অধ্যাপক রাজ কৃষ্ণ একে উন্নযনের হিন্দু হার (Hindu rate of growth) বলে অভিহিত করেছিলেন। ভারত বর্তমানে সেই হিন্দু হারের শৃঙ্খল ভেঙে বেরিয়ে এসেছে। অর্থনৈতিক পরিকল্পনার যুগে ভারতের কাঠামোগত পরিবর্তন ঘটেছে। অর্থনীতিতে প্রাথমিক ক্ষেত্রের গুরুত্ব কমেছে এবং মাধ্যমিক ও সেবা ক্ষেত্রের গুরুত্ব বেড়েছে। বৈদেশিক বাণিজ্যের কাঠামোতেও পরিবর্তন ঘটেছে। রপ্তানি দ্রব্যে কৃষিজাত দ্রব্যের প্রাধান্য কমেছে এবং শিল্পজাত দ্রব্যের গুরুত্ব বেড়েছে। ভারতের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাগুলির নিম্নলিখিত সাফল্যগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য :

প্রথমত জাতীয় ও মাথাপিছু আয়ের বৃদ্ধি : পরিকল্পনা কালে (1951-2017) ভারতের জাতীয় আয় উল্লেখযোগ্য ভাবে বেড়েছে। পরিকল্পনার যুগ শুরু হবার আগের দশ বছরে (1940-50) ভারতীয় অর্থনীতি ছিল এক অনড় অর্থনীতি। ড. করণ সিং গিল-এর মতে, স্বাধীনতার প্রাক্কালে ভারতীয় অর্থনীতি ছিল একটি অনুন্নত, নিশ্চল এবং আধা-সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতি। তাঁর ভাষায়, ভারত তখন ছিল একটি underdeveloped, stagnant, semi-feudal economy। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ভারতকে একটি অবচিত বা হ্রাসপ্রাপ্ত অর্থনীতিতে পর্যবসিত করে এবং দেশ বিভাগ একে একটি বিচ্ছিন্ন বা অসংবদ্ধ অর্থনীতিতে পরিণত করে। তিনি বলেছিলেন, "World War II rendered it a depreciated economy and the partition of the contry reduced it to a dis-integrated economy". অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণের পর ভারত ধীরে ধীরে সেই অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসে। প্রথম দিকের পরিকল্পনাগুলিতে জাতীয় আয় বৃদ্ধির হার উল্লেখযোগ্য ছিল না। এই নিম্নহারের বৃদ্ধিকে (growth) অধ্যাপক রাজ কৃষ্ণ উন্নয়নের হিন্দু হার (Hindu rate of growth) বলে অভিহিত করেছেন। একথা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। তবে শেষের দিকে পরিকল্পনাগুলিতে, বিশেষত অষ্টম পরিকল্পনা থেকে দ্বাদশ পরিকল্পনা পর্যন্ত এই পাঁচটি পরিকল্পনাকালে অর্থাৎ 1992 এপ্রিল থেকে 2017 মার্চ পর্যন্ত এই 25 বছরে ভারতের জাতীয় ও মাথাপিছু আয় যথেষ্ট সন্তোষজনক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে।

দ্বিতীয়ত, পরিকল্পনাকালে ভারতের কৃষিরও যথেষ্ট অগ্রগতি ঘটেছে। পরিকল্পনার পূর্বে কৃষির উৎপাদনশীলতা ছিল খুবই কম, কৃষি ছিল একেবারেই অনুন্নত। পরিকল্পনার দ্বারা কৃষির উন্নতি ঘটানোর চেষ্টা হয়েছে। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে অনেক বহুমুখী নদী-উপত্যকা প্রকল্প রূপায়িত হয়েছে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ভাকরা-নাঙ্গাল প্রকল্প, হীরাকুদ প্রকল্প, চম্বল প্রকল্প, ময়ূরাক্ষী প্রকল্প, কংসাবতী প্রকল্প, কোশি প্রকল্প, গণ্ডক প্রকল্প ইত্যাদি। এসব প্রকল্পের ফলে কৃষিতে জলসেচের প্রসার ঘটেছে। তা ছাড়া, 1960-এর দশকের শেষদিকে কৃষিতে নয়া কৌশল প্রবর্তন করা হয়। এর ফলে কৃষিজাত দ্রব্যের

উৎপাদন বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। অনেকে উৎসাহভরে এই সাফল্যকে সবুজ বিপ্লব (green revolution) বলে অভিহিত করেছেন। এই সবুজ বিপ্লবের ফলে ভারত খাদ্যশস্যে প্রায় স্বয়ম্ভর।

তৃতীয়ত, অর্থনৈতিক পরিকল্পনার দ্বারা ভারতে এক উন্নত পরিকাঠামো (infrastructure) বা সামাজিক মূলধন (social overhead capital) গড়ে তোলা সম্ভব হয়েছে। এগুলিই দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়তা করে। রেল ও রাস্তা পরিবহন, বিদ্যুৎ সরবরাহ, যোগাযোগ ব্যবস্থা, তথ্যপ্রযুক্তি প্রভৃতি শিল্পের উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটেছে। পাশাপাশি, মূল ও ভারী শিল্প গড়ে তোলা হয়েছে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। পরবর্তী পরিকল্পনাগুলিতেও ভারী যন্ত্রপাতি, ভারী রাসায়নিক দ্রব্য প্রভৃতির উন্নতির উপর জোর দেওয়া হয়। এসবের ফলে ভারতে এক সুদৃঢ় ও বিস্তৃত পরিকাঠামো শিল্প গড়ে উঠেছে। এগুলি আবার বেসরকারি ক্ষেত্রকে বিনিয়োগে উৎসাহ জোগাচ্ছে।

চতুর্থত, অর্থনৈতিক পরিকল্পনার যুগে (1951-2017) ভারতের সঞ্চয় ও বিনিয়োগের হার উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। 1950-51 সালে অর্থাৎ পরিকল্পনা শুরুর সময়ে সঞ্চয়ের হার ছিল স্থূল অন্তর্দেশীয় উৎপন্নের (gross domestic product বা GDP) মাত্র 5 শতাংশ এবং বিনিয়োগের হার ছিল 31.5 শতাংশের মতো (2011-12) সালের দামস্তরে)। পরিকল্পনাকালে গ্রামাঞ্চলে ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার প্রসারের ফলে গ্রামীণ সঞ্চয় সংগ্রহ অনেকখানি বেড়েছে। পাশাপাশি, শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যে বিনিয়োগও বেড়েছে। পরিকল্পনার ফলেই এই সাফল্য পাওয়া সম্ভব হয়েছে।

পঞ্চমত, স্বাধীনতার প্রাক্কালে ভারত মূলত কৃষিজাত দ্রব্য রপ্তানি করত এবং শিল্পজাত দ্রব্য আমদানি করত। আমরা জানি, একে বলা হয় ঔপনিবেশিক ধরনের বাণিজ্য। বিভিন্ন পরিকল্পনা রূপায়ণের ফলে ভারত ধীরে ধীরে এই অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছে। প্রথম দিকের পরিকল্পনাগুলিতে আমদানি পরিবর্ততার নীতি (policy of import substitution) গ্রহণ করা হয়। আমদানি দ্রব্যের পরিবর্ত-দ্রব্য দেশের মধ্যে উৎপাদন করাই হল এর মূলকথা। এর ফলে ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের কাঠামোতে পরিবর্তন এসেছে। আগে যে সমস্ত শিল্পজাত দ্রব্য আমদানি করা হত তার অনেকগুলি এখন দেশেই উৎপন্ন হচ্ছে। 1991 সালে উদারীকরণের নীতি গ্রহণের পর ভারত অবশ্য আমদানি নিয়ন্ত্রণ হ্রাস করেছে এবং পাশাপাশি রপ্তানি প্রসারের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। পরিকল্পনার মাধ্যমেই আমদানি নিয়ন্ত্রণ ও রপ্তানি প্রসারের নীতির উপযুক্ত সমন্বয় সাধন করা সম্ভব হয়েছে।

ষষ্ঠত, পরিকল্পনাকালে, বিশেষত দশম পরিকল্পনা পর্যন্ত (2002-07), ভারতের সরকারি ক্ষেত্রের উল্লেখযোগ্য প্রসার ঘটেছে। টেলিযোগাযোগ, পারমাণবিক গবেষণা, তথ্যপ্রযুক্তি, পরিবহন, বিদ্যুৎ প্রভৃতি ক্ষেত্রের উন্নয়ন ও প্রসারের পিছনে ভারতের সরকারি ক্ষেত্রের অবদান উল্লেখযোগ্য। সরকারি ক্ষেত্র এভাবে উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো নির্মাণে সাহায্য করেছে।

সপ্তমত, পরিকল্পনাকালে উচ্চ শিক্ষা, কারিগরি ট্রেনিং, ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা প্রভৃতির যথেষ্ট প্রসার ঘটেছে। যেমন, 2011-12 সালে ভারতে কলেজের সংখ্যা ছিল 34,852টি। 2018-19 সালে কলেজের সংখ্যা বেড়ে 39,931-এ পৌঁছায়। আবার, 2011-12 সালে ভারতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল 642টি। 2018-19 সালে এই সংখ্যা দাঁড়ায় 993টি (সূত্র : Education Statistics at a Glance, 2018, Government of India)। তেমনি, কারিগরি ট্রেনিং এবং ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা প্রভৃতিরও উল্লেখযোগ্য প্রসার ঘটেছে। এসবের ফলে ভারতে মানবিক মূলধনের মান উন্নত হয়েছে। আর আমরা জানি যে, কোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে মানবিক মূলধনের (human capital) গুরুত্ব অপরিসীম।

এভাবে, অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ভারতের উন্নয়নে এক বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। পরিকল্পনার ফলে কৃষি উৎপাদনে স্থায়িত্ব এসেছে, মূল ও ভারী শিল্প উন্নত হয়েছে, পরিকাঠামো শিল্পের উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটেছে, দেশে কারিগরি শিক্ষা প্রসার লাভ করেছে, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যক্ষেত্রের উন্নতির ফলে মানবিক মূলধনের মান বৃদ্ধি পেয়েছে ইত্যাদি।

৪.৭ ভারতীয় পরিকল্পনার ব্যর্থতা

পরিকল্পনাকালে (1951-2017) ভারতীয় অর্থনীতির যথেষ্ট অগ্রগতি ঘটেছে। অর্থনীতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভারতের পরিকল্পনা সাফল্য অর্জন করেছে। তবে সাফল্যের পাশাপাশি পরিকল্পনাগুলির ব্যর্থতাও কম নয়। আমাদের পরিকল্পনার ব্যর্থতাগুলি সংক্ষেপে নিম্নলিখিতভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে।

প্রথমত, ভারতের পরিকল্পনাগুলির প্রধান ব্যর্থতা হল দারিদ্র্য দূরীকরণে ব্যর্থতা। বারোটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং কয়েকটি বার্ষিক পরিকল্পনা রূপায়ণের পরও ভারত থেকে দারিদ্র্য দূর হয়নি। আজও ভারতের জনসংখ্যার এক বিরাট অংশ দারিদ্র্যসীমার নীচে বাস করে। পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা থেকে দারিদ্র্য দূর করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু বিভিন্ন সমীক্ষার ফলাফল থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ভারতে জনসংখ্যার প্রায় এক-চতুর্থাংশ (25 শতাংশ) ব্যক্তি দারিদ্র্যসীমার নীচে বাস করে। ভারতে 2022 সালের 1 জানুয়ারি মোট জনসংখ্যা 140 কোটি ছাড়িয়ে গেছে। সুতরাং বলা যেতে পারে যে, ভারতে প্রায় 35 কোটি ব্যক্তি দারিদ্র্যসীমার নীচে বাস করে। অর্থাৎ এরা জীবনধারণের জন্য সর্বনিম্ন প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী সংগ্রহ করতে বা ক্রয় করতে পারে না। বর্তমানে বিভিন্ন দেশে দারিদ্র্য পরিমাপের জন্য শুধুমাত্র মাথাপিছু আয়কে মানদণ্ড না ধরে, শিক্ষা, স্বাস্থ্য পরিষেবা, বাসস্থান ইত্যাদি বিষয়কেও বিবেচনা করা হচ্ছে। এই মানদণ্ডটিকে বলা হয় বহুমাত্রিক দারিদ্র্য সূচক (Multi-dimensional Poverty Index বা MPI)। এই বহুমাত্রিক দারিদ্র্য সূচক অনুযায়ী ভারতে 2011 সালে দারিদ্র্যসীমার নীচে বাস করতো মোট জনসংখ্যার 53.7 শতাংশ। 2018 সালে এর পরিমাণ ছিল 27.9 শতাংশ (তথ্যসূত্র : Times of India, 25 নভেম্বর, 2021)। এটি ভারতের পরিকল্পনাগুলির নিদারুণ ব্যর্থতা।

দ্বিতীয়ত, ভারতীয় পরিকল্পনাগুলির আর একটি ব্যর্থতা হল বেকার সমস্যা দূরীকরণে ব্যর্থতা। পরিকল্পনা কালে জাতীয় ও মাথাপিছু আয় বেড়েছে কিন্তু কর্মসংস্থান তেমন বাড়েনি। ফলে প্রতিটি পরিকল্পনার শেষে মোট বেকারের সংখ্যা বেড়েছে। প্রথম দিকের পরিকল্পনাগুলিতে কর্মসংস্থানের বিষয়টির উপর জোর দেওয়া হয়নি। পরিকল্পনা রচয়িতারা ভেবেছিলেন যে, উৎপাদন বাড়ার সাথে সাথে কর্মসংস্থানও বাড়বে। কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি। আসলে মূলধন-নিবিড় উৎপাদন কৌশল ব্যবহৃত হলে মোট উৎপাদন বাড়ে বটে, কিন্তু কর্মসংস্থান বাড়ে না। ভারতে তাই কর্মহীন প্রসার (jobless growth) ঘটেছে। মূলধন-নিবিড় কৌশল গ্রহণের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা ও শিল্পের মন্দা। ফলে ভারতে আজ বেকার সমস্যা ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, দারিদ্র্য ও বেকারি একই সমস্যার এপিঠ-ওপিঠ। দেশের জনগণের একটা বড় অংশ কর্মহীন বলেই তারা দরিদ্র। 2009-10 সালে ভারতে মোট শ্রমিকের 28.1 শতাংশ ছিল কর্মহীন বা বেকার।

তৃতীয়ত, ভারতের পরিকল্পনাগুলির আর একটি ব্যর্থতা হল সরকারি ক্ষেত্রের ব্যর্থতা বা অদক্ষতা। অনেক সরকারি সংস্থাই রুগ্ন হয়ে পড়েছে। তাদের লোকসান বা ক্ষতির পরিমাণ দিন দিন বেড়ে চলেছে। ফলে সরকারের পক্ষে আর সেগুলি চালানো খুবই কষ্টকর হয়ে পড়ছে, সরকারের আর্থিক চাপ বাড়ছে। ভারত সরকার তাই বিভিন্ন সরকারি উদ্যোগের বেসরকারিকরণ ও বিলগ্নিকরণ শুরু করেছে। উল্লেখযোগ্য যে সমস্ত সরকারি সংস্থায় এরূপ পদক্ষেপ নেওয়া শুরু হয়েছে সেগুলি হ'ল : Hindustan Aeronautics Ltd (HAL) National Thermal Power Corporation (NTPC), Steel Authority of India Limited (SAIL), Gas Authority of India Ltd. (GAIL), Hundustan Petroleum Corporation Limited (HPCL), National Aluminium Corporation Ltd. (NALCO) প্রভৃতি (সূত্র : 2016 সালের কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর বাজেট বক্তৃতা)।

চতুর্থত, ভারতীয় পরিকল্পনাগুলির অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ছিল দামস্তরে স্থায়িত্ব বজায় রাখা। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই লক্ষ্য পূরণ করতেও পরিকল্পনাগুলি ব্যর্থ হয়েছে। শুধুমাত্র প্রথম পরিকল্পনার সময় দামস্তর বাড়েনি। কিন্তু দ্বিতীয় পরিকল্পনা থেকে শেষ দ্বাদশ পরিকল্পনা পর্যন্ত সব পরিকল্পনাতেই দামস্তর ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েছে।

পঞ্চমত, পরিকল্পনাকালে দামস্তর ক্রমাগত বৃদ্ধির ফলে স্থির আয়বর্গের ব্যক্তিদের প্রকৃত আয় কমেছে। তাদের জীবনযাত্রার বেড়েছে। তাছাড়া, মুদ্রাস্ফীতির ফলে দেশে আয় বৈষম্য ও সম্পদ বণ্টনে বৈষম্য বেড়েছে। ভারতীয় পরিকল্পনার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল আয় বৈষম্য দূর করা ও সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু পরিকল্পনাগুলি সেই উদ্দেশ্য পূরণ করতে পারেনি। পরিকল্পনাকালে দারিদ্র্য ও আয় বৈষম্য বেড়েছে। 2022 সালের জানুয়ারি মাসে বিশ্ব ব্যাঙ্ক প্রকাশিত তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ভারতে ধনীতম 10 শতাংশ ব্যক্তি দেশের জাতীয় আয়ের 50 শতাংশ ভোগ করে। আর এই ধনীদের মধ্যে উপরের 1 শতাংশ ব্যক্তি অর্থাৎ সবচেয়ে ধনী 1 শতাংশ ব্যক্তি জাতীয় আয়ের 13 শতাংশ ভোগ করে। এই তথ্য থেকে ভারতের প্রকট আয় বৈষম্যের কিছুটা অনুধাবন করা যায়।

ষষ্ঠত, পরিকল্পনাকালে দেশে কৃষিক্ষেত্রের তুলনায় শিল্পের অগ্রগতি বেশি হারে হয়েছে। অর্থাৎ কৃষি ও অ-কৃষিক্ষেত্রের উন্নয়নের মধ্যে ব্যবধান ক্রমাগত বেড়েছে। এভাবে দেশে ক্ষেত্রগত বৈষম্য (sectoral inequality) বেড়েছে।

সপ্তমত, পরিকল্পনাকালে শিল্পের উন্নতিতে আঞ্চলিক বৈষম্য তৈরি হয়েছে। দেশের কয়েকটি অঞ্চল শিল্পে উন্নত, আর বিস্তীর্ণ অঞ্চলে শিল্পের আদৌ উন্নতি ঘটেনি। এই সমস্ত অনগ্রসর অঞ্চলে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের প্রসার ঘটালে এই আঞ্চলিক বৈষম্য কিছুটা কমত। কিন্তু তা রূপায়ণের চেষ্টা বিশেষ হয়নি। ফলে দেশের সমস্ত অঞ্চলে শিল্পের সুষম বিকাশ ঘটেনি।

সুতরাং ভারতের পরিকল্পনাগুলির সাফল্যের পাশাপাশি কিছু চরম ব্যর্থতা রয়েছে। সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা হল দারিদ্র্য ও বেকারি দূরীকরণে ব্যর্থতা। আয় ও সম্পদ বণ্টনে বৈষম্য বৃদ্ধিও ভারতীয় পরিকল্পনাগুলি অন্যতম উল্লেখযোগ্য ব্যর্থতা। এই ব্যর্থতাগুলির পিছনে প্রধান কয়েকটি কারণ হল : রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাব, আমলাতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ, রাজনৈতিক নেতা ও উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারীদের দুর্নীতি, পরিকল্পনা রচনা ও তা রূপায়ণে ত্রুটি প্রভৃতি। ফলে ভারতে রয়ে গেছে দারিদ্র্য, বেকারি, আয় বৈষম্য প্রভৃতি। দীর্ঘ 65 বছরেরও বেশি সময়কাল ধরে ভারতে পরিকল্পনার যুগ চলেছে। অথচ বৃহত্তর জনগণের মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যাগুলি দূর করতে পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়েছে। অনেকেরই তাই ভারতীয় পরিকল্পনা সম্পর্কে মোহভঙ্গ হতে শুরু করে 2010-এর দশকের শুরুর দিক থেকে। অনেক অর্থনীতিবিদ তখন থেকেই পরিকল্পনা তুলে দেওয়ার পক্ষে সওয়াল করেন। ভারত সরকার এই সমস্ত অর্থনীতিবিদদের সঙ্গে সহমত পোষণ করে 2015 সালের 1 জানুয়ারি পরিকল্পনা কমিশন ভেঙে দেয়। এর পরিবর্তে তৈরি করা হয় NITI (National Institution for Transforming India) আয়োগ। বলা হয় য়ে, এই NITI আয়োগ সরকারের পলিসি থিঙ্ক-ট্যাঙ্ক (Policy think-tank) হিসেবে কাজ করবে অর্থাৎ ভারত সরকারকে বিভিন্ন আর্থিক বিষয়ে পরামর্শ দান করবে এবং সরকারের নীতি নির্ধারণেও সাহায্য করবে। এছাড়া, সরকারের নীতি নির্ধারণে অঙ্গরাজ্যগুলিকে সামিল করারও চেষ্টা করা হবে। এভাবে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্যগুলির প্রাদেশিক সরকার মিলে এবং আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে বিভিন্ন নীতি ও অর্থনৈতিক কর্মসূচি গ্রহণ করবে। তবেই ভারতে যথার্থ যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা গড়ে উঠবে বলে সরকার দাবি করেছে। এই NITI আয়োগ সম্পর্কে আমরা পরবর্তী বিভাগে আলোচনা করব।

৪.৮ সারাংশ

1991 সালে ভারত সরকার ভারতীয় অর্থনীতির কাঠামোগত সংস্কারের যে দীর্ঘমেয়াদী পদক্ষেপ গ্রহণ করে তাকেই বলা হয় ভারতের অর্থনৈতিক সংস্কার বা নতুন অর্থনৈতিক নীতি। এই অর্থনৈতিক সংস্কারের উদ্দেশ্য হলো দক্ষতা বৃদ্ধি, অত্যধিক মূলধন প্রগাঢ়তার ঝোঁক হ্রাস এবং কর্মসংস্থানমুখী শিল্পায়নকে উৎসাহিত করা বাস্তবে ভারতের এই অর্থনৈতিক সংস্কারের মূল লক্ষ হলো ভারতের কেন্দ্রীয়

ভাবে পরিকল্পিত অর্থনীতিকে বাজারমুখী অর্থনীতিতে রূপান্তরিত করা। এই অর্থনৈতিক সংস্কারের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতে একটি বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে। বিতর্কটি হলো ভারতীয় পরিকল্পনা কি বিপন্ন হতে চলেছে? প্রকৃতপক্ষে এই বিতর্কের মূল বিষয় হয় বাজার অর্থনীতির পরিপ্রেক্ষিতে পরিকল্পনা।

১. উন্নয়নের লক্ষ্যে ভারতে পরিকল্পনা প্রবর্তন :

স্বাধীনতা লাভের পর দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ভারত সরকার অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রবর্তন করে। 1951 সাল থেকে ভারতে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার যুগ শুরু হয় এবং 2017 সালের 31 মার্চ তা শেষ হয়। এই সময়কালে ভারত সরকার 12টি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং কয়েকটি বার্ষিক পরিকল্পনা রূপায়িত করে। ভারতে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রবর্তনের মূল যুক্তি হল : (i) সাধারণ জনগণের দারিদ্র্য দূর করে দেশের কল্যাণ বৃদ্ধি করা, (ii) দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নতি অর্জন, (iii) আয় ও সম্পদ বণ্টনে বৈষম্য হ্রাস করা, (iv) মূল ও ভারী শিল্পের প্রসার, (v) সাধারণ জনগণের কাছে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের সরবরাহ নিশ্চিত করা, (vi) বেকার সমস্যা দূর করা, (vii) শিল্পের উন্নয়নে আঞ্চলিক বৈষম্য দূর করা (viii) বৈদেশিক বাণিজ্যের কাঠামোয় কাম্য পরিবর্তন আনা, এবং (ix) সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা।

২. ভারতীয় পরিকল্পনার উদ্দেশ্যসমূহ :

ভারতীয় পরিকল্পনার উদ্দেশ্যগুলিকে তিন ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথম ভাগে রয়েছে সর্বভারতীয় স্তরে কাম্য উদ্দেশ্যসমূহ। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল : জাতীয় ও মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি, পর্যাপ্ত কর্মসংস্থান সৃষ্টি, সঞ্চয় ও বিনিয়োগের হার বৃদ্ধি, সঞ্চয় ও বিনিয়োগের হার বৃদ্ধি, দামস্তরে স্থিতিশীলতা রক্ষা এবং বৈদেশিক বাণিজ্যে ভারসাম্য রক্ষা। দ্বিতীয় ভাগে রয়েছে দেশের নির্দিষ্ট কিছু অঞ্চলের সুবিধার জন্য গৃহীত উদ্দেশ্যসমূহ। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল : আয় ও সম্পদ বণ্টনে বৈষম্য হ্রাস, উন্নয়নের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক বৈষম্য হ্রাস, কৃষির উন্নয়ন এবং শিল্পের উন্নয়ন। তৃতীয় ভাগে রয়েছে সর্বভারতীয় অর্থনীতিতে কাঠামোগত পরিবর্তন আনার জন্য গৃহীত উদ্দেশ্যসমূহ। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল : কৃষি উপকরণের মালিকানা নিয়ন্ত্রণ এবং কৃষি-বহির্ভূত অন্যান্য ক্ষেত্রের উপকরণগুলির ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন রোধ ও হ্রাস করা। অবশ্য এই সমস্ত উদ্দেশ্যগুলির পিছনে মূল উদ্দেশ্য হল দারিদ্র্য দূর করা এবং জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নত করা।

৩. ভারতীয় পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্যসমূহ :

ভারতের অর্থনৈতিক পরিকল্পনাগুলির কয়েকটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হল : (i) এগুলি সামগ্রিক পরিকল্পনা, আংশিক পরিকল্পনা নয়। (ii) পরিকল্পনাগুলি ছিল মিশ্র অর্থনৈতিক পরিকল্পনা। (iii) ভারতের অর্থনৈতিক পরিকল্পনাগুলি ছিল নির্দেশাত্মক পরিকল্পনা, সেগুলি আদেশাত্মক পরিকল্পনা নয়। (iv) ভারতের পরিকল্পনাগুলি ছিল উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা — সংশোধনমূলক পরিকল্পনা নয়। (v) ভারতের পরিকল্পনাগুলি ছিল গণতান্ত্রিক পরিকল্পনা — একনায়কতান্ত্রিক পরিকল্পনা নয়।

৪. ভারতীয় পরিকল্পনার বিবর্তন

সমগ্র পরিকল্পনাকালে (1951-2017) ভারতীয় পরিকল্পনাগুলির উদ্দেশ্য, অর্থ সংস্থান, কৌশল, লক্ষ্যমাত্রা ইত্যাদি ক্ষেত্রে নানা বিবর্তন ঘটেছে। আমরা জানি, 1980 সাল পর্যন্ত ভারতের উন্নয়ন কৌশলে সরকারি ক্ষেত্রের প্রাধান্য ছিল। কিন্তু 1980 সালের পর থেকে ভারতে বেসরকারি ক্ষেত্র এবং বাজার-ব্যবস্থার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। 1991 সালের শিল্পনীতিতে উদারীকরণ, বেসরকারিকরণ এবং বিশ্বায়নের উপর জোর দেওয়া হয়। এই সংস্কার নীতি গ্রহণের পূর্বে ভারতে 7টি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও 3টি বার্ষিক পরিকল্পনা রূপায়িত হয়। সুতরাং, সপ্তম পরিকল্পনার পর থেকে উদারনীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে পরিকল্পনা গৃহীত হয়। উদারীকরণের যুগে ভারতের পরিকল্পনাগুলিতে যে সমস্ত পরিবর্তন ঘটেছে, সেগুলি নিম্নরূপ : (i) সংস্কার- পরবর্তী পরিকল্পনাগুলিতে সরকারি ক্ষেত্র থেকে বেসরকারি ক্ষেত্রে গুরুত্ব সরে গেছে। (ii) ব্যাঙ্কিং এবং বিমা ক্ষেত্রে বেসরকারি মূলধনের উপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। (iii) পূর্বের পরিকল্পনাগুলিতে সরাসরি কর্মসংস্থানের উপর জোর দেওয়া হয়নি। ষষ্ঠ পরিকল্পনা থেকে কর্মসংস্থানের বিষয়টির উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। (iv) পঞ্চম এবং তার পরবর্তী পরিকল্পনাগুলিতে দারিদ্র্য দূরীকরণের উপর সরাসরি জোর দেওয়া হয়। (v) বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে পঞ্চম পরিকল্পনা (1974-79) পর্যন্ত ছিল আমদানি নিয়ন্ত্রণ ও আমদানি পরিবর্তকতার নীতি। কিন্তু ষষ্ঠ পরিকল্পনা থেকে রপ্তানি প্রসারের নীতির উপর জোর দেওয়া হয়। প্রথম নীতিটিকে বলা হয় অন্তর্মুখী উন্নয়ন কৌশল। আর দ্বিতীয় কৌশলটিকে বলা হয় বহির্মুখী উন্নয়ন কৌশল। (vi) দশম, একাদশ ও দ্বাদশ পরিকল্পনায় প্রাথমিক শিক্ষা ও গ্রামীণ উন্নয়নের উপর তুলনামূলকভাবে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। (vii) 1991 সালের পরবর্তী পরিকল্পনাগুলি রূপায়ণের জন্য বাজার-ব্যবস্থা ও বেসরকারি উদ্যোগের উপর বেশি নির্ভর করেছে। (viii) উদারীকরণের পূর্বের পরিকল্পনাগুলি ছিল অনেক প্রত্যক্ষ বা সরাসরি। উদারীকরণের পরের পরিকল্পনাগুলির ক্ষেত্র বা ব্যাপকতা কিছুটা হলেও কমেছে। (ix) নবম পরিকল্পনা (1997-2002) থেকে সরকারি শিল্পক্ষেত্রে বরাদ্দের অংশ কমতে থাকে। (x) পরিকল্পনার অর্থসংস্থানের ধরনেও পরিবর্তন ঘটেছে। 1969 সাল পর্যন্ত বৈদেশিক সাহায্যের উপর বেশি নির্ভর করা হয়েছিল। চতুর্থ পরিকল্পনা (1969-74) থেকে বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীলতা কমতে থাকে। এই সময় থেকে অর্থসংস্থানের অভ্যন্তরীণ উৎস হিসাবে সরকারি ঋণের পরিমাণ বাড়তে থাকে।

৫. ভারতীয় পরিকল্পনার সাফল্য :

ভারতীয় পরিকল্পনার প্রধান সাফল্যগুলি হল : (i) পরিকল্পনাকালে জাতীয় ও মাথাপিছু আয়ের বৃদ্ধি, (ii) খাদ্যে প্রায় স্বয়ম্ভরতা, (iii) মূল ও ভারী শিল্পের উন্নতি, (iv) পরিকাঠামোর উন্নতি, (v) সঞ্চয় ও বিনিয়োগের হার বৃদ্ধি, (vi) বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রসার ও বৈচিত্র্য, (vii) সরকারি ক্ষেত্রের প্রসার প্রভৃতি।

৬. ভারতীয় পরিকল্পনার ব্যর্থতা :

ভারতীয় পরিকল্পনার উল্লেখযোগ্য ব্যর্থতাগুলি হল : (i) ব্যাপক দারিদ্র্যের উপস্থিতি, (ii) ক্রমবর্ধমান বেকারি, (iii) দামস্তরে বৃদ্ধি, (iv) সরকারি ক্ষেত্রের অদক্ষতা, (v) নিম্ন উন্নয়নের হার, (vi) আয় ও সম্পদ বণ্টনে বৈষম্য বৃদ্ধি, (vii) শিল্পের অসম বিকাশ প্রভৃতি।

৭. পরিকল্পনার সমাপ্তি ও NITI আয়োগ স্থাপন :

ভারতের অর্থনৈতিক পরিকল্পনাগুলি অনেক সময়ই তাদের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করতে পারেনি। অনেক প্রকল্পই নির্দিষ্ট সময়ে শেষ হয়নি। অনেক অর্থনীতিবিদ তাই ভারতের পরিকল্পনা কমিশন ভেঙে দেওয়ার বা তুলে দেওয়ার সুপারিশ করেন। অনুরূপ চিন্তা করে ভারত সরকার 2015 সালের 1 জানুয়ারি ভারতের পরিকল্পনা কমিশনের বদলে NITI (National Institution for Transforming India) আয়োগ স্থাপন করে। এই আয়োগ বর্তমানে ভারত সরকারের পলিসি থিঙ্ক-ট্যাঙ্ক হিসাবে কাজ করছে। এর লক্ষ্য হল সরকারের নীতি নির্ধারণে অঙ্গ রাজ্যগুলিকে সামিল করা। বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে এই আয়োগ নীচের স্তর থেকে কাজ শুরু করে উপরের স্তরের দিকে যাত্রা করবে। NITI আয়োগ স্থাপনের পূর্বে চালু ছিল উপরের স্তর থেকে নীচে সিদ্ধান্ত গ্রহণ পদ্ধতি। এতে রাজ্য বা তার নীচের স্তরের সংস্থাগুলির মতামত গুরুত্ব পেত না। কেন্দ্রীয় স্তরে নেওয়া সিদ্ধান্ত তাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হত। ফলে ভারতের মতো বৈচিত্র্যপূর্ণ দেশে বিভিন্ন আঞ্চলিক বিষয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় গুরুত্ব পেত না। সরকারের দাবি যে, এই নতুন NITI আয়োগ কর্মপদ্ধতি সেই ত্রুটি দূর করবে। এভাবে, আগের ''কেন্দ্র থেকে রাজ্যে'' নীতির বদলে এল ''রাজ্য থেকে কেন্দ্রে'' নীতির প্রণয়ন। এটিকে বলা যেতে পারে সহযোগিতামূলক যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা। অবশ্য NITI আয়োগ শুধু বিভিন্ন নীতি সম্পর্কে সুপারিশ করবে। সেগুলি রূপায়ণের এক্তিয়ার সরকারের।

৪.৯ অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত উত্তরের প্রশ্নাবলী

১. ভারত কোন সালে ব্রিটিশ রাজ্যের শাসনের অধীনে আসে?

২. ভারতে সংবিধান কোন সালে গৃহীত হয়?

৩. ভারতে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কখন শুরু হয়?

৪. ভারতের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কার্যকাল কী?

৫. ভারতের শেষ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কোন্‌টি?

৬. দ্বাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কার্যকাল কী?

৭. ভারতে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য কি ছিল?

৮. NITI আয়োগ কি?

৯. কখন NITI চালু হয়েছিল?

১০. ভারতীয় পরিকল্পনার দুটি সাফল্য লেখ।

মাঝারি দৈর্ঘ্যের উত্তরের প্রশ্নাবলী

১. ভারতীয় পরিকল্পনার দুটি প্রধান উদ্দেশ্য লেখ।

২. ভারতীয় পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্যগুলি লেখ।

৩. ভারতীয় পরিকল্পনার দুটি প্রধান ব্যর্থতা লেখ।

৪. ভারতীয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনার দুটি প্রধান সাফল্য উল্লেখ কর।

৫. পরিকল্পনাকালে ভারতের জাতীয় ও মাথাপিছু আয়ের কেমন পরিবর্ত্তন ঘটেছে?

৬. ভারতের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা সংক্ষেপে উল্লেখ কর।

৭. NITI আয়োগের উদ্দেশ্যগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

৮. ভারতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সাফল্য নিয়ে তোমার মতামত দাও।

৯. ভারতীয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনার ব্যর্থতা নিয়ে তোমার মতামত দাও।

১০. স্বাধীনতার ঠিক পরবর্ত্তীকালে ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা কিরূপ ছিল?

দীর্ঘ উত্তরের প্রশ্নাবলী

১. ভারতীয় পরিকল্পনার প্রধান উদ্দেশ্যগুলি বর্ণনা কর।

২. ভারতীয় পরিকল্পনার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা কর।

৩. ভারতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সাফল্যগুলি আলোচনা কর।

৪. ভারতীয় পরিকল্পনাগুলির কৃতিত্বের মূল্যায়ন কর।

৫. ভারতে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার পরিবর্ত্তে NITI আয়োগ স্থাপনের যৌক্তিকতা আলোচনা কর।

৬. ভারতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সাফল্য ও ব্যর্থতার মধ্যে একটি তুলনামূলক বিচার কর।

Multiple Choice Questions (MCQ)

১. প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ভারতে কোন সালে হয়—

(ক) 1947 (খ) 1951
(গ) 1960 (ঘ) কোনোটিই নয়

২. ভারতের পরিকল্পনাগুলি হল—

(ক) আদেশাত্মক পরিকল্পনা (খ) নির্দেশাত্মক পরিকল্পনা
(গ) কোনোটিই নয়

৩. রাজ্য ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানের বক্তব্য শোনার পর কেন্দ্রীয় সরকার যে নীতি নির্ধারণ করে তা হল—

(ক) যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা (খ) একনায়কতন্ত্র
(গ) কোনোটিই নয়

৪. ভারতে মোট পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সংখ্যা হলো—

(ক) দশটি (খ) বারোটি
(গ) কোনোটিই নয়

৫. আমদানী পরিবর্ত্ততা বলিতে কি বোঝায়?

(ক) আমদানী হ্রাস করা (খ) আমদানী বৃদ্ধি করা
(গ) আমদানীকৃত দ্রব্যের উৎপাদন (ঘ) কোনোটিই নয়

৬. পরিকাঠামোকে কি মূলধন হিসাবে গণ্য করা যায়?

(ক) আর্থিক মূলধন (খ) ভৌত মূলধন
(গ) সামাজিক মূলধন (ঘ) কোনোটিই নয়

৭. ভারতের অর্থনৈতিক পরিকল্পনাগুলি ছিল—

(ক) ধনতান্ত্রিক পরিকল্পনা (খ) সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনা
(গ) মিশ্র অর্থনৈতিক পরিকল্পনা (ঘ) কোনোটিই নয়

৮. ভারতের পরিকল্পনা কি?

(ক) সমগ্র অর্থনীতির (খ) আংশিক অর্থনীতি
(গ) কোনোটিই নয়

৯. ভারতীয় পরিকল্পনার মূল লক্ষ ছিল—

(ক) স্বয়ম্বরতা অর্জন (খ) নির্ভরশীলতা

(গ) কোনোটিই নয়

১০. ভারতীয় পরিকল্পনার অর্থ সংস্থানের উপায় ছিল—

(ক) আভ্যন্তরীণ উৎস (খ) আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক উৎস

(গ) কোনোটিই নয়

৪.১০ গ্রন্থপঞ্জি

১. সরখেল, জয়দেব ও সেখ সেলিম (2022) : ভারতীয় অর্থনীতি, বুক সিন্ডিকেট প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা।

২. Datt, Gaurav & Ashwani Mahajan (2020) : *Indian Economy*, S. Chand and Company Limited, New Delhi.

৩. Puri, V. K. and S. K. Misra (2020) : *Indian Economy*, Himalaya Publishing House, Mumbai.

৪. Kapila, Uma (2017-18) : Indian Economy, Academic Foundation, New Delhi

৫. সেখ সেলিম (2011) : ভারতের পরিকল্পনা ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন, গ্রন্থমিত্র, কলকাতা

৬. রায়, স্বপন কুমার ও জয়দেব সরখেল (2018) : ভারতের অর্থনীতি, বুক সিন্ডিকেট প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা।

একক – ৫ ❑ ভারতের উন্নয়নে আঞ্চলিক বৈষম্য

গঠন

৫.১ উদ্দেশ্য

৫.২ প্রস্তাবনা

৫.৩ ভারতের উন্নয়নে আঞ্চলিক বৈষম্যের মাত্রা ও গভীরতা

৫.৩.১ ভারতের উন্নয়নে আঞ্চলিক বৈষম্যের মাত্রা ও গভীরতা

৫.৪ আঞ্চলিক বৈষম্যের কারণ এবং প্রকারভেদ

৫.৫ আঞ্চলিক বৈষম্যের প্রতিকার

৫.৬ অর্থনৈতিক সংস্কারের পূর্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী সময়ে আঞ্চলিক বৈষম্য

৫.৭ সারাংশ

৫.৮ অনুশীলনী

৫.৯ গ্রন্থপঞ্জি

৫.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে ছাত্রছাত্রীরা জানতে পারবে

- ভারতের উন্নয়নে আঞ্চলিক বৈষম্য কি এবং তার গভীরতা
- আঞ্চলিক বৈষম্য কেন হয়
- এর প্রতিকারের কি কি উপায় আছে এবং ব্যবস্থা কি নেওয়া হয়েছে
- ভারতে আয় বন্টনে বৈষম্য কি রূপ এবং তার প্রতিকার

৫.২ প্রস্তাবনা

আঞ্চলিক বৈষম্য যে কোনো প্রকারের উন্নয়নে একটি বড় বাধা বিশেষ করে আয়বন্টনে যদি বৈষম্য থাকে তাহলে সর্বাত্মক এবং ভারসাম্যযুক্ত উন্নয়ন কখনই সম্ভব নয়। তাই এই অন্তরায়টি দূর করতে গেলে জানতে হবে এই ধরনের বৈষম্যর পিছনে কি কি কারণ আছে। স্বাধীনতার পরে ভারতে অনেকটাই

অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটেছে তবে সেই উন্নয়ন অনেকটা ভারসাম্যহীন। তাই এত বছর পরেও আমরা ভারতবর্ষকে একটি উন্নত দেশ হিসাবে পাচ্ছি না। ভারতে কিছু কিছু অঞ্চল যথেষ্ট উন্নত। আবার কিছু অঞ্চল বেশ অনুন্নত। উন্নয়নের এই আঞ্চলিক বৈষম্যের মাত্রা, কারণ ও সম্ভাব্য প্রতিকার নিয়েও এই এককে আলোচনা করা হয়েছে।

৫.৩ ভারতের উন্নয়নে আঞ্চলিক বৈষম্যের মাত্রা ও গভীরতা

আঞ্চলিক বৈষম্য হলো সম্পদের অসম বন্টন, বিভিন্ন প্রকার সুযোগ সুবিধার অসম পরিস্থিতি এবং দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে উন্নয়নের অসম অবস্থা। এইরূপ অবস্থা থেকে আয়ের মধ্যে কর্ম নিয়োগ এর মাত্রায় জীবনের মানোন্নয়নের মধ্যে বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে পার্থক্য দেয়।

আঞ্চলিক বৈষম্যের উদাহরণ

- মাথা পিছু আয় : কিছু অঞ্চলে উচ্চ মাথাপিছু আয় এবং কিছু কিছু অঞ্চলে নিম্ন উচ্চ আয় দেশা দেয়।
- শিক্ষা : প্রাথমিক শিক্ষায় অন্তর্ভুক্তি কোনো কোনো অঞ্চলে বেশী আবার কোনো কোনো অঞ্চলে কম।
- খাদ্য সামগ্রীর ভাণ্ডার : এরও তারতম্য দেখা যায় অঞ্চল বিশেষে।
- পরিকাঠামো : পরিকাঠামোর বিষয়ে অঞ্চলভিত্তিক তারতম্য দেখা দেয়। পরিকাঠামো বলতে রাস্তাঘাট, বিদ্যুৎ পরিসেবা, ঘরবাড়ী ইত্যাদিকে মূলত বোঝায়।

ভারতে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা শুরু হয় 1950-51 সালে এবং তা শেষ হয় 2016-17 সালে। এই পরিকল্পনাকালে এবং তার পরবর্তী বছরগুলিতে ভারতের জাতীয় আয় এবং মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। 2012-13 সালে ভারতের মাথাপিছু নিট জাতীয় উৎপাদন ছিল 66,344 টাকা (2011-12 সালের দামস্তরে)। 2015-16 সালে এর পরিমাণ দাঁড়ায় 77,659 টাকা। আর 2017-18 সালে মাথাপিছু নিট জাতীয় উৎপাদনের পরিমাণ দাঁড়ায় 87,828 টাকা (সব তথ্যই 2011-12 সালের দামস্তরে)। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, ভারতের প্রকৃত মাথাপিছু আয় অর্থাৎ স্থির দামে মাথাপিছু আয় কিছুটা ধীরে হলেও বেড়েছে। মাথাপিছু ‘প্রকৃত’ জাতীয় আয়ের হিসাবের মধ্যে মুদ্রাস্ফীতির প্রভাব বাদ পড়ে এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রভাব এর মধ্যে ধরা পড়ে। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে যে, মাথাপিছু আয় একটা গড় হিসাব মাত্র। আমরা বলেছি যে, 2017-18 সালে ভারতের নিট মাথাপিছু প্রকৃত আয় (2011-12 দামস্তরে) 87,828 টাকা। এর অর্থ এই নয় যে, প্রত্যেক ভারতীয়র আয় এর সমান। অর্থাৎ আয়-বৈষম্যের বিষয়টি এখানে ধরা হয় না। ভারতে আয় বণ্টনে তীব্র বৈষম্য বর্তমান। এই আয় বৈষম্যের সমস্যা আমরা চতুর্থ এককে আলোচনা করেছি। আর একটি বিষয়ও বিবেচনাযোগ্য। আমরা যে প্রকৃত মাথাপিছু আয়ের কথা

উল্লেখ করেছি সেটি একটি সর্বভারতীয় গড়। ভারতের সমস্ত অঞ্চলে জনসাধারণের মাথাপিছু আয় এক নয়। অন্যভাবে বলতে গেলে, ভারতে উন্নয়নের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক বৈষম্যও রয়েছে। দেশটির কোনো অঞ্চল খুবই উন্নত, আবার কোনো অঞ্চল যথেষ্ট অনুন্নত। ভারতে উন্নয়নের এই আঞ্চলিক বৈষম্য নিয়ে আলোচনা করব বর্তমান বিভাগে। প্রথমে আমরা ভারতে আঞ্চলিক বৈষম্যের মাত্রা বা গভীরতা বিবেচনা করব এবং তারপর এই আঞ্চলিক বৈষম্যের কারণ ও তার সম্ভাব্য প্রতিকার সম্পর্কে আলোকপাত করার চেষ্টা করব।

৫.৩.১ ভারতের উন্নয়নে আঞ্চলিক বৈষম্যের মাত্রা ও গভীরতা

ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বড় মাত্রায় আঞ্চলিক বৈষম্য রয়েছে। উন্নয়নের একটি প্রধান মানদণ্ড হল মাথাপিছু প্রকৃত আয়। যে দেশের প্রকৃত মাথাপিছু আয় যত বেশি, সেই দেশকে তত উন্নত বলে ধরা যেতে পারে। আমরা এখানে ভারতের উন্নয়নে আঞ্চলিক বৈষম্য বিবেচনার করার জন্য বিভিন্ন রাজ্যের মাথাপিছু প্রকৃত আয় বিবেচনা করবো। আমাদের আলোচনায় আমরা অপ্রধান রাজ্যগুলিকে, যেমন, নাগাল্যান্ড, মিজোরাম, ত্রিপুরা, মেঘালয়, সিকিম, হিমাচল প্রদেশ প্রভৃতি রাজ্যকে বাদ দিচ্ছি এবং প্রধান রাজ্যগুলির প্রকৃত মাথাপিছু আয় বিবেচনা করছি।

5.1 নং সারণিতে আমরা 2004-05 সালে ভারতের প্রধান রাজ্যগুলির মাথাপিছু আয় (1993-94 দামস্তরে) দেখিয়েছি। সারণি থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ভারতের উন্নত রাজ্যগুলির মধ্যে রয়েছে পাঞ্জাব, মহারাষ্ট্র, হরিয়ানা, গুজরাট, পশ্চিমবঙ্গ, কর্ণাটক, কেরালা এবং তামিলনাড়ু। এদের মাথাপিছু আয় সর্বভারতীয় গড় মাথাপিছু আয়ের চেয়ে বেশি। অন্ধ্রপ্রদেশের অবস্থান সর্বভারতীয় গড় আয়ের খুব কাছাকাছি। আমরা অন্ধ্রপ্রদেশকেও তাই উন্নত রাজ্যের তালিকায় রেখেছি। অন্যদিকে, যে সমস্ত রাজ্যের মাথাপিছু প্রকৃত আয় সর্বভারতীয় গড়ের চেয়ে কম, তাদের আমরা অনুন্নত বা পিছিয়ে পড়া রাজ্য বলেছি। আমাদের তালিকায় এরূপ প্রধান রাজ্য রয়েছে 6টি। সেগুলি হল রাজস্থান, ওড়িশা, মধ্যপ্রদেশ, আসাম, উত্তর প্রদেশ এবং বিহার। সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, সবচেয়ে বেশি মাথাপিছু আয়ের রাজ্য হল মহারাষ্ট্র। এর মাথাপিছু আয় 17,864 টাকা। অন্যদিকে, বিহারের মাথাপিছু আয় সবচেয়ে কম — মাত্র 3,773 টাকা। মহারাষ্ট্রে মাথাপিছু আয় বিহারের মাথাপিছু আয়ের 4.74 গুণ।

আমাদের প্রদত্ত তথ্য কিছু পুরনো। সেজন্য অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক চিত্র পাবার জন্য আমরা সারণি 5.3-তে 2013-14 সালে ভারতের প্রধান রাজ্যগুলির মাথাপিছু নিট অন্তর্দেশীয় উৎপাদন (2004-05) সালের দামস্তরে) দেখিয়েছি। সারণি থেকে দেখা যাচ্ছে যে, এগিয়ে থাকা রাজ্য এবং পিছিয়ে থাকা রাজ্যের তালিকায় কোনো পরিবর্তন হয়নি। শুধু কোনো নির্দিষ্ট তালিকার অন্তর্ভুক্ত রাজ্যগুলির মধ্যে আপেক্ষিক অবস্থানের পরিবর্তন হয়েছে মাত্র। 2004-05 সালের ন্যায় 2013-14 সালেও মহারাষ্ট্রের নিট মাথাপিছু উৎপন্ন সর্বাধিক (69,584 টাকা)। আর বিহারের সর্বনিম্ন (14,650 টাকা) (সারণি 5.2)। আর তাদের মধ্যে আয়ের পার্থক্যের অনুপাতও মোটামুটি একই (4.65)। সুতরাং আমরা বলতে পারি যে, 2004-05 থেকে 2013-14 এই দশকে ভারতের উন্নয়নে আঞ্চলিক বৈষম্য কমেনি।

সারণি 5.1

রাজ্যভিত্তিক মাথাপিছু নিট অন্তর্দেশীয় স্থূল উৎপন্ন (2004-05)

(1993-94 সালের দামস্তরে)

রাজ্য সমুহ	মাথাপিছু নিট অন্তর্দেশীয় স্থূল উৎপন্ন (টাকায়)
উন্নত রাজ্যসমূহ :	
1. মহারাষ্ট্র	17,864
2. গুজরাট	16,878
3. হরিয়ানা	16,872
4. পাঞ্জাব	16,756
5. তামিলনাড়ু	13,999
6. কেরালা	13,821
7. কর্ণাটক	13,320
8. পশ্চিমবঙ্গ	12,271
9. অন্ধ্রপ্রদেশ	12,352
পিছিয়ে থাকা রাজ্যসমূহ :	
10.রাজস্থান	9,853
11.মধ্যপ্রদেশ	8,238
12.ওড়িশা	7,176
13.অসম	6,721
14.উত্তর প্রদেশ	6,138
15.বিহার	3,773
ভারত	**12,595**

সূত্র : Indian Public Finance Statistics, 2004-05, Ministry of Finance, Government of India.

সারণি 5.2

ভারতে প্রধান 14টি রাজ্যের মাথাপিছু নিট অন্তর্দেশীয় উৎপাদন (2013-14)

(2004-05 সালের দামস্তরে)

রাজ্যসমূহ	মাথাপিছু নিট অন্তর্দেশীয় উৎপাদন (টাকায়)
এগিয়ে থাকা রাজ্যসমূহ :	
1. মহারাষ্ট্র	69,584
2. হরিয়ানা	67,317
3. তামিলনাড়ু	62,361
4. গুজরাট	61,220*
5. কেরালা	56,115*
6. পাঞ্জাব	49,411
7. অন্ধ্রপ্রদেশ	46,788
8. কর্ণাটক	45,024
পিছিয়ে থাকা রাজ্য :	
9. রাজস্থান	30,120*
10. মধ্যপ্রদেশ	27,917
11. ওড়িশা	25,891
12. অসম	24,533
13. উত্তর প্রদেশ	19,234
14. বিহার	14,650

টীকা : * চিহ্নিত মানগুলি 2012-13 সালের

সূত্র : 1. Handbook of Statistics for Indian Economy (2013-14), RBI

2. CSO, National Accounts Statistics, 2013-14.

সারণি থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ভারতের প্রধান রাজ্যগুলির মধ্যে উন্নয়নে আঞ্চলিক বৈষম্য রয়েছে। পার্বত্য এলাকার রাজ্যগুলিকে এই তালিকায় বিবেচনা করলে উন্নয়নে বৈষম্য আরো প্রকট হবে।

ভারতের রাজ্যগুলির মধ্যে উন্নয়ন স্তরে এই আন্তঃরাজ্য বৈষম্য আরো কয়েকটি উন্নয়ন সূচকের মধ্যে প্রতিফলিত। যেমন, উন্নত রাজ্যগুলিতে মাথাপিছু শক্তির ব্যবহার (power consumption) অনুন্নত রাজ্যগুলির তুলনায় বেশি। আবার, প্রতি 1,000 জন প্রতি নিবন্ধীকৃত যানবাহনের সংখ্যা যদি বিচার করি, সেখানেও দেখা যাচ্ছে যে, উন্নত রাজ্যগুলিতে এরূপ যানবাহনের সংখ্যা তুলনামূলক ভাবে বেশি এবং অনুন্নত রাজ্যগুলিতে তা যথেষ্ট সংখ্যায় কম। তেমনি, বিভিন্ন তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে যে, উন্নত রাজ্যগুলিতে 1,000 জন প্রতি টেলিফোন সংযোগের সংখ্যা অনুন্নত রাজ্যগুলির তুলনায় বেশি। আবার, কোনো রাজ্য বা দেশের উন্নয়নের স্তর পরিমাপ করার জন্য সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিকাঠামো সূচক (Social and Economic Infrastructure Index) তৈরি করা হয়। এই সূচকের মান যত বেশি, সেই রাজ্য বা দেশটির উন্নয়নের স্তর তত উচ্চ। Centre for Monitoring Indian Economy বা CMIE এই সূচক তৈরি করেছে। সূচকটি তৈরির ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলি বিবেচিত হয় সেগুলি ও তাদের গুরুত্ব (বন্ধনীর মধ্যে) হল নিম্নরূপ :

(a) পরিবহনের সুবিধা (26 শতাংশ)

(b) শক্তির ব্যবহার (24 শতাংশ)

(c) জলসেচের সুবিধা (20 শতাংশ)

(d) ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার সুবিধা (12 শতাংশ)

(e) যোগাযোগ (6 শতাংশ)

(f) শিক্ষা সম্পর্কিত সুযোগ-সুবিধা (6 শতাংশ)

(g) স্বাস্থ্য পরিষেবার সুবিধা (6 শতাংশ)

সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে এই পরিকাঠামো উন্নয়ন সূচকের মান হল 100। 1991 সালে এগিয়ে থাকা রাজ্যগুলির মধ্যে পাঞ্জাবের ক্ষেত্রে এই সূচকের মান ছিল 187.6, কেরালার 178.7, তামিলনাড়ুর 149.1 ইত্যাদি। অন্যদিকে, পিছিয়ে পড়া রাজ্যগুলির মধ্যে উত্তর প্রদেশের ক্ষেত্রে পরিকাঠামো উন্নয়ন সূচকের ওই বছর (1991) মান ছিল 101.2, বিহারের 81.3, মধ্যপ্রদেশের 76.8 ইত্যাদি। এগিয়ে থাকা রাজ্যগুলির ক্ষেত্রে এই সূচকের মান ছিল103.3 (অন্ধ্রপ্রদেশ) বা তার বেশি। আর পিছিয়ে পড়া রাজ্যগুলির মধ্যে এই সূচকের মান ছিল 101.2 (উত্তর প্রদেশ) বা তার কম। সুতরাং, পরিকাঠামো উন্নয়ন সূচক (Infrastructure Development Index) বা IDI-এর মানের পার্থক্য থেকেই বোঝা যায় যে, ভারতে রাজ্যগুলির মধ্যে উন্নয়ন স্তরে বৈষম্য রয়েছে।

৫.৪ ভারতের আঞ্চলিক বৈষ্যমের কারণ এবং প্রকারভেদ

ভারতের আঞ্চলিক বৈষম্য মূলত ঐতিহাসিক, ভৌগলিক এবং আর্থসামাজিক কয়েকটি বিষয়ের সমন্বয়। এর ফলে অর্থনৈতিক বিকাশ, পরিকাঠামো এবং বিভিন্ন সেবামূলক বিষয়ের মধ্যে তারতম্য প্রকট হয়ে ওঠে। সব শ্রেণীর মানুষজন এই বিষয়গুলি থেকে সমভাবে সুবিধা পেতে ব্যর্থ হয়।

ভারতে উন্নয়নের ক্ষেত্রে আন্তঃরাজ্য বৈষম্য বা আঞ্চলিক বৈষম্যের পিছনে নানা কারণ কাজ করেছে। সেই কারণগুলিকে প্রাকৃতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, শাসনতান্ত্রিক ইত্যাদি নানা শ্রেণিতে ভাগ করা যায়।

প্রাকৃতিক কারণগুলির মধ্যে প্রধান হল ভূমির উর্বরতা, আবহাওয়ার অবস্থা, ভূমির গড়ন, জলসেচের সুযোগ-সুবিধা প্রভৃতি। যেমন, জমি যদি ঊষর বা পাথুরে হয় তাহলে সেখানে কৃষিকার্য ভালো হবে না। ফলে লোকের মাথাপিছু আয় কম হবে। আবার, পার্বত্য এলাকায় এবং মরুভূমি এলাকায় চাষবাস ভালোভাবে করা যায় না। রাজস্থানের অন্যান্য রাজ্য থেকে আপেক্ষিক ভাবে পিছিয়ে থাকার একটা বড় কারণ হল এর মরুভূমি এবং শুস্ক আবহাওয়া। আবার, পার্বত্য এলাকায় রাস্তাঘাট ও যোগাযোগের অভাব। ফলে সেখানে শিল্প বা কলকারখানা গড়ে তোলা বেশ দুরূহ কাজ। নাগাল্যান্ড, মিজোরাম, মেঘালয় প্রভৃতি পার্বত্য রাজ্যের অনগ্রসরতাকে রাস্তাঘাট ইত্যাদি পরিকাঠামোর অভাবের দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায়।

সামাজিক বিষয়গুলির মধ্যে প্রধান হল শিক্ষা এবং সামাজিক সচেতনতা। যে সমস্ত রাজ্য ঐতিহাসিকভাবে ব্রিটিশদের সংস্পর্শে আগে এসেছে, তারা শিক্ষাদীক্ষায় এগিয়ে গেছে। ফলে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি অনেক আধুনিক। সেই সমস্ত রাজ্যের অধিবাসীরা চিন্তাভাবনায় অনেক প্রগতিশীল। ফলে তারা আধুনিক উৎপাদন পদ্ধতি, আধুনিক উপকরণ প্রভৃতি ব্যবহার করেছে। ফলে সেই সমস্ত রাজ্য অন্য রাজ্যগুলির তুলনায় এগিয়ে গেছে। ঐতিহাসিক ভাবে দেখতে গেলে, ব্রিটিশ শাসকেরা উন্নয়নের জন্য সেই রাজ্য বা অঞ্চলগুলিকে বেছে নিয়েছিল যেগুলিতে যোগাযোগের সুবিধা বেশি, যেগুলির কাছাকাছি নদী বন্দর বা সামুদ্রিক বন্দরের সুবিধা পাওয়া যাবে। এদিক থেকে তাদের প্রাথমিক পছন্দের জায়গা ছিল মহারাষ্ট্র এবং পশ্চিমবঙ্গ। বর্তমানের তিনটি মেট্রোপলিটান নগর, মুম্বাই, কলকাতা এবং চেন্নাই, ব্রিটিশ শিল্পপতিদের আনুকূল্য লাভ করেছিল। স্বভাবতই ওই রাজ্যগুলি অন্যান্য রাজ্যের চেয়ে এগিয়ে যায়। ব্রিটিশ শাসনকালে গুজরাটও কিছু মূলধন আকৃষ্ট করতে সমর্থ হয়েছিল। আজকের গুজরাট ও মহারাষ্ট্রের জয়যাত্রার পিছনে সেই প্রাথমিক বাড়তি সুবিধা নিশ্চয়ই অনেকটা কাজ করে।

উন্নয়নের আঞ্চলিক বৈষম্যের পিছনে প্রধান অর্থনৈতিক কারণ হল : উন্নত অঞ্চলই আরো মূলধন ও প্রযুক্তি আকৃষ্ট করতে পারে। উন্নত অঞ্চলে পরিকাঠামো উন্নত, সেখানে দক্ষ ও কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন শ্রমিক পাওয়া যায়, সেখানে ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা উন্নত, সেখানে কৃষিও তুলনায় উন্নত বলে শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ও খাদ্যদ্রব্য পাওয়া যায় ইত্যাদি। এ সমস্ত কারণে নতুন শিল্পগুলি স্বাভাবিক প্রবণতা বশে উন্নত অঞ্চলেই কেন্দ্রীভূত হচ্ছে এবং উন্নয়নের আঞ্চলিক বৈষম্য বেড়ে চলেছে। পিছিয়ে পড়া

রাজ্যগুলি বেসরকারি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে পারে না কারণ তাদের পরিকাঠামো উন্নত নয় এবং শিল্পের আবহাওয়া অনুকূল নয়। সম্পদের অভাবে পিছিয়ে পড়া রাজ্যগুলি তাদের পরিকাঠামোর উন্নতি ঘটাতে পারে না। আর সম্পদের অভাবের পিছনে কারণ হল তাদের স্বল্প উন্নয়ন। এভাবে স্বল্পোন্নত রাজ্যগুলি এক দুষ্টচক্রে আবর্তিত হচ্ছে। N. J. Kurian যথার্থই বলেছেন যে পিছিয়ে পড়া রাজ্যগুলি "are unable to improve the investment climate by improving the existing poor infrastructural facilities due to lack of resources. Their lack of resources is linked to their poor development. Thus, they are truly in a vicions circle." (N. J. Kurian; Widening Regional Disparities, Economic and Political Weekly, Feb. 12-18, 2000)।

সরকারের আর্থিক নীতিও রাজ্যগুলির মধ্যে বৈষম্য বৃদ্ধি করেছে। 1991 সালের পর ভারত সরকার উদারীকরণ ও বেসরকারিকরণের নীতি গ্রহণ করেছে। ফলে দেশের মধ্যে বাজারি শক্তির জোর বেড়েছে। এর সাথে যোগ হয়েছে বিশ্বায়নের হাওয়া। এখন সব কিছুই প্রতিযোগিতার শক্তির দ্বারা নির্ধারিত হচ্ছে। নতুন এই ব্যবস্থায় সরকারি হস্তক্ষেপের ব্যবস্থা প্রায় তুলে দেওয়া হয়েছে। পরিকল্পনা কমিশন ভেঙে দেওয়া হয়েছে। একচেটিয়া কমিশনের বদলে এসেছে ভারতের প্রতিযোগিতা কমিশন। নতুন এই ব্যবস্থায় দুর্বল রাজ্যকে হটিয়ে সবল রাজ্য নানা সুবিধা করায়ত্ত করছে। ফলে আঞ্চলিক বৈষম্য বাড়ছে। বর্তমান প্রবণতা বজায় থাকলে ভবিষ্যতে ভারতের উন্নয়নের ক্ষেত্রে এই আঞ্চলিক বৈষম্য বা আন্তঃরাজ্য বৈষম্য আরো বাড়বে বলেই মনে হয়।

কিছু কিছু অঞ্চলে সবুজ বিপ্লবের প্রভাব এবং প্রসার অতি নগণ্য। ভারতবর্ষে সবুজবিপ্লব অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নয়ন এনে দিয়েছে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। কিন্তু এর সুবিধা দুর্ভাগ্যক্রমে কিছু কিছু অঞ্চলে এতই নগণ্য যা বৈষম্য সৃষ্টির একটি অন্যতম কারণ হিসাবে দেখা দেয়, ভারত সরকার যেখানে উন্নত সেচ প্রকল্প আছে কেবলমাত্র সেই জায়গাগুলিকেই এই নয়া কৃষি উন্নয়ন এর উপর জোর দেয়। তার ফলে, অন্যান্য অঞ্চলগুলি সম্পূর্ণ অন্ধকারেই থেকে যায় এ বিষয়ে। যে অঞ্চলগুলি সব থেকে বেশী সুবিধা ভোগ করেছে সেগুলি হলো পাঞ্জাব, হরিয়ানা এবং উত্তরপ্রদেশের পশ্চিমে কিছু সমতল জেলা। এর ফলে ধনী কৃষকেরা আরও ধনী হয় এবং শুষ্ক জমির কৃষকেরা এবং অকৃষি জনসাধারণ এরা আরও গরীব হয়ে যায়। যার ফলে আঞ্চলিক বৈষম্য আরও বৃদ্ধি পায়।

এছাড়া রাজনৈতিক অস্থিরতা ও একটি বড় কারণ বলে মনে করা হয়। যে সমস্ত পশ্চাৎমুখী (Backward) রাজ্যগুলি আছে তাদেরও শিল্পোন্নয়নের পর্যাপ্ত পরিচালনা ব্যবস্থা, উদ্বুদ্ধকরণের জন্য মানসিক চেতনার অভাব এগুলিও আঞ্চলিক বৈষম্যকে আরও বৃদ্ধি করেছে। কেবলমাত্র পাঞ্জাব, হরিয়ানা, মহারাষ্ট্র, গুজরাট, তামিলনাড়ু, উত্তরপ্রদেশ এই রাজ্যগুলি বেশী সুবিধা পেয়েছে। এমনকি পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা সেগুলি হলো সম্পদ সমৃদ্ধ রাজ্য তারাও কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার সুচিন্তিত পর্যালোচনা ও অর্থ বিনিয়োগ এর অভাবে যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

বৈষম্যের প্রকারভেদ

1. একটি রাজ্য এবং অপর একটি রাজ্যের মধ্যে বৈষম্য

2. একটি রাজ্যের মধ্যে বৈষম্য

3. গ্রাম ও শহরের মধ্যে বৈষম্য

1. একটি রাজ্য এবং অপর একটি রাজ্যের মধ্যে বৈষম্য : অর্থনৈতিক উন্নয়ন, শিল্পের বিকাশ, জীবনযাত্রার মান, পরিকাঠামোগত অবস্থান, ভোগের ধরণ এই বিষয়গুলিতে রাজ্যের সঙ্গে রাজ্যের অনেক ফারাক দেখা যায়। এই ধরনের বৈষম্য একটি রাজ্যের পশ্চাৎমুখী হওয়ার একটি অন্যতম কারণ।

2. একটি রাজ্যের মধ্যে বৈষম্য : একটি রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে অনেক বৈষম্য দেখা যায়। এই ধরণের আঞ্চলিক বৈষম্য দেখা দেয় মূলত সমষ্টিগত (Macro) কিছু বিষয়ের জন্য যেমন সম্পদ বন্টন, প্রশাসনের গুণমান (Quality of Governance) কৃষি কাঠামো, আয়, ভোগের ধরণ এবং দারিদ্রের অবস্থা। একটি রাজ্যের মধ্যে যে কয়টি মেট্রোপোলিটান শহর থাকে সেগুলি যথেষ্ট উন্নত এবং অধিক সরকারী সাহায্য পায়। তুলনামূলকভাবে বাকী অঞ্চলগুলি অনেকটাই পিছিয়ে থাকে। যার ফলে বিভিন্ন জেলা থেকে লোকজন কাজের জন্য এই বড় বড় শহরগুলিতে ভিড় করে। এর ফলে সমতা আরও বিঘ্নিত হয়।

3. গ্রাম ও শহরের মধ্যে বৈষম্য (Rural-Urban Disparity) : এই বৈষম্য ভারতে সবসময়ই অত্যন্ত প্রকট। গ্রামে বিভিন্ন অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুবিধা অত্যন্ত অল্প শহরের তুলনায়। রাস্তাঘাট, বিদ্যুৎ, জল সরবরাহ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল ইত্যাদি শহরে যেভাবে দেখা যায় গ্রামে সে ভাবে দেখা যায় না। দারিদ্র, অশিক্ষা এবং বেকারত্ব এই তিনটি বিষয়ে গ্রাম শহরের থেকে অনেক পিছিয়ে থাকে।

৫.৫ আঞ্চলিক বৈষম্যের প্রতিকার

উন্নয়নের ক্ষেত্রে ভারতে আঞ্চলিক বৈষম্য কমানোর জন্য ভারতের পরিকল্পনা কমিশন মূলত তিনটি পদ্ধতি গ্রহণ করেছিল। সেগুলি হল :

(i) কেন্দ্র থেকে রাজ্যে আর্থিক সম্পদ বণ্টনের সময় কোনো রাজ্য বা অঞ্চলের আর্থিক অনগ্রসরতাকে বিবেচনার মধ্যে রাখা,

(ii) অনুন্নত এলাকার উন্নয়নের জন্য বিশেষ অঞ্চল উন্নয়ন কর্মসূচি (Special area development programmes) গ্রহণ, এবং

(iii) অনুন্নত অঞ্চলে বেসরকারি বিনিয়োগকে উৎসাহ প্রদান।

আমরা এই তিনটি পদ্ধতি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করব। **প্রথমত**, কেন্দ্র থেকে রাজ্যে অর্থ বণ্টনের সময় বিভিন্ন অর্থ কমিশন পিছিয়ে পড়া রাজ্যকে তার অনুন্নত অঞ্চলের উন্নতির জন্য বাড়তি সাহায্য দিয়েছে। কিন্তু সমস্যা হল, অনেক পিছিয়ে পড়া রাজ্যই সেই অর্থ নিয়ে উন্নত অঞ্চলেই ব্যয় করেছে অথবা সহজতর কর্মসূচিতে ব্যয় করেছে। এতে অর্থ সাহায্যের উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যায়।

দ্বিতীয়ত, বিশেষ অঞ্চল উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করে তা রূপায়ণের চেষ্টা করা হয়েছে। এ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সহায়তাও পাওয়া গেছে। এরূপ কিছু বিশেষ কর্মসূচি হল : পার্বত্য এলাকার উন্নয়ন, পার্বত্য উপজাতি বাস করে এরূপ এলাকার উন্নয়ন, খরাপ্রবণ এলাকার উন্নয়ন প্রভৃতি। এছাড়া, ক্ষুদ্র চাষি ও কৃষিমজুরদের সাহায্যের জন্য যে সমস্ত গ্রামীণ উন্নয়ন কর্মসূচি গৃহীত হয়েছে, সেগুলির একটা বড় অংশই পিছিয়ে পড়া অঞ্চলে রূপায়িত করা হয়েছে। তবে এগুলিতে বরাদ্দ অর্থের পরিমাণ প্রয়োজনের তুলনায় কম।

তৃতীয়ত, পিছিয়ে পড়া অঞ্চলে বেসরকারি বিনিয়োগকে উৎসাহ দেবার জন্য কিছু ব্যবস্থা বিভিন্ন সময়ে গ্রহণ করা হয়েছে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ব্যবস্থাগুলি হল : (i) পিছিয়ে পড়া অঞ্চলে বিনিয়োগ করলে আয় করে (অর্থাৎ কোম্পানি মুনাফা করে) ছাড়, (ii) কেন্দ্রীয় বিনিয়োগ ভরতুকি প্রকল্প, (iii) পার্বত্য ও দুর্গম এলাকায় কাঁচামাল ও উৎপন্ন দ্রব্য পরিবহন ব্যয়ে 50 শতাংশ ভরতুকি, এবং (iv) শিল্প-শূন্য জেলাগুলিতে (no-industry districts) পরিকাঠামোর উন্নতির জন্য কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক রাজ্য সরকারগুলিকে অর্থ সাহায্য। এই শেষের কর্মসূচিতে পরিকাঠামো উন্নতির জন্য ব্যয়ের এক-তৃতীয়াংশ কেন্দ্রীয় সরকার বহন করে। তবে এক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সীমা হল ২ কোটি। এই কর্মসূচির দ্বারা কেন্দ্রীয় সরকার পরিকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে অনেক উন্নয়ন কেন্দ্র (growth centre) গড়ে তুলতে রাজ্যগুলিকে সাহায্য করেছে।

এছাড়া, রাজ্য সরকারগুলিও অনুন্নত অঞ্চলে বেসরকারি মূলধন আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে কিছু সুযোগ-সুবিধা দিচ্ছে। বেসরকারি বিনিয়োগকে উৎসাহ দিতে রাজ্যগুলি যে সমস্ত পদক্ষেপ নিয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল : বিদ্যুৎ ও জলের সুবিধা-সহ উন্নত শিল্পতালুক প্রদান, কয়েক বছরের জন্য জল কর ছাড়, বকেয়া বিক্রয় কর মেটাতে বিনা সুদে ঋণ, পণ্য প্রবেশ করে (Octroi) ছাড়, কয়েক বছরের জন্য সম্পত্তি করে ছাড়, পিছিয়ে পড়া অঞ্চলে অবস্থিত শিল্প ইউনিট থেকে সরকারি ক্রয়ে অগ্রাধিকার, পিছিয়ে পড়া অঞ্চলে শিল্প আবাসন নির্মাণে ভরতুকি প্রভৃতি।

কিন্তু এসবের ফলেও ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নে আঞ্চলিক বৈষম্য কমেনি, বরং তা যেন বেড়েই চলেছে। আসলে পুঁজিপতিরা উন্নত অঞ্চলেই বিনিয়োগ করতে চাইবে কারণ সেখানে পরিকাঠামোগত সমস্ত সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যায়। ফলে উন্নত অঞ্চলে কলকারখানা গড়ে তুললে উৎপাদন ব্যয় কম

পড়ে এবং বাজারে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে দ্রব্য বিক্রির সুবিধা হয়। অনুন্নত অঞ্চলে শিল্প-কারখানা গড়ে তোলার ব্যয় ও ঝক্কি অনেক বেশি। তাই দেশের আলোকিত অঞ্চলগুলিই আরো বিনিয়োগ আকৃষ্ট করে এবং আরো আলোকিত হয়। আর স্বল্পোন্নত ও অনুন্নত অঞ্চলগুলি অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়েই থাকে। এই ধরনের অর্থনীতিকে বলা হয় দ্বৈত অর্থনীতি (Dual economy) যেখানে উন্নত এবং অনুন্নত অঞ্চল পাশাপাশি সহাবস্থান করে (co-exist) এবং তাদের মধ্যে কোনো ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া থাকে না। স্বল্পোন্নত অর্থনীতির অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হল যে, এটি একটি দ্বৈত অর্থনীতি। ভারতীয় অর্থনীতিও একটি স্বল্পোন্নত অর্থনীতি। সুতরাং এই অর্থনীতিতেও তাই আমরা দ্বৈত অর্থব্যবস্থা দেখতে পাই।

এই দ্বৈত অর্থব্যবস্থা অর্থাৎ উন্নয়নে আঞ্চলিক বৈষম্য কমাতে গেলে সরকারকে কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। **প্রথমত**, কৃষির উন্নয়নের জন্য উপযুক্ত গবেষণা চালাতে হবে। শুষ্ক বা মরুভূমি অঞ্চলের জন্য উপযুক্ত বীজ আবিষ্কার, উঁচু পার্বত্য এলাকায় চাযের উপযুক্ত শস্য ও সবজির প্রবর্তন করতে হবে। **দ্বিতীয়ত**, পার্বত্য দুর্গম এলাকায় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের বিকাশ ঘটাতে হবে। স্থানীয় কাঁচামাল ও উপকরণের উপযুক্ত ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। এরজন্যও প্রয়োজন উপযুক্ত গবেষণা। আর এ সমস্ত কর্মসূচি রূপায়ণের জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক সাহায্য দিতে SIDBI (Small Industries Development Bank of India)-কে নিযুক্ত করতে হবে। **তৃতীয়ত**, অনুন্নত অঞ্চলে ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার প্রসার ঘটাতে হবে এবং স্থানীয় মহাজনদের দাপট ও শোষণ দূর করতে হবে। আঞ্চলিক গ্রামীণ ব্যাঙ্কগুলিকে (Regional Rural Banks বা RRBs) পিছিয়ে পড়া অঞ্চলে শাখা খুলতে হবে। ছোট কারিগরদের নিয়ে NABARD-এর (National Bank for Agricuture and Rural Development) সাহায্যে স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী (Self-help Groups বা SHGs) গড়ে তুলতে হবে। NABARD এই গোষ্ঠীগুলির সঙ্গে ব্যাঙ্কের যোগাযোগ ঘটিয়ে দেবে ক্ষুদ্র ঋণের (micro loans) জন্য। তাহলে পিছিয়ে পড়া অঞ্চলে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বাড়বে এবং লোকের জীবনযাত্রার মান উন্নত হবে।

1991 সালে ভারত সরকার যে আর্থিক নীতি গ্রহণ করেছে তার মূল কথা হল উদারীকরণ, বেসরকারিকরণ এবং বিশ্বায়ন বা ভুবনীকরণ (Liberalisation, Privatisaton and Globalisation বা সংক্ষেপে LPG)। এই নীতির এক কথায় বক্তব্য হল বাজারি শক্তির দ্বারা বা প্রতিযোগিতার দ্বারা সমস্ত আর্থিক সমস্যার সমাধান করা। অ্যাডাম স্মিথ কথিত অদৃশ্য হাত (invisible hand) এখানে সমস্ত অর্থনৈতিক বিষয় নিয়ন্ত্রিত করবে। এরূপ ব্যবস্থায় দেশের যাবতীয় অর্থনৈতিক কাজকর্মে সরকারি হস্তক্ষেপ ক্রমাগত কমছে। এক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার মাধ্যমেই সবকিছু নির্ধারিত হবে। আর অবাধ প্রতিযোগিতা হলে দেশের উন্নত অঞ্চল সর্বদাই অনুন্নত অঞ্চলকে সরিয়ে দিয়ে নিজেকে আরও বলিষ্ঠ করবে। সুতরাং, সরকারের এই নতুন আর্থিক নীতির ফলে ভারতে আঞ্চলিক বৈষম্য আগামী দিনগুলিতে আরো বাড়বে বলে মনে হয়।

৫.৬ অর্থনৈতিক সংস্কারের পূর্বে এবং পরবর্তী সময়ে আঞ্চলিক বৈষম্য

বিশ্বায়ণের পূর্ববর্ত্তী অবস্থা (Pre-Globalisation Period)

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (1951–56)

এই পরিকল্পনায় আঞ্চলিক বৈষম্যের তেমন কোনো উল্লেখ ছিল না। যার ফলে এই ধরনের বৈষম্যের দূরীকরণ নিয়েও কোনো আলোচনা নেই। অর্থনৈতিক মূল কাঠামো কিভাবে আরও উন্নত করা যায় সেদিকেই জোর দেওয়া হয়েছিল। যদিও যে কোনো বিশদ উন্নয়নের নীতি নির্ধারণে অপেক্ষাকৃত অনুন্নত এবং অবহেলিত অঞ্চলের প্রতি অধিক আলোকপাত এবং বিনিয়োগ করা অতি বাঞ্ছনীয়।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (1956–61)

এই পরিকল্পনায় প্রথম আঞ্চলিক বৈষম্য হ্রাস করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করা হয়। শিল্পোন্নয়নের বিকেন্দ্রীকরণের উপর জোর দেওয়া হয়। সরকারী ও বেসরকারী শিল্প স্থাপনের উপর জোর দেওয়া হয় এবং আঞ্চলিক বৈষম্যের প্রতিকার এর কথা মাথায় রেখে, 1956 সালের শিল্পনীতিতে এ ব্যাপারে বিশেষ জোর দেওয়া হয়। সেই অনুযায়ী দুর্গাপুর স্টিল কারখানা, ভিলাই স্টিল কারখানা, বোকারো স্টিল কারখানা, রাউরকেল্লা স্টিল কারখানা, দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন ইত্যাদি স্থাপিত হয়।

তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা—এই পরিকল্পনাগুলিতে (1961–66) (1969–74) (1974–79)

আঞ্চলিক ও জায়গাভিত্তিক পরিকল্পনা করা হয়। Multi Dimensional Area Development Approach এর দ্বারা।

পঞ্চম পরিকল্পনায় অনুন্নত অঞ্চলকে দুইটি ভাগে ভাগ করা হয়। (ক) খরা প্রবণ আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চল, পাহাড়ী অঞ্চল (খ) অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া অঞ্চল যেখানে পরিকাঠামোগত সুবিধা কম, অনগ্রসর কৃষি উন্নয়ন ইত্যাদি।

সেই অনুযায়ী এই পরিকল্পনায় Drought Prone Area Programme (DPAP), Tribal Area Development Programme (TADP) ইত্যাদি চালু করা হয়।

ষষ্ঠ ও সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (1980–85) (1985–90)

Integrated Rural Developement Programme (IRDP) চালু করা হয়। অনুন্নত অঞ্চলে শিল্পোন্নয়নের জন্য এবং অনুন্নত অঞ্চলকে নির্বাচন করার জন্য একটি 'High level National Committee for Development of Backward Areas গঠন করা হয়। এইগুলি সব ষষ্ঠ পরিকল্পনায় করা হয়। সপ্তম পরিকল্পনায় কর্মনিয়োগ সৃষ্টি এবং দারিদ্র দূরীকরণ নানা প্রকার পদ্ধতি এবং পরিকল্পনা

নেওয়া হয়। তবে এই পরিকল্পনার পরেই নয়া অর্থনীতি (New Economic Policy) আসার জন্য এই পরিকল্পনার সবকিছু বাস্তবায়িত করা সম্ভব হয়নি।

বিশ্বায়নের পরবর্ত্তী সময়ে (Past Globalisation)

অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (1992–97) : এই পরিকল্পনায় বাজার ব্যবস্থাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। পরিকল্পনার পদ্ধতি এমন ভাবে হওয়া দরকার যে আঞ্চলিক বৈষম্য দূরীকরণের জন্য সম্পদের গতি এবং অধিক চালনা হওয়া দরকার। এই সময়ে অনেক রাজ্য বেসরকারী বিনিয়োগ আনতে সমর্থ হয়েছে।

নবম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (1997–02) : বেসরকারী বিনিয়োগ বৃদ্ধি পেতে লাগলে তবে অনুন্নত অঞ্চলে যাতে এই বিনিয়োগ হয় তা লক্ষ রাখা হলো এই পরিকল্পনায়।

দশম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (2002–2007)

একাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (2007–2012)

দ্বাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (2012–2017)

এই পরিকল্পনাগুলিতে Inclusive Growth model চালু করা হয়। আঞ্চলিক বৈষম্য দূরীকরণ শুধুমাত্র অর্থনৈতিক লক্ষমাত্রা নিয়ে করা হয় নি, তা সুপ্রশাসন, আইনশৃঙ্খলা সবকিছুর জন্যই করা হয়েছিল। পরিকাঠামোগত উন্নয়নের দিকেও এই পরিকল্পনাগুলিতে জোর দেওয়া হয়।

৫.৭ সারাংশ

আঞ্চলিক বৈষম্য হলো সম্পদের অসমবন্টন। বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে সুযোগ সুবিধার তারতম্য। পরিকাঠামোগত সুবিধার পার্থক্য ইত্যাদি। এর ফলে আয়ের মধ্যে তারতম্য দেখা দেওয়ায় কর্মনিয়োগে তার প্রভাব পড়ে যার ফলে অপেক্ষাকৃত অনুন্নত অঞ্চল থেকে উন্নত অঞ্চলে মানুষেরা উপস্থিত হয় কাজের খোঁজে। শিক্ষাগত সুবিধা কম থাকায় অনুন্নত অঞ্চল ও উন্নত অঞ্চলের মধ্যে শিক্ষার হারের বেশ পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে যদি মাথা পিছু নিট অন্তর্দেশীয় স্থূল উৎপাদন (2004–2005) দেখা যায় তাহলে দেখা যায় মহারাষ্ট্র, গুজরাট, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, তামিলনাড়ু, কেরালা, পশ্চিমবঙ্গ অনেকটা এগিয়ে আছে রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, ওড়িশা, অসমের তুলনায়। এ ব্যাপারে কয়েকটি সূচক তৈরী করা হয়েছে যেগুলি হলো পরিবহণের সুবিধা, শক্তির ব্যবহার, জলসেচের সুবিধা, যোগাযোগ অবস্থা, শিক্ষা সম্পর্কিত সুবিধা ইত্যাদি।

স্বাধীনতার পর ভারতে কিছুটা অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটলেও দেশের সব অঞ্চলে সমানভাবে উন্নয়ন

ঘটেনি। ভারতের উন্নয়নে আঞ্চলিক বৈষম্য বিদ্যমান। অপ্রধান রাজ্যগুলিকে বাদ দিয়ে আমরা যদি প্রধান রাজ্যগুলি বিবেচনা করি, তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, এই রাজ্যগুলির মাথাপিছু আয়ে বিপুল পার্থক্য রয়েছে। মাথাপিছু আয়ের বিচারে উন্নত বা এগিয়ে থাকা রাজ্যগুলি হল মহারাষ্ট্র, গুজরাট, হরিয়ানা, পাঞ্জাব, তামিলনাড়ু, কেরালা, কর্ণাটক, পশ্চিমবঙ্গ ও অন্ধ্রপ্রদেশ। এদের মাথাপিছু আয় সর্বভারতীয় মাথাপিছু আয়ের তুলনায় বেশি। অন্যদিকে, পিছিয়ে থাকা রাজ্যগুলি হল রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, ওড়িশা, অসম, উত্তর প্রদেশ এবং বিহার। এদের মাথাপিছু আয় সর্বভারতীয় গড় মাথাপিছু আয়ের চেয়ে কম। পার্বত্য এলাকার রাজ্যগুলিকে এই তালিকায় বিবেচনা করলে উন্নয়নে বৈষম্য আরো প্রকট হবে। ভারতের রাজ্যগুলির মধ্যে উন্নয়ন স্তরে এই বৈষম্য আরো কয়েকটি উন্নয়ন সূচকের মধ্যে প্রতিফলিত। যেমন, উন্নত বা এগিয়ে থাকা রাজ্যগুলিতে মাথাপিছু শক্তির ব্যবহার বেশি, প্রতি 1,000 জনে যানবাহনের সংখ্যা বেশি, ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা এবং শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সুযোগ-সুবিধা বেশি। পিছিয়ে পড়া রাজ্যগুলিতে এই সূচকগুলির মান কম।

ভারতে আঞ্চলিক বৈষম্যের পিছনে প্রধান কারণগুলি হল : ভূমির উর্বরতা ও কর্ষণযোগ্যতার পার্থক্য, জলসেচের সুবিধার পার্থক্য, রাস্তাঘাট ও যোগাযোগের সুবিধার পার্থক্য, শিক্ষার হারে পার্থক্য, ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা ও স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর উন্নয়নে পার্থক্য প্রভৃতি। এই আন্তঃরাজ্য বৈষম্য কমাতে ভারত সরকার মূলত তিনটি পদ্ধতি বিভিন্ন সময় ব্যবহার করেছে। সেগুলি হল : (i) কেন্দ্র থেকে রাজ্যে আর্থিক সম্পদ বণ্টনের ক্ষেত্রে অনগ্রসর রাজ্যগুলিকে কিছু বাড়তি সম্পদ দেওয়া, (ii) অনুন্নত এলাকার উন্নয়নের জন্য বিশেষ অঞ্চল উন্নয়ন কর্মসূচি এবং (iii) অনুন্নত অঞ্চলে বেসরকারি বিনিয়োগকে উৎসাহ প্রদান। রাজ্য সরকারগুলিও অনুন্নত অঞ্চলে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে নানারকম কর ছাড় দিয়ে থাকে। পাশাপাশি, সরকারকে শুষ্ক ও পার্বত্য এলাকার জন্য উপযুক্ত বীজ ও কৃষিপদ্ধতি আবিষ্কারে জোর দিতে হবে। এসব এলাকায় ব্যাঙ্ক ব্যবস্থাসহ অন্যান্য পরিকাঠামোর উন্নতি ঘটাতে হবে এবং ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের প্রসার ঘটাতে হবে। তবেই ভারতে উন্নয়নের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক বৈষম্য কমবে।

৫.৮ অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত উত্তরের প্রশ্নাবলী

১. আঞ্চলিক বৈষম্য বলিতে কি বোঝায়?

২. ভারতের আঞ্চলিক বৈষম্যের যে কোনো দুইটি কারণ লেখ।

৩. বৈষম্যের প্রকারভেদ কিরূপ?

৪. আঞ্চলিক বৈষম্যের প্রতিকার যে কোনো দুইটি ব্যবস্থা কি?

৫. উন্নত রাজ্যসমূহ যে কোনো তিনটি নাম করো।

৬. অনুন্নত রাজ্যসমূহ যে কোনো তিনটি নাম লেখ।

৭. সবুজ বিপ্লবের প্রভাব কোন কোন রাজ্যে সুফল দিয়াছে?

৮. ভারতে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা কোন বছরে শুরু হয়?

৯. সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিকাঠামো সূচক কি?

১০ দ্বৈত অর্থনীতি কাহাকে বলে?

মাঝারি দৈর্ঘ্যের উত্তরের প্রশ্নাবলী

১. আঞ্চলিক বৈষম্য কি ব্যাখ্যা কর।

২. ভারতের উন্নয়নে আঞ্চলিক বৈষম্যের কয়েকটি কারণ উল্লেখ কর।

৩. ভারতের উন্নয়নের আঞ্চলিক বৈষম্য কমাতে সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে?

৪. ভারতের উন্নয়নে আঞ্চলিক বৈষম্য কমাতে তোমার কয়েকটি সুপারিশ দাও।

৫. উন্নত এবং অনুন্নত রাজ্যসমূহের একটি তালিকা তৈরী কর।

৬. ভারতের আঞ্চলিক বৈষম্য রোধে সবুজ বিপ্লবের কি ভূমিকা আলোচনা কর।

৭. বৈষম্যের প্রকারভেদগুলি কি কি আলোচনা কর।

৮. বিশ্বায়নের পূর্বে আঞ্চলিক বৈষম্য কিরূপ ছিল তা ব্যাখ্যা কর।

৯. নয়া অর্থনীতি/শিল্পনীতি চালু হওয়ার পর আঞ্চলি বৈষম্য কিরূপ তা ব্যাখ্যা কর।

১০. প্রথম পাঁচটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে আঞ্চলিক বৈষম্য রোধে কি কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল?

দীর্ঘ উত্তরের প্রশ্নাবলী

১. স্বাধীনতার পরবর্ত্তীকালে ভারতে আঞ্চলিক বৈষম্য কি রূপ ছিল ব্যাখ্যা কর।

২. পরিকল্পনাকালে আঞ্চলিক বৈষম্য দুরীকরণের কি কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল ব্যাখ্যা কর।

৩. আঞ্চলিক বৈষম্যের কারণগুলি ব্যাখ্যা কর।

৪. আঞ্চলিক বৈষম্যের প্রতিকার এর জন্য কি কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল ব্যাখ্যা কর।

৫. ভারতীয় অর্থনীতির প্রেক্ষাপটে আঞ্চলিক বৈষম্য কত প্রকার হয় তা ব্যাখ্যা কর।

৬. নয়া শিল্পনীতি/অর্থনীতি (1991) চালু হওয়ার পর অর্থনৈতিক বৈষম্য চিত্রটি ব্যাখ্যা কর।

৭. ''বৈষম্য অর্থনৈতিক অনগ্রসরতার একটি মূল কারণ''—ব্যাখ্যা কর।

৮. ভারতে মাথাপিছু নিট অন্তর্দেশীয় উৎপাদনের প্রেক্ষিতে আঞ্চলিক বৈষম্য কোন রাজ্যে কিরূপ ছিল তা ব্যাখ্যা কর।

৯. কোন কোন বিষয়গুলির উপর আঞ্চলিক বৈষম্য দেখা দেয় তা ব্যাখ্যা কর।

১০. ভারতের উন্নয়নে আঞ্চলিক বৈষম্যের মাত্রা ও গভীরতা বর্ণনা কর।

সঠিক উত্তর নির্বাচনের প্রশ্নাবলী (Multiple Choice Questions, MCQ)

১. ভারতে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা শুরু হয়

(ক) 1947–48 (খ) 1950–51
(গ) 1955–56 (ঘ) কোনোটিই নয়

২. ভারতবর্ষের মধ্যে মহারাষ্ট্র ও গুজরাট

(ক) অনুন্নত রাজ্য (খ) স্বল্পোন্নত রাজ্য
(গ) উন্নত রাজ্য (ঘ) কোনোটিই নয়

৩. মাথাপিছু শক্তির ব্যবহার অনুন্নত রাজ্যের তুলনায় উন্নত রাজ্যে

(ক) কম (খ) বেশী
(গ) একই (ঘ) কোনোটিই নয়

৪. ভূমির উর্বরতা ও ভূমির গঠন আঞ্চলিক বৈষম্যের কি কারণ

(ক) সামাজিক (খ) প্রাকৃতিক
(গ) অর্থনৈতিক (ঘ) কোনোটিই নয়

৫. শিক্ষা ও সামাজিক সচেতনতা বৈষম্যের কোন কারণ

(ক) প্রাকৃতিক (খ) অর্থনৈতিক
(গ) সামাজিক (ঘ) কোনোটিই নয়

৬. পরিকাঠামোগত অবস্থা এবং মূলধন গঠন বৈষম্যের কোন কারণ

(ক) সামাজিক (খ) প্রাকৃতিক
(গ) অর্থনৈতিক (ঘ) কোনোটিই নয়

৭. বিশেষ উন্নয়ন অঞ্চল কর্মসূচী কোন অঞ্চলের উন্নয়নের জন্য

(ক) উন্নত (খ) অনুন্নত

(গ) কোনোটিই নয়

৮. উদারীকরণ, বেসরকারীকরণ ও বিশ্বায়ন কোন সালে শুরু হয়

(ক) 1982 (ক) 1991

(গ) 1997

৯. NABARD কোন ক্ষেত্রকে সহায়তা করে

(ক) শিল্পক্ষেত্র (খ) কৃষিক্ষেত্র

(গ) সেবাক্ষেত্র (ঘ) কোনোটিই নয়

১০. আঞ্চলিক বৈষম্য-র প্রতিকারে

(ক) উন্নত অঞ্চলে বেসরকারী বিনিয়োগে উৎসাহ দেওয়া

(খ) অনুন্নত অঞ্চলে বেসরকারী বিনিয়োগে উৎসাহ দেওয়া

(গ) কোনোটিই নয়

৫.৯ গ্রন্থপঞ্জি

১. সরখেল, জয়দেব ও সেখ সেলিম (2022) : *ভারতীয় অর্থনীতি*, বুক সিন্ডিকেট প্রাইভেট লিমিটেড।

২. Puri, V. K. and S. K. Misra (2020) : *Indian Economy*, Himalaya Publishing House.

৩. Datt, Gaurav & Ashwani Mahajan (2020) : *Indian Economy*, S. Chand and Company Limited.

৪. সেখ সেলিম (2011) : *ভারতের পরিকল্পনা ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন*, গ্রন্থমিত্র, কলকাতা।

একক – ৬ ❑ জনসংখ্যা এবং উন্নয়ন

গঠন

৬.১ উদ্দেশ্য

৬.২ প্রস্তাবনা

৬.৩ ভারতের জনসংখ্যা সমস্যার বিভিন্ন দিক

৬.৪ ভারতের জনসংখ্যার গতি প্রকৃতি

৬.৫ ভারতে জনসংখ্যা পরিবর্তনের স্তর

৬.৬ ভারতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলাফল

৬.৭ অর্থনৈতিক উন্নয়নে জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং জনসংখ্যার বৃদ্ধির জন্য অর্থনৈতিক উন্নয়নে তার ফলাফল

৬.৭.১ ভারতের পরিপ্রেক্ষিতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির উপর অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রভাব

৬.৭.২ ভারতের পরিপ্রেক্ষিতে অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপর জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রভাব **(Effect of population growth on Economic Development)**

৬.৮ ভারতে জনসংখ্যা সম্পর্কিত সরকারি নীতি

৬.৯ সারাংশ

৬.১০ অনুশীলনী

৬.১১ গ্রন্থপঞ্জি

৬.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে ছাত্রছাত্রীরা জানতে পারবে

- ভারতে জনসংখ্যা সমস্যা কিরূপ এবং তার বিভিন্ন দিক
- বিগত কয়েক দশকে ভারতে জনসংখ্যার গতি প্রকৃতি
- অর্থনৈতিক উন্নয়নে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলাফল এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির উপর অর্থনৈতিক উন্নয়নের ফলাফল জানতে পারবে
- ভারতে জনসংখ্যা পরিবর্তনের যে কয়েকটি স্তর আছে তাও জানতে পারবে

৬.২ প্রস্তাবনা

ভারতীয় অর্থনীতি একটি উন্নয়নশীল কিন্তু স্বল্পোন্নত অর্থনীতি। এই অর্থনীতিতে নানা আর্থ-সামাজিক সমস্যা বিদ্যমান। গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাগুলি হল বিপুল আয়তনের জনসংখ্যার সমস্যা, দারিদ্র্যের সমস্যা, আয় বৈষম্যের সমস্যা, বেকারির সমস্যা প্রভৃতি। বর্তমান এককে আমরা ভারতের জনসংখ্যা সমস্যার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করব। বাকি সমস্যাগুলি সম্পর্কে পরবর্তী এককগুলিতে আলোচনা করা হবে। ভারতের জনসংখ্যা সমস্যার কয়েকটি দিক হল জনসংখ্যার ভিত্তি, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার, জনসংখ্যার বয়সের গঠন, মোট জনসংখ্যায় স্ত্রী ও পুরুষের অনুপাত, জনসংখ্যার কত অংশ কর্মে নিযুক্ত, নিরক্ষরতার হার প্রভৃতি। আমরা এই বিষয়গুলির উপর আলোকপাত করার চেষ্টা করব। এছাড়া, যে-কোনো দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি কয়েকটি স্তরের মধ্যে দিয়ে অতিক্রম করে। ভারতের জনসংখ্যা বৃদ্ধির স্তর নিয়েও আমরা আলোচনা করব। দ্রুতহারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে নানা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপর জনসংখ্যা বৃদ্ধির এই প্রভাব নিয়েও বিশ্লেষণ করা হবে। এছাড়া, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য সরকার কী কী ব্যবস্থা অবলম্বন করেছে তাও বর্তমান এককে বিবেচনা করা হবে। ভারতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি আর একটা সমস্যা হল স্বাস্থ্য ও পুষ্টির সমস্যা। এই স্বাস্থ্য ও পুষ্টির সমস্যার বিভিন্ন দিক নিয়েও বর্তমান এককে আলোচনা করা হবে। স্বাস্থ্য ও পুষ্টির অবস্থার উন্নতিকল্পে ভারত সরকার কী কী ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে সেগুলির বর্ণনা ও মূল্যায়ন করা হবে। বর্তমানে কোনো দেশের কীরূপ অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটেছে এবং সেই দেশের জনসাধারণ কতটা স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে জীবন কাটাচ্ছে তা পরিমাপ করতে মানব উন্নয়ন সূচক ব্যবহার করা হয়। মানব উন্নয়ন বলতে কী বোঝায়, মানব উন্নয়ন নির্ধারণকারী প্রধান বিষয়গুলি কী কী, মানব উন্নয়ন সূচকের ধারণা ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করা হবে। সবশেষে, ভারতে মানব উন্নয়ন সূচকের মান কেমন এবং এই ক্ষেত্রে ভারতের অগ্রগতি ও অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের তুলনায় ভারতের অবস্থান কোথায়, তাও বিচার করা হবে। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য সরকার কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করেছে তাও বর্তমান এককে বিবেচনা করা হবে।

৬.৩ ভারতের জনসংখ্যা সমস্যার বিভিন্ন দিক

ভারতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি অন্যতম প্রধান সমস্যা। ভারতে মোট জনসংখ্যা 2022 সালের 1 জানুয়ারি 140 কোটি ছাড়িয়ে গেছে। মোট জনসংখ্যার বিচারে বিশ্বে ভারতের স্থান দ্বিতীয়। প্রথম স্থানে রয়েছে চিন। উপরোক্ত তারিখে চিনের জনসংখ্যা ছিল 144 কোটির কিছু বেশি। পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার প্রায় 18 শতাংশ ভারতে বাস করে, অথচ পৃথিবীর মোট স্থলভাগের 2.4 শতাংশ ভারতের।

ভারতের জনসংখ্যা সমস্যার কয়েকটি বিশেষ দিক উল্লেখ করা যেতে পারে। **প্রথমত**, ভারতের জনসংখ্যার ভিত্তি (base) খুব বড়। ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কম হলেও মোট জনসংখ্যা বৃদ্ধির পরিমাণ

যথেষ্ট বেশি। যেমন, 2022 সালের শুরুতে ভারতের মোট জনসংখ্যা ছিল 140 কোটির বেশি। এখন, বার্ষিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার 1 শতাংশ হলে প্রতি বছর জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাবে 1.40 কোটি বা 14 মিলিয়ন। এই বাড়তি জনসংখ্যা ভারতের সম্পদের উপর নানা ধরনের চাপ সৃষ্টি করবে।

দ্বিতীয়ত, কিছুদিন আগে পর্যন্ত ভারতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল যথেষ্ট বেশি। 1991-2001 সময়কালে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল বার্ষিক 2 শতাংশের মতো। 2020 সাল নাগাদ তা অবশ্য মোটামুটি বার্ষিক 1 শতাংশে নেমে এসেছে।

তৃতীয়ত, 2011 সালের জনগণনা অনুযায়ী, ভারতে 15 থেকে 60 বছর বয়স্ক কর্মক্ষম জনসংখ্যার অনুপাত 62 শতাংশ। আর 14 বছর পর্যন্ত শিশু ও বালক-বালিকা এবং 60 বছর বেশি বয়স্ক লোকের অনুপাত হল 38 শতাংশ। সুতরাং, ভারতীয় জনসংখ্যার 38 শতাংশ কোনো আয় উপার্জন করে না। এরা 62 শতাংশ উপার্জনক্ষম ব্যক্তির আয়ের উপর নির্ভরশীল।

চতুর্থত, ভারতে মোট জনসংখ্যায় স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষের সংখ্যা বেশি। 2011 সালের জনগণনা অনুযায়ী, ভারতে প্রতি হাজার পুরুষের তুলনায় নারীর সংখ্যা ছিল 940 (সারণি 6.1)। 1901 সালে এই অনুপাত ছিল 972। তারপর থেকে 1991 সাল পর্যন্ত তা কমে 927-এ দাঁড়ায়। 2001 এবং 2011 সালে তা পুনরায় বেড়েছে। উন্নত দেশগুলিতে সাধারণত পুরুষ অপেক্ষা নারীর অনুপাত মোট জনসংখ্যায় বেশি। কিন্তু ভারত-সহ স্বল্পোন্নত বা অনুন্নত দেশগুলিতে এর বিপরীত প্রবণতা লক্ষ করা যায়। ভারতে কন্যা সন্তানকে অবহেলা করা হয়। ফলে কন্যা সন্তানের মৃত্যুহার বেশি। তা ছাড়া, সন্তান প্রসবকালে অনেক মহিলা মারা যান। এছাড়া, অনেকে কন্যা সন্তান নিতে অনিচ্ছুক বলে কন্যা ভ্রূণ হত্যা ঘটে থাকে। আবার, পরিবারে মহিলারা স্বাস্থ্যের ব্যাপারে অনেক সময়ই অবহেলিত। এসমস্ত কারণে ভারতের মোট জনসংখ্যায় পুরুষ অপেক্ষা নারীর সংখ্যা কম।

সারণি 6.1

ভারতে লিঙ্গ অনুপাত (1991-2001)

বছর	**1000 পুরুষ প্রতি স্ত্রীলোকের সংখ্যা**
1901	972
1921	955
1951	946
1971	930
1991	927
2001	933
2011	940

সূত্র : বিভিন্ন আদমশুমারির প্রতিবেদন

পঞ্চমত, ভারতে জনসংখ্যার একটা বড় অংশ গ্রামে বাস করে। 1901 সালে মোট জনসংখ্যার 89 শতাংশ গ্রামে বাস করত, আর বাকি 11 শতাংশ শহরে বাস করত (সারণি 6.2)। অবশ্য, অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে সাথে বহু নগর ও শহরের পত্তন হয়েছে। পুরনো অনেক শহর আয়তনে বড় হয়েছে। এক কথায়, ভারতে বিগত এবং বর্তমান শতাব্দীতে নগরায়ণ ঘটে চলেছে। ফলে মোট জনসংখ্যায় শহরবাসীর অনুপাত ক্রমশ বাড়ছে এবং গ্রামবাসীর অনুপাত কমছে। 1971 সালের জনগণনা অনুযায়ী ভারতে গ্রামীণ ও শহুরে জনসংখ্যার অনুপাত ছিল 80 : 20 অর্থাৎ

প্রতি পাঁচজনের মধ্যে 4 জন গ্রামবাসী ও 1 জন শহরবাসী। 2011 সালে এই অনুপাত কমে দাঁড়ায় 69 : 31 (সারণি 3.2)। 2020 সালে ভারতে মোট জনসংখ্যার 65 শতাংশ গ্রামে এবং 35 শতাংশ শহরে বাস করত। (সূত্র : indiaonlinepages.com)।

ষষ্ঠত, 2020 সালের তথ্য অনুযায়ী, ভারতের মোট জনসংখ্যার মোটামুটি 52 শতাংশ কর্মে নিযুক্ত এবং অবশিষ্ট 48 শতাংশ কোনো কর্মে নিযুক্ত নেই। সুতরাং, 52 শতাংশ ব্যক্তির আয়ের উপর 48 শতাংশ ব্যক্তি নির্ভর করে। কোনো জনসংখ্যার কর্মহীন ও কর্মে নিযুক্ত এই দুই ধরনের ব্যক্তির অনুপাতকে বলা হয় নির্ভরশীলতার ভার বা বোঝা (dependency load)। ভারতে এই বোঝা বা ভার খুবই বেশি। কর্মে নিযুক্ত ব্যক্তির উপর এই বোঝা যত বেশি হবে, তত সঞ্চয় কম হবে। কারণ উৎপাদনশীল বা কর্মে নিযুক্ত ব্যক্তিদের দ্বারা উৎপন্ন দ্রব্যসামগ্রীর একটা বড় অংশ অনুৎপাদনশীল ব্যক্তিদের ভরণপোষণে ব্যয়িত হয়ে যাবে। এজন্যই ভারতে সঞ্চয়ের হার উন্নত দেশগুলির তুলনায় কম।

সারণি 6.2

ভারতে গ্রামীণ ও শহুরে জনসংখ্যার বণ্টন

(শতাংশ)

বছর	গ্রামীণ জনসংখ্যা	শহুরে জনসংখ্যা
1901	89	11
1931	88	12
1961	82	18
1971	80	20
2002	72	28
2011	69	31

সূত্র : বিভিন্ন জনগণনার প্রতিবেদন

সপ্তমত, ভারতের জনসংখ্যার একটা বড় অংশই নিরক্ষর। 2020 সালে ভারতে সাক্ষরতার হার ছিল 77.7 শতাংশ। কিন্তু 2021 সালে তা কমে 74.04 শতাংশে দাঁড়ায়। 2022 সালে মার্চ মাসে অবশ্য ভারতে সাক্ষরতার হার কিছুটা বেড়ে দাঁড়ায় 76.26 শতাংশ (সূত্র : ihrpoe.co.in)। অর্থাৎ জনসংখ্যার 24 শতাংশ ব্যক্তিই নিরক্ষর। এর ফলে জনসাধারণের শিক্ষাগত মান বা শ্রমিক হিসাবে গুণগত মান খুবই নিম্ন। ভারতীয় শ্রমিকদের স্বল্প উৎপাদনশীলতার অন্যতম প্রধান কারণ হল তাদের মধ্যে উচ্চ হারে নিরক্ষরতা।

৬.৪ ভারতের জনসংখ্যার গতি প্রকৃতি

1901 সাল থেকে 2011 সাল পর্যন্ত ভারতের জনসংখ্যার কীরূপ পরিবর্তন হয়েছে তা আমরা বর্তমান বিভাগে আলোচনা করব। আলোচনার সুবিধার জন্য আমরা এই সমগ্র সময়কালটিকে তিনটি অংশে ভাগ করছি :

(i) প্রথম সময়কাল : 1891 থেকে 1921 সাল পর্যন্ত,

(ii) দ্বিতীয় সময়কাল : 1951 থেকে 1951 সাল পর্যন্ত,

(iii) তৃতীয় সময়কাল : 1951 থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত।

সমগ্র সময়কালে ভারতের জনসংখ্যার গতিপ্রকৃতি আমরা 6.3 নং সারণিতে দেখিয়েছি। সারণি থেকে দেখা যাচ্ছে যে, 1891 থেকে 1921 সালের মধ্যে অর্থাৎ 30 বছর সময়কালে ভারতের জনসংখ্যা 23.6 কোটি থেকে বেড়ে 25.1 কোটি হয়েছে অর্থাৎ জনসংখ্যা 30 বছরে 1.5 কোটি বৃদ্ধি পেয়েছে। এই সময়কালে জন্মহার ও মৃত্যুহার উভয়ই খুব বেশি ছিল। তাই জনসংখ্যা কম হারে বৃদ্ধি পেয়েছে।

এরপর 1921 সালের 25.1 কোটি থেকে জনসংখ্যা 1951 সালে পৌঁছেছে 36.1 কোটিতে। অর্থাৎ (1921-51) এই 30 বছরে ভারতে জনসংখ্যা 11 কোটি বৃদ্ধি পেয়েছে। এই সময়ের মধ্যে জনসংখ্যা আগের তুলনায় বেশি হারে বাড়ার পিছনে প্রধান কারণ হল মৃত্যুহার হ্রাস। যদিও ওই সময়ে জন্মহারও সামান্য কমেছে, কিন্তু মৃত্যুহার কমেছে জন্মহার অপেক্ষা বেশি হারে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের ফলে ওই সময়ে ভারতে প্লেগ, বসন্ত, কলেরা প্রভৃতি মহামারি অনেকটা নিয়ন্ত্রিত হয়। এজন্য মৃত্যুহার অনেকটা হ্রাস পায়। তাই জনসংখ্যা 1921 সাল থেকে অপেক্ষাকৃত দ্রুত হারে বাড়তে থাকে। 1921 সালকে তাই ভারতের জনসংখ্যার ইতিহাসে **বিরাট বিভাজনের বছর** (Year of Great Divide) বলে অভিহিত করা হয়।

এরপর 1951-1981 এই সময়কালে জনসংখ্যা বেড়েছে 32.2 কোটি (68.3 – 36.1)। অর্থাৎ আগের 30 বছরের তুলনায় বৃদ্ধির পরিমাণ তিনগুণ। স্বাধীনতার পর এই সময়কালে হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা, চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নতি প্রভৃতির ফলে মৃত্যু হার অতি দ্রুত হ্রাস পেয়েছে এবং জন্মহার সামান্যই হ্রাস পেয়েছে। ফলে জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে। 1981 থেকে 2021 সালের ডিসেম্বরের মধ্যে জনসংখ্যা বেড়েছে 71.7 কোটি (140.0 – 68.3)। জনসংখ্যার এই বিপুল বৃদ্ধিকে অনেকে ভারতে জন বিস্ফোরণ বলে অভিহিত করেছেন। তবে এই সময়কালে ভারতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমেছে। কিন্তু জনসংখ্যার ভিত্তি বড় হওয়ায় বৃদ্ধির হার কমলেও জনসংখ্যার নিট বৃদ্ধির আয়তন খুব বড়।

সারণি 6.3

ভারতের জনসংখ্যার গতিপ্রকৃতি (কোটিতে)

জনগণনার বছর	জনসংখ্যা (কোটি)
1891	23.6
1901	23.6
1911	25.2
1921	25.1
1931	27.9
1941	31.9
1951	36.1
1961	43.9
1971	54.8
1981	68.3
1991	84.6
2001	102.9
2011	121.0
2021(ডিসেম্বর)	140.0

সূত্র : 1891 থেকে 2011 সাল:বিভিন্ন আদমশুমারির রিপোর্ট।
2021 সালের তথ্য : www.worldometers.info

৬.৫ ভারতে জনসংখ্যা পরিবর্তনের স্তর

কোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে সাথে সেই দেশের জনসংখ্যা কীভাবে পরিবর্তিত হয় সে সম্পর্কে কোল ও হুভার একটি তত্ত্ব দিয়েছেন। সেই তত্ত্বটিকে **জনসংখ্যার স্তর পরিবর্তনের তত্ত্ব** (Theory of Demographic Tansition) বলা হয়। এই তত্ত্বটির মতে, অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে সাথে কোনো দেশের জনসংখ্যা তিনটি স্তরের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে। তিনটি স্তরের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিম্নরূপ :

(i) প্রথম স্তর : এই পর্যায় বা স্তরে জন্মহার ও মৃত্যুহার উভয়ই খুব বেশি থাকে। ফলে জনসংখ্যা স্থিতিশীল থাকে বা অতি সামান্য বৃদ্ধি পায়।

(ii) দ্বিতীয় স্তর : এই পর্যায় বা স্তরে মৃত্যুহার দ্রুত হারে হ্রাস পায় কিন্তু জন্মহার সামান্যই হ্রাস পায় বা প্রায় একই থাকে। ফলে জনসংখ্যা দ্রুত হারে বৃদ্ধি পায়।

(iii) তৃতীয় স্তর : এই পর্যায় বা স্তরে জন্মহার ও মৃত্যুহার উভয়ই হ্রাস পায় এবং উভয়েই প্রায় কাছাকাছি এসে পৌঁছায়। ফলে জনসংখ্যা আবার স্থিতিশীল হয়ে যায়।

ভারতের জনসংখ্যা বৃদ্ধির গতিপথকে এই তত্ত্বের আলোকে বিচার করা যেতে পারে। আমরা 6.4 নং সারণিতে ভারতের জনসংখ্যা বৃদ্ধির বার্ষিক চক্রবৃদ্ধির হার দেখিয়েছি। এই সারণি থেকে দেখা যাচ্ছে যে, 1891-1921 এই সময়কালে ভারতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল খুবই মন্থর। জনসংখ্যা বৃদ্ধির বার্ষিক চক্রবৃদ্ধির হার ছিল মাত্র 0.19 শতাংশ। আমরা বলতে পারি যে, 1921 সালের আগে ভারত জনসংখ্যার স্তর পরিবর্তনের তত্ত্বের প্রথম স্তরে ছিল। 1921 সালের আগে ভারতের জন্মহার ও মৃত্যুহার উভয়ই ছিল বেশি। ফলে জনসংখ্যা মোটামুটি স্থিতিশীল ছিল। জনসংখ্যার নিট বৃদ্ধির হার ছিল কম। এরপর 1921 সাল থেকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বাড়তে থাকে। 1921 থেকে 1951 সালের মধ্যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল বার্ষিক 1.21 শতাংশ। আমরা বলতে পারি যে, 1921 সালের পর ভারত জনসংখ্যার স্তর পরিবর্তনের দ্বিতীয় স্তরে প্রবেশ করেছে। এরপর 1951-1981 এই সময়কালে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল সর্বাধিক (বার্ষিক 2.15 শতাংশ)। এই সময়কালে মৃত্যুহার যথেষ্ট কমে যায় কিন্তু জন্মহার তেমন কমেনি। ফলে জনসংখ্যার এই উচ্চহারে বৃদ্ধি। 1981 সালের পর থেকে অবশ্য

সারণি 6.4

ভারতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির বার্ষিক চক্রবৃদ্ধির হার (শতাংশে)

সময়কাল	জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার
1891-1921	0.19
1921-1951	1.21
1951-1981	2.15
1981-1991	2.11
1991-2001	1.93
2001-2011	1.64

সূত্র : বিভিন্ন আদমশুমারির রিপোর্ট

ভারতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমতে থাকে। 2020 সাল নাগাদ ভারতের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার প্রায় 1 শতাংশে নেমে এসেছে। এর পিছনে একটি প্রধান কারণ হল জন্মহারে কিছুটা হ্রাস। 2017 সালে ভারতে প্রতি হাজারে জন্মহার ছিল 20.2, আর মৃত্যুহার ছিল প্রতি হাজারে 6.3। অর্থাৎ প্রতি হাজারে নিট বৃদ্ধি ছিল 13.9। 2020 সালে এই হাজার-প্রতি জন্মহার ছিল 18.2 এবং মৃত্যুহার সামান্য বেড়ে দাঁড়ায় 6.3। ফলে হাজার প্রতি নিট বৃদ্ধির হার ছিল 10.9। আমরা বলতে পারি যে, 1921 সালের পর ভারত জনসংখ্যা পরিবর্তনের দ্বিতীয় স্তরে প্রবেশ করেছে এবং এখনও দেশটি এই দ্বিতীয় স্তরেই রয়েছে। ভারতে জনসংখ্যায় স্তর পরিবর্তনের তৃতীয় স্তর এখনো আসেনি। তবে আশা করা যেতে পারে যে, ভারত অদূর ভবিষ্যতে জনসংখ্যা পরিবর্তনের তৃতীয় স্তরে প্রবেশ করবে।

৬.৬ ভারতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলাফল

ভারতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে নানা বাধার সৃষ্টি করেছে। সংক্ষেপে সেই বাধা বা বিরূপ প্রভাবগুলি নিম্নরূপ :

1. ভারতে দ্রুতহারে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে জাতীয় আয় দ্রুত হারে বাড়লেও মাথাপিছু আয় দ্রুতহারে বাড়ছে না। যেমন, দ্বাদশ পরিকল্পনা কালে (2012-17) ভারতে জাতীয় আয় বৃদ্ধির বার্ষিক হার ছিল 6.9 শতাংশ। কিন্তু জনসংখ্যা বাড়ার ফলে মাথাপিছু আয় ওই সময়কালে 4.9 শতাংশ হারে বেড়েছে।

2. দ্রুত হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে ভারতের জনসংখ্যায় শিশুদের অনুপাত যথেষ্ট বেশি। শিশুরা কোনো আয় করে না, কিন্তু ভোগ করে। ফলে জনসংখ্যায় শিশুদের অনুপাত বাড়লে ভোগ ব্যয়, আয়ের তুলনায় বেশি হয়। ফলে দেশের সঞ্চয় ও বিনিয়োগ কমে। এর ফলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ব্যাহত হয়। ভারতে কর্মক্ষম ব্যক্তিদের উপর নির্ভরশীলতার বোঝা বা ভার খুব বেশি। এর ফলে বিনিয়োগ করার মতো উদ্‌বৃত্ত বিশেষ থাকছে না। এর পিছনে অন্যতম কারণ হল জনসংখ্যা বৃদ্ধি।

3. ভারতে দ্রুত হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে খাদ্যের চাহিদা বাড়ছে। সেজন্য ভারতকে বিদেশ থেকে খাদ্যশস্য আমদানি করতে হয়েছে। এর ফলে মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয়িত হয়েছে। ওই বৈদেশিক মুদ্রার সাহায্যে বিদেশ থেকে উন্নত যন্ত্রপাতি, সাজসরঞ্জাম এবং বিদেশি কলাকুশলী আমদানি করা যেত। ফলে শিল্পের উন্নতির হার বাড়ত।

4. জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে ভারতীয় কৃষিতে জনসংখ্যার চাপ ক্রমাগত বেড়েছে। কৃষিতে প্রচ্ছন্ন বেকারি দেখা দিচ্ছে। প্রয়োজনের তুলনায় বেশি সংখ্যক ব্যক্তি কৃষিতে নিযুক্ত থাকায় কৃষিক্ষেত্রে ক্রমহ্রাসমান উৎপাদনের নিয়ম কার্যকরী হচ্ছে।

5. জনসংখ্যা বাড়লে অবশ্য অভ্যন্তরীণ বাজার প্রসারিত হয়, শিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদা সৃষ্টি হয়। ফলে শিল্পক্ষেত্র প্রসারিত হয়। কিন্তু ভারতের ক্ষেত্রে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে এই অভ্যন্তরীণ বাজারের সুবিধা পাওয়া যায়নি। ভারতের জনসংখ্যার এক বড় অংশ দারিদ্র্য সীমার নীচে বাস করে। তাদের ক্রয়ক্ষমতা খুবই কম। তাই ভারতে জনসংখ্যা বাড়লেও অভ্যন্তরীণ বাজার তেমন প্রসারিত হয়নি এবং শিল্পজাত দ্রব্যের বাজার বাড়েনি। জনসংখ্যা বৃদ্ধি তাই শিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি করে শিল্পের উন্নতিতে সাহায্য করতে পারেনি।

6. ভারতে দ্রুতহারে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে বেকার সমস্যা ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে নতুন যতজন শ্রমিক শ্রমের বাজারে এসেছে, তত সংখ্যক কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়নি। ফলে প্রতিটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শেষে বকেয়া বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে ভারতীয় অর্থনীতির অন্যতম প্রধান সমস্যা হল বেকার সমস্যা। আর এই বেকার সমস্যার পিছনে প্রধান কারণ হল জনসংখ্যা বৃদ্ধি।

7. ভারতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে মাথাপিছু জোতের আয়তন কমেছে। কৃষিজোতগুলি ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর হয়ে পড়েছে। সেগুলিতে যান্ত্রিক প্রথায় কৃষিকাজ করা যাচ্ছে না। তা ছাড়া, জোতগুলি ক্ষুদ্র হবার ফলে আয়তনজনিত সুবিধাও পাওয়া যাচ্ছে না। ফলে কৃষিক্ষেত্রে একর প্রতি উৎপাদন ব্যয় বাড়ছে।

8. জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে ভারত সরকারকে শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি খাতে বেশি বেশি টাকা ব্যয় করতে হচ্ছে। ফলে সরকারের বিনিয়োগযোগ্য তহবিলের পরিমাণ কমছে। তা ছাড়া, জনসংখ্যা বাড়লে বাড়তি জনসংখ্যার জন্য নতুন বাসস্থান নির্মাণ করতে হয়। এর ফলেও ভারতে কৃষিযোগ্য জমির পরিমাণ কমেছে। এছাড়া, জনসংখ্যা বাড়ার ফলে নানা ধরনের পরিবেশ দূষণও বাড়ছে। সেই দূষণ নিয়ন্ত্রণ করতেও সরকারকে অনেক টাকা ব্যয় করতে হচ্ছে।

সুতরাং, দেখা যাচ্ছে যে, জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে ভারতে নানা সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। এর ফলে আমাদের খাদ্য আমদানির ব্যয় বেড়েছে, কৃষিজোতের গড় আয়তন কমেছে, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান, পরিবেশ সুরক্ষা ইত্যাদি খাতে বিপুল অর্থ ব্যয় করতে হচ্ছে। ফলে সরকারের হাতে আর উৎপাদনশীল বিনিয়োগ করার মতো সম্পদ বিশেষ অবশিষ্ট থাকছে না। ফলে ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়ন বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে।

৬.৭ অর্থনৈতিক উন্নয়নে জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং জনসংখ্যার বৃদ্ধির জন্য অর্থনৈতিক উন্নয়নে তার ফলাফল

যে কোনো দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের মধ্যে একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি যেমন একদিকে অর্থনৈতিক উন্নয়নকে প্রভাবিত করে তেমনি অর্থনৈতিক উন্নয়নও

জনসংখ্যাকে বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করে। তাই জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন এর মধ্যে সম্পর্ক হলো দ্বিপাক্ষিক। একে অপরেক প্রভাবিত করে। একে অপরের দ্বারা প্রভাবিত হয়। সেই জন্যই জনসংখ্যাবৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের মধ্যে সম্পর্ক দুই দিক থেকে আলোচনা করা প্রয়োজন।

(ক) জনসংখ্যা বৃদ্ধির উপর অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রভাব (Effect of Economic Development on Population Growth)

(খ) অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপর জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রভাব (Effect of Population Growth on Economic Development)

৬.৭.১ ভারতের পরিপ্রেক্ষিতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির উপর অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রভাব

অর্থনৈতিক উন্নয়নের ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির উপর কি ধরনের প্রভাব পড়ে সেটি জনসংখ্যার রূপান্তর তত্ত্বের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায়।

কোনো দেশ যখন অনুন্নতির স্তরে থাকে তখন দেশটি জনসংখ্যার রূপান্তর সংক্রান্ত তত্ত্বের প্রথম স্তরে থাকে। অনুন্নতির এই স্তরে দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোতে অতি নিম্ন আয়স্তরের ভারসাম্য বিরাজ করে। অর্থনীতির এই অবস্থায় দেশটিতে জন্মহার যেমন বেশী থাকে তেমনি মৃত্যুহারও বেশি থাকে। ফলে জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার সাধারণত কম থাকে। জীবনযাত্রার নিম্নমান, নিদারুন দারিদ্র, অপুষ্টি, সুচিকিৎসার অভাব প্রভৃতি কারণে এই স্তরে মৃত্যুহার বেশী থাকে। এছাড়া নানাধরণের সংক্রামক ব্যাধি, দুর্ভিক্ষ, মহামারী প্রভৃতির ফলেও মৃত্যুহার বেশি হয়। এই স্তরে জন্মহার বেশী হয় শিক্ষার অভাব, অল্পবয়সে বিবাহ, পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে অজ্ঞতা, সামাজিক কুসংস্কার প্রভৃতি কারণে। সুতরাং অর্থনৈতিক অনুন্নতির স্তরে দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার প্রায় স্থিতিশীল থাকে।

অর্থনৈতিক উন্নয়ন কিছু দূর অগ্রসর হলে বা অর্থনৈতিক উন্নয়ন একটি পর্যায়ে পৌঁছলে অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রভাবে জন্মহার ও মৃত্যুহার উভয়ই হ্রাস পায় এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাস পেতে থাকে। তার মূল কারণ হল :

(১) **আনন্দের জৈবিক উৎস গুরুত্বহীন হয় :** আর্থিক উন্নয়নের ফলে জনসাধারণের আর্থিক আয় বৃদ্ধি পায় ফলে সুখস্বাচ্ছন্দ ও বৈচিত্রময় জীবনযাপনের ইচ্ছা তীব্র হয় এবং আনন্দের উৎস স্ত্রী বা সন্তানসন্ততির বদলে আনন্দের নতুন উৎসের সন্ধান পায়। ফলে জন্মহার হ্রাস পায়।

(২) **নারী প্রগতি ও নারী স্বাধীনতা :** অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে নারীদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার ঘটে। নারী প্রগতি ও নারী স্বাধীনতার ফলে অনেক মহিলাই বাড়ির বাইরে বিভিন্ন কাজে নিযুক্ত হতে থাকে। এই অবস্থায় ঘন ঘন সন্তানসম্ভবা হওয়ার প্রবণতা কমে যায় এবং জন্মহার হ্রাস পেতে থাকে।

(৩) **শিক্ষার বিস্তার :** অর্থনৈতিক উন্নয়নের ফলে সার্বিক শিক্ষার প্রসার ঘটতে পারে। শিক্ষার সঙ্গে জন্মহারের বিপরীত সম্পর্ক বর্তমান। তাই শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে জন্মহার হ্রাস পেতে থাকে। কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শিক্ষিত দম্পতির সন্তান সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম হতে থাকে।

(৪) **জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে সচেতনতা :** অর্থনৈতিক উন্নয়নের ফলে উন্নত সমাজ ব্যবস্থায় মানুষ জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে। তাই তারা জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে সচেতন হয় এবং সন্তান নিয়ন্ত্রণের জন্যে সচেষ্ট হয়। ফলে জন্মহার হ্রাস পায়।

৬.৭.২ ভারতের পরিপ্রেক্ষিতে অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপর জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রভাব (Effect of population growth on Economic Development)

অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপর জনসংখ্যা বৃদ্ধি কি প্রভাব বিস্তার করে সেটি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করেছেন। কোনো কোনো অর্থনীতিবিদের মতে দ্রুত হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি বৃদ্ধি করে। অধ্যাপক Lewis এর মতে দেশে জনসংখ্যা দ্রুত হারে বৃদ্ধি পেলে শ্রমের যোগান বৃদ্ধি পায় কিন্তু মজুরীর হার বৃদ্ধি পায় না। তাই ওই অতিরিক্ত শ্রমিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি দ্রুততর করে।

অর্থনীতিবিদ Keynes ও Hansen এর মতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের কাজকে বিভিন্নভাবে সাহায্য করে। অধ্যাপক Hansen এর মতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে দ্রব্য ও সেবার বাজার প্রসারিত হয় ফলে উদ্যোক্তরা বেশি পরিমাণে বিনিয়োগে উৎসাহিত হয় ফলে উৎপাদন, আয়, জীবনযাত্রার মান ইত্যাদি বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি বৃদ্ধি পেতে থাকে। কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে অর্থনৈতিক উন্নয়নের অনুকুল পরিবেশের সুযোগ দেশটি কতখানি গ্রহণ করতে পারবে তা নির্ভর করে দেশের কারিগরী জ্ঞানের স্তর। কৃষি ও শিল্পের অবস্থা, মুলধন গঠন ও বিনিয়োগ বৃদ্ধির ক্ষমতা এবং দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোর উপর। ভারতের ক্ষেত্রে দেখা যায় দ্রুতহারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সাহায্য না করে অর্থনৈতিক উন্নয়নে বাধা সৃষ্টি করেছে।

৬.৮ ভারতে জনসংখ্যা সম্পর্কিত সরকারি নীতি

ভারতে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য সরকার নানাবিধ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। এক কথায় সেগুলিকে বলা যেতে পারে পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি। সংক্ষেপে সেই কর্মসূচির উপাদনগুলি হল নিম্নরূপ :

(i) পরিবারের আয়তন সীমিত রাখার জন্য সরকারের ব্যাপক প্রচার। এই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন গণমাধ্যম, যেমন, সংবাদপত্র, রেডিও, টিভি প্রভৃতির ব্যবহার।

(ii) জন্মহার নিয়ন্ত্রণ করার জন্য জন্মনিরোধক ব্যবস্থাগুলি জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা।

(iii) নির্বীজকরণ ও বন্ধ্যাত্বকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করলে বিনা ব্যয়ে তা করে দেওয়ার ব্যবস্থা এবং পরিবারকে এককালীন কিছু আর্থিক সাহায্য প্রদান।

(iv) জন্ম নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে জনসাধারণের অজ্ঞতা ও কুসংস্কার দূর করতে ব্যাপক প্রচার।

(v) নির্ভরযোগ্য জন্ম নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা আবিষ্কারের জন্য গবেষণা পরিচালনা।

(vi) মেয়েদের বিবাহের ন্যূনতম বয়স বৃদ্ধি করা।

এই সমস্ত ব্যবস্থাগুলির গুরুত্ব একেবারে অস্বীকার করা যায় না। তবে এধরনের জনসংখ্যা নীতির প্রধান ত্রুটি হল, এই নীতিতে জনসংখ্যার পরিমাণগত নিয়ন্ত্রণের উপরই বেশি জোর দেওয়া হয়েছে। কিন্তু শুধুমাত্র জনসংখ্যার পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করলেই ভারতের জনসংখ্যার সমস্যার সমাধান হবে বলে মনে হয় না। সরকারকে আরো কতকগুলি বিষয়ের উপর দৃষ্টি দিতে হবে। সংক্ষেপে সেগুলি এখানে উল্লেখ করা হল :

1. কোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রথম দিকেই জনসংখ্যার সমস্যাটি পরিলক্ষিত হয়। তখন মৃত্যুহার খুব দ্রুত কমে অথচ জন্মহার একই থাকে। ফলে জনসংখ্যা বাড়তে থাকে। কিন্তু দেশটি যথেষ্ট উন্নত হয়ে গেলে তখন জন্মহার হ্রাস পায় এবং দেশটির জনসমষ্টির আয়তনে স্থিতিশীলতা আসে। সুতরাং জনসংখ্যা বৃদ্ধির সমস্যা দূর করতে হলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে হবে। উন্নত দেশগুলিতে উন্নয়নের সাথে সাথে জন্মহার হ্রাস পেয়েছে এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। ভারতকেও তাই জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করতে হলে দ্রুতহারে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটাতে হবে। Coale এবং Hoover-এর জনসংখ্যা সম্পর্কিত রূপান্তরের তত্ত্বও একই কথা নির্দেশ করে।

2. বিভিন্ন তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে যে, শিশু মৃত্যুর হারের (Infant Mortality Rate বা IMR) সঙ্গে জন্মহারের একটি প্রত্যক্ষ সম্পর্ক আছে। শিশু মৃত্যুর হার বেশি হলে সাধারণত একটি বা দুটি সন্তান নিলে তাদের বেঁচে থাকা সম্পর্কে কোনো দম্পতি নিশ্চিন্ত হতে পারে না। ফলে তারা বেশি সংখ্যক সন্তান নিয়ে থাকে। এজন্য শিশু মৃত্যুর হার বেশি হলে জন্মহারও বেশি হয়। সুতরাং, জন্মহার কমাতে গেলে শিশু মৃত্যুর হার কমাতে হবে। ভারত সরকারকে এই বিষয়টির উপর গুরুত্ব দিতে হবে। উপযুক্ত শিশু উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করে শিশু মৃত্যুর হার কমাতে হবে। তাহলে জন্মহার কমবে এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারও কমবে।

3. ভারতের জনসংখ্যার একটা বড় অংশই গ্রামে বাস করে। এখানে কৃষিই প্রধান উপজীবিকা। এখানে জনসাধারণের বড় অংশের সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেই। কৃষিজীবীদের ক্ষেত্রে একথা বিশেষভাবে প্রযোজ্য। দরিদ্র জনসাধারণের কাছে সন্তানই ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা। তাই ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা হিসাবে অধিক সন্তান নেওয়াকেই তারা কাম্য বলে মনে করে। কৃষিজীবী জনসাধারণের

এই চিন্তা-ভাবনা দূর করতে হলে তাদের মধ্যে সামাজিক নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থার প্রবর্তন করতে হবে।

4. ভারতের জাতীয় আয়ের বণ্টন অত্যন্ত অসম। আয়ের বণ্টন সুষম করতে পারলে এক বিশাল অংশের জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান বাড়বে। আর জীবনযাত্রার মান উন্নত হলে জন্মহার হ্রাস পাবে।

অবশ্য সরকার এ ধরনের কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। তবে সেগুলি জন্ম নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচির সঙ্গে সংযুক্ত নয়। যেমন, সুসংহত শিশু উন্নয়ন প্রকল্প (Integrated Child Development Services বা ICDS) গ্রহণ করা হয়েছে, ভারতের আয় বণ্টনের বৈষম্য কমানোর জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, কৃষকদের ক্ষেত্রে ফসলের বিমা এবং কিছু ক্ষেত্রে ভাতার প্রচলন করা হয়েছে; শিশুমৃত্যুর হার কমাতে প্রসূতি কল্যাণ কর্মসূচি গৃহীত হয়েছে ইত্যাদি। এসবের ফলে ভারতের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার সম্প্রতি অনেকটা কমে এসেছে। যেমন, 2021 সালে ভারতে জন্মহার ছিল 0.97 শতাংশ (সূত্র : www.worldmeters.info)। তবে উপরোক্ত কর্মসূচিগুলিকে জন্মনিয়ন্ত্রণের দীর্ঘকালীন কর্মসূচির অঙ্গ বলে বিবেচনা করতে হবে।

জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি আরো দুটি সংশ্লিষ্ট দিকে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। ভারতের কিছু এলাকায় জনঘনত্ব খুব বেশি; আবার কিছু অঞ্চলে জনঘনত্ব খুবই কম। এর পিছনে প্রধান কারণ হল উন্নয়নে আঞ্চলিক বৈষম্য। জনসংখ্যার সুষম বন্টন ঘটাতে গেলে সরকারকে উন্নয়নের আঞ্চলিক বৈষম্য দূর করতে, নিদেনপক্ষে কমাতে হবে। আর একটি বিষয় হল নিরক্ষরতা। এই নিরক্ষরতা দূর করতে পারলে জনসাধারণের মধ্যে সীমিত আয়তনের পরিবারের সুফল সম্পর্কে সচেতনতা বাড়বে এবং তাদের অশিক্ষা ও কুসংস্কার দূর হবে। এতে একদিকে যেমন জন্মহার নিয়ন্ত্রিত হবে, অন্যদিকে তেমনি শ্রমিকদের গুণগত মান বাড়বে। তেমনি, ভারত সরকারকে উপযুক্ত জন-স্থানান্তর নীতি গ্রহণ করে বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে জনঘনত্বের পার্থক্য দূর করতে হবে। এতে কিছু বড় শহরে জনসংখ্যার অত্যধিক চাপ, বস্তি ও ঘিঞ্জি এলাকায় জীবনযাপন প্রভৃতি কমবে। সামগ্রিকভাবে, সাধারণ জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নত হবে এবং শ্রমিকের গুণগত মান বাড়বে। তাই জনসংখ্যা সম্পর্কিত নীতি মানে শুধু জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ নয়, সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসংখ্যার গুণগত মান উন্নত করাকেও বোঝায়।

৬.৯ সারাংশ

১. ভারতে জনসংখ্যা সমস্যার বিভিন্ন দিক : ভারতের জনসংখ্যা সমস্যার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য দিক হল নিম্নরূপ : (i) ভারতের জনসংখ্যার ভিত্তি খুবই বড়। (ii) জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারও যথেষ্ট বেশি। (iii) মোট জনসংখ্যায় শিশু ও বালক-বালিকার অনুপাত খুব বেশি। (iv) ভারতের জনসংখ্যায় স্ত্রীলোক অপেক্ষা পুরুষের সংখ্যা বেশি। (v) ভারতের জনসংখ্যার বড় অংশ গ্রামে বাস করে। (vi) ভারতের

জনসংখ্যার নির্ভরতার ভার বা বোঝা যথেষ্ট বেশি। (vii) ভারতীয় জনসাধারণের শিক্ষাগত মান বা শ্রমিক হিসাবে গুণমান বিশ্বের উন্নত দেশের তুলনায় যথেষ্ট নিম্ন।

২. ভারতে জনসংখ্যার গতিপ্রকৃতি : 1891 থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত ভারতের জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে তিন সময়পর্বে ভাগ করতে পারি। **প্রথম** পর্বটি হল 1891 থেকে 1921 সাল। এই সময়ে জন্মহার ও মৃত্যুহার উভয়ই খুব বেশি ছিল। ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল মাত্র 0.19 শতাংশ। **দ্বিতীয়** কালপর্বটি হল 1921 থেকে 1951 সাল। এই সময়কালে মৃতু হার দ্রুত হ্রাস পায় এবং জন্মহার সামান্য হ্রাস পায়। এই সময়ে নানা মহামারির (প্লেগ, বসন্ত, কলেরা প্রভৃতি) নিয়ন্ত্রিত হবার ফলে মৃত্যুহার দ্রুত হ্রাস পায়। ফলে জনসংখ্যা দ্রুত হারে (1.22 শতাংশ) বাড়তে থাকে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির তৃতীয় কালপর্বটি হল 1951 থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত। এর মধ্যে 1951-81 সময়কালে জনসংখ্যা খুবই দ্রুত হারে (2.15 শতাংশ) বৃদ্ধি পেয়েছে। একে অনেকে জনবিস্ফোরণ বলে অভিহিত করেছেন। 2011 সালের পর থেকে ভারতের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কিছুটা কমেছে। 2021 সালে ভারতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল 0.97 শতাংশ।

৩. ভারতে জনসংখ্যা পরিবর্তনের স্তর : 1921 সালের পূর্ব পর্যন্ত ভারত জনসংখ্যার স্তর পরিবর্তন তত্ত্ব অনুযায়ী প্রথম স্তরে ছিল। এই স্তরে জন্মহার ও মৃত্যুহার উভয়ই খুব বেশি থাকে। 1921 সালের পর ভারত জনসংখ্যা পরিবর্তনের দ্বিতীয় স্তরে প্রবেশ করেছে। এই স্তরে মৃত্যুহার দ্রুত কমে কিন্তু জন্মহার সামান্যই হ্রাস পায়। ভারত এখনও এই দ্বিতীয় স্তরেই রয়েছে। জনসংখ্যা পরিবর্তনের তৃতীয় স্তরে ভারত এখনও পৌঁছায়নি। এই তৃতীয় স্তরে জন্মহার ও মৃত্যুহার উভয়ই হ্রাস পায় এবং উভয়ই খুব কাছাকাছি এসে যায়। ফলে জনসংখ্যা স্থিতিশীল হয়ে যায়। এই তৃতীয় স্তরে পৌঁছাতে ভারতের এখনও দেরি আছে।

৪. ভারতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলাফল : দ্রুত হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নে নানা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে। **প্রথমত**, দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির হার কম হয়েছে। **দ্বিতীয়ত**, দ্রুত হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে নানা সময়ে খাদ্য সমস্যা দেখা দিয়েছে। মাথাপিছু খাদ্যশস্য ভোগের পরিমাণ সামান্যই বৃদ্ধি পেয়েছে। **তৃতীয়ত**, জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে বেকার সমস্যা বিশাল আকার ধারণ করেছে। **চতুর্থত**, দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে দেশের মোট কর্মক্ষম জনসাধারণের মধ্যে অনুৎপাদক জনসাধারণের অনুপাত উচ্চ স্তরেই রয়ে গেছে। ফলে উৎপাদনশীল জনসাধারণের উপর নির্ভরশীলতার মাত্রা যথেষ্ট বেশি।

৫. ভারতে জনসংখ্যা সম্পর্কিত সরকারি নীতি : ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার সমস্যার প্রতিকারের জন্য ভারত সরকার নানা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। তার মধ্যে জন্মহার হ্রাস করার চেষ্টাই প্রধান। নানা ধরনের পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচির মাধ্যমে সরকার জন্মহার হ্রাস করতে সচেষ্ট হয়েছে। কিন্তু শুধুমাত্র জন্মহার হ্রাস করার চেষ্টা করলেই হবে না। জনসংখ্যার সমস্যাটি সমাধান করতে হলে আরো কতকগুলি ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন। তার মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য হল অর্থনৈতিক উন্নয়নের দিকে দৃষ্টি দেওয়া। অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, উন্নত দেশগুলিতে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে সাথে জন্মহার হ্রাস পেয়েছে।

৬.১০ অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত উত্তরের প্রশ্নাবলি

১. ভারতের জনসংখ্যার আলোচনায় কোন্ সালকে 'বিরাট বিভাজনের বছর' বলা হয় ও কেন?

২. জনসংখ্যার স্তর পরিবর্তনের তত্ত্বটি কী?

৩. ভারতের জনসংখ্যা বৃদ্ধির ইতিহাসে প্রথম স্তর কোন্‌টি?

৪. ভারত বর্তমানে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কোন্ স্তরে রয়েছে?

৫. অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপর জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রভাবে Lewis এর মতামত কি?

৬. অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপর জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রভাবে Keynes এবং Hansen এর মতামত কি?

মাঝারি উত্তরের প্রশ্নাবলী

১. ভারতে জনসংখ্যার সমস্যার দুটি প্রধান দিক উল্লেখ কর।

২. ভারতে জনসংখ্যার গতি প্রকৃতি আলোচনা কর।

৩. অর্থনৈতিক উন্নয়নে জনসংখ্যার প্রভাব আলোচনা কর।

৪. জনসংখ্যা বৃদ্ধির উপর অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রভাব আলোচনা কর।

দীর্ঘ উত্তরের প্রশ্নাবলী

১. ভারতে জনসংখ্যা সমস্যার বিভিন্ন দিক বিস্তৃত ভাবে আলোচনা কর।

২. বিগত কয়েকদশকে ভারতে জনসংখ্যার গতিপ্রকৃতি আলোচনা কর।

৩. ভারতে জনসংখ্যা পরিবর্ত্তনের যে কয়েকটি স্তর আছে তা আলোচনা কর।

৪. ভারতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলাফল আলোচনা কর।

সঠিক উত্তর নির্বাচনের প্রশ্নাবলী (MCQ)

১. কোন সালকে ভারতের জনসংখ্যার ইতিহাসে বিরাট বিভাজনের বছর বলা হয়?

(ক) 1916 (খ) 1921

(গ) 1930 (ঘ) কোনোটিই নয়

২. জনসংখ্যার স্তর পরিবর্ত্তনের তত্ত্ব অনুযায়ী কয়েটি স্তর

(ক) দুইটি (খ) তিনটি
(গ) চারটি (ঘ) কোনোটিই নয়

৩. ভারতে দ্বাদশ পরিকল্পনা বছরগুলি কি?

(ক) 2008–2013 (খ) 2012–2017
(গ) 2014–2019 (ঘ) কোনোটিই নয়

৪. জনসংখ্যা স্থিতিশীল থাকে কোন দুইটি স্তরে

(ক) প্রথম ও দ্বিতীয় (খ) দ্বিতীয় ও তৃতীয়
(গ) প্রথম ও তৃতীয় (ঘ) কোনোটিই নয়

৫. জনঘনত্ব বলতে কি বোঝায়?

(ক) প্রতি কিলোমিটারের জনসংখ্যা (খ) প্রতি বর্গ কিলোমিটারে জনসংখ্যা
(গ) প্রতি বর্গ মাইলে জনসংখ্যা (ঘ) কোনোটিই নয়

৬.১১ গ্রন্থপঞ্জি

১. নন্দী অজয় কুমার (2011) : *আধুনিক ভারতীয় অর্থনীতির রূপরেখা*, বি. বি. কুণ্ডু গ্র্যান্ড সন্স, কলকাতা।

২. সরখেল, জয়দেব, সেখ সেলিম ও অনিন্দ্য ভুক্তা (2020) : *অর্থনৈতিক উন্নয়ন : প্রতিষ্ঠান, তত্ত্ব ও প্রয়োগ*, বুক সিন্ডিকেট প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা।

৩. সরখেল, জয়দেব ও সেখ সেলিম (2022) : *ভারতীয় অর্থনীতি*, বুক সিন্ডিকেট প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা।

৪. Jhingan, M. L. (2002) : *The Economics of Development and Planning*, Vrinda Publications (P) Ltd., Delhi.

একক – ৭ ❑ মানব উন্নয়ন

গঠন

৭.১ উদ্দেশ্য

৭.২ প্রস্তাবনা

৭.৩ মানব উন্নয়নের ধারণা

৭.৪ মানব উন্নয়নের বিভিন্ন ভাগ

৭.৫ মানব উন্নয়ন সূচক ও তার গঠন

৭.৬ ভারতে শিক্ষার বিস্তার

৭.৭ ভারতে শিক্ষাক্ষেত্রে অগ্রগতির মূল্যায়ন

৭.৮ ভারতে স্বাস্থ্যক্ষেত্রের প্রসার বা অগ্রগতি

৭.৯ স্বাস্থ্যক্ষেত্রের উন্নতিকল্পে সরকারি ব্যবস্থা

৭.১০ মানব উন্নয়ন সূচকের ক্ষেত্রে ভারতের অগ্রগতি ও সমস্তরের দেশের সাথে তুলনা

৭.১১ সারাংশ

৭.১২ অনুশীলনী

৭.১৩ গ্রন্থপঞ্জি

৭.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে ছাত্রছাত্রীরা জানতে পারবে

- স্বাধীনতা পরবর্ত্তীকালে ভারতে শিক্ষার বিস্তার
- মানব উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা ও ধারণা
- মানব উন্নয়নের সূচক এবং তার উপাদানসমূহ
- মানব উন্নয়নের ক্ষেত্রে ভারতের আপেক্ষিক অবস্থান
- মানব উন্নয়নের সূচকের ক্ষেত্রে ভারতের অগ্রগতি ও সমস্তরের দেশের সাথে তুলনা

৭.২ প্রস্তাবনা

অর্থনৈতিক উন্নয়ন হল একটি জটিল প্রক্রিয়া যেখানে যেমন প্রাকৃতিক সম্পদের ভূমিকা আছে তেমনি মুলধন গঠন, কলকারখানা, সাজসরঞ্জাম এবং মানব সম্পদের ভূমিকা আছে। এখনকার সময়ে মানব উন্নয়ন সূচকের ভূমিকাকেও গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে, United Nations Development Programme (UNDP) মানব উন্নয়ন সূচক প্রথম প্রকাশ করে তাদের প্রথম মানব উন্নয়ন সংখ্যায় (Human Development Report) যা 1990 সালে প্রকাশিত হয়। তারপর পরবর্ত্তীকালে ইহা আরও ব্যাপক আকারে বিভিন্নভাবে প্রকাশিত হয় যেখানে লিঙ্গ সংক্রান্ত উন্নয়ন সূচক (GDI), লিঙ্গ কর্মনিয়োগ পদ্ধতি (Gender Employment Measures), মানব দারিদ্র সূচক (Human Poverty Index) কে অন্তর্ভুক্ত করা হয় পরবর্ত্তী Human Development Report-এ। মানব উন্নয়ন হল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান অর্থনৈতিক উন্নয়নে, উচ্চতর উৎপাদনশীলতায় পৌঁছতে হলে মানব উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় গুরুত্ব দেওয়া একান্ত প্রয়োজন। ইহা জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণেও প্রভূত গুরুত্বপূর্ণ। মানব উন্নয়নের বিভিন্ন ভাগ আছে যেমন সমতা, দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়ন, উৎপাদনশীলতা এবং ক্ষমতায়ন (Emprovement) যেগুলি আমরা এই এককে আলোচনা করেছি, এখন অর্থনীতিবিদগণ অর্থনৈতিক বৃদ্ধি থেকে মানব উন্নয়নে অনেক বেশী আলোকপাত করছেন। শুধুমাত্র আয় অর্থনৈতিক বিকাশ ও উন্নয়নের নির্ধারক নয় বরং তারা বলছেন শিক্ষার বিস্তার, স্বাক্ষরতা, স্বাস্থ, পরিবেশ, কাঠামোগত সুযোগসুবিধা এগুলিও সমানভাবে অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ।

কাজেই যদিও মানব উন্নয়ন হল শেষ কথা, ইহার পরিমাপ অত্যন্ত একটি জটিল বিষয়। অর্থনৈতিক বিকাশের পরিমাপের জন্য GNP অথবা GNI প্রতিজনের গণনা করা হয়। মানব উন্নয়নের জন্য এইরূপ কোন একটি পদ্ধতি বের করা কঠিন কারণ এর বহুমাত্রিক অবস্থানের জন্য।

৭.৩ মানব উন্নয়নের ধারণা

কোনো দেশের জীবনযাত্রার মান এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্তর প্রকাশ করতে অন্যতম জনপ্রিয় মাপকাঠি হল মাথাপিছু প্রকৃত আয়। কয়েকটি কারণে এই মাথাপিছু আয় মানদণ্ডকে পছন্দ করা হয়। **প্রথমত**, মাথাপিছু আয় ক্রমাগত বাড়লে তা নির্দেশ করে যে, দেশবাসীর মাথাপিছু দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকার্যের প্রাপ্তি বাড়ছে। **দ্বিতীয়ত**, মাথাপিছু আয় পরিমাপের ক্ষেত্রে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারকেও হিসাবের মধ্যে ধরা হয়। বিশেষত স্বল্পোন্নত দেশের ক্ষেত্রে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারকে বিবেচনা না করলে অর্থনৈতিক উন্নয়নের কোনো অর্থ হয় না। **তৃতীয়ত**, বিভিন্ন দেশের উন্নয়নের স্তর তুলনা করতে মাথাপিছু প্রকৃত আয়ের পরিমাণ বিশেষ উপযোগী। যে দেশের মাথাপিছু প্রকৃত আয় যত বেশি, সেই দেশ তত উন্নত বলে ধরা যেতে পারে।

তবে উন্নয়নের মানদণ্ড হিসাবে মাথাপিছু আয় সূচকের কতকগুলি অসুবিধা আছে। **প্রথমত**, মাথাপিছু আয় গড় হিসাব মাত্র। এই হিসাবে আয় বণ্টনকে ধরা হয় না। **দ্বিতীয়ত**, মাথাপিছু আয় বাড়লেই জীবনযাত্রার মান বাড়ে একথা সর্বদা সত্য নয়। মধ্যপ্রাচ্যের তেল রপ্তানিকারী অনেক দেশের মাথাপিছু আয় আমেরিকা ও ইউরোপের উন্নত দেশগুলির তুলনায় বেশি। কিন্তু সেই দেশগুলি তেমন উন্নত নয়। **তৃতীয়ত**, যদি মাথাপিছু আয় একই থাকে, তাহলেও দরিদ্র জনসাধারণকে জীবনধারণের মৌল প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি জোগান দিলে জীবনযাত্রার মান বাড়ে। যেমন, জনস্বাস্থ্য পরিষেবা, শিক্ষা, নিরাপদ পানীয় জল প্রভৃতির জোগান বাড়লে জীবনযাত্রার মান বাড়ে।

মাথাপিছু আয় সূচকের এই সমস্ত অসুবিধার জন্য অর্থনীতিবিদেরা বিকল্প সূচকের বা মানদণ্ডের সন্ধান করছিলেন। এঁরা কিছু সামাজিক বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিমাপ করার চেষ্টা করেছেন। অর্থনৈতিক উন্নয়নের এ ধরনের সূচককে সামাজিক সূচক (social indicators) বলা যেতে পারে। এই শ্রেণিতে রয়েছে জীবনযাত্রার বাস্তব মান উন্নয়ন সূচক (Physical Quality of Life Index বা PQLI) এবং মৌল প্রয়োজন দৃষ্টিভঙ্গি (Basic Needs Approach)। আর এই তালিকার সর্বশেষ সংযোজন হল মানব উন্নয়ন সূচক।

মানব উন্নয়নের মূলকথা হল মানুষের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির নির্বাচনের সুযোগ বা ক্ষমতা বাড়া (a process of enlarging people's choices)। মাথাপিছু আয় বা অর্থনৈতিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের (economic well being) বাইরেও মানুষের কিছু চাওয়ার থাকতে পারে। যেমন, সুস্বাস্থ্য, পরিচ্ছন্ন ভৌত পরিবেশ, রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনের নানা খুঁটিনাটি আনন্দ ও সুখ কেবলমাত্র আয়ের স্তরের উপর নির্ভর করে না। নিছক সম্পদ নয়, সম্পদের উপযুক্ত ব্যবহারই মানব উন্নয়ন নির্ধারণ করে। Mahbub-ul Haq আমাদের সতর্ক করেছেন যে, "Unless societies recognise that their real wealth is their people, an excessive obsession with creating material wealth can obscure the goal of enriching human life." তিনি বলেছেন, আমাদের ভুললে চলবে না যে, মানুষই সমাজের প্রকৃত সম্পদ। তা না হলে শুধু বস্তুগত সম্পদ তৈরির অতিরিক্ত নেশা আমাদের মানব জীবনকে সমৃদ্ধ ও সুন্দর করে তোলার মহতী লক্ষ্যকে দূরে সরিয়ে দেবে। অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কে প্রচলিত ধারণা কাটাতে তাই মানব উন্নয়নের ধারণার উপর জোর দেওয়া শুরু হয় 1980-র দশক থেকে। আর এই মানব উন্নয়ন পরিমাপ করার জন্য তৈরি করা হয় মানব উন্নয়ন সূচক (Human Development Index বা HDI)।

1990 সাল থেকে রাষ্ট্রসংঘের উন্নয়ন কর্মসূচিতে কোনো দেশের জনসাধারণের উন্নয়ন পরিমাপ করার জন্য মানব উন্নয়ন সূচক বা HDI ব্যবহার করা হচ্ছে। মানব উন্নয়ন সূচক আবার তিনটি সামাজিক নির্দেশকের গড়। এই তিনটি সামাজিক নির্দেশক হল আয়ু প্রত্যাশা, প্রাপ্তবয়স্কদের সাক্ষরতা ও শিক্ষালাভ এবং মাথাপিছু আয়। নির্দিষ্ট ভাবে বলতে গেলে, HDI হল আয়ু প্রত্যাশা সূচক, শিক্ষাগত যোগ্যতা

অর্জন সূচক এবং মাথাপিছু প্রকৃত অন্তর্দেশীয় উৎপাদন সূচকের সরল যৌগিক গড়। এই HDI-এর মান শূন্য থেকে একের মধ্যে বিরাজ করে। যে সমস্ত দেশের ক্ষেত্রে এই সূচকের মান 0.5 অপেক্ষা কম, সেই সমস্ত দেশ মানব উন্নয়নের নিম্নস্তরে রয়েছে বলে মনে করা হয়। এই সূচকের মান 0.5 থেকে 0.8-এর মধ্যে হলে মানব উন্নয়ন মধ্যম স্তরে এবং সূচকের মান 0.8-এর বেশি হলে মানব উন্নয়ন উচ্চস্তরে ঘটেছে বলে মনে করা হয়।

রাষ্ট্রসংঘ তার মানব উন্নয়ন রিপোর্টে (Human Development Report বা HDR) বিভিন্ন দেশের এরূপ সূচক নির্ণয় করে আসছে। সেই রিপোর্টগুলিতে দেখা যাচ্ছে যে, অনেক দেশের মাথাপিছু আয়ের ভিত্তিতে তুলনামূলক অবস্থান এবং মানব উন্নয়ন সূচকের ভিত্তিতে তুলনামুলক অবস্থান ভিন্নরূপ। যে সমস্ত দেশের মাথাপিছু আয়ের ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক অবস্থানের তুলনায় মানব উন্নয়ন সূচকের ভিত্তিতে অবস্থান উচ্চতর, সেই সমস্ত দেশ তাদের উন্নয়নের সুফল সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে পেরেছে বলে ধরা যেতে পারে। আবার, যে সমস্ত দেশের অবস্থান মাথাপিছু আয়ের ভিত্তিতে উপরে, কিন্তু মানব উন্নয়ন সূচকের ভিত্তিতে অপেক্ষাকৃত নীচে, সেই দেশগুলি তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুফল সমাজের দুর্বল শ্রেণির নিকট ততটা পৌঁছে দিতে পারেনি বলে ভাবা যেতে পারে।

অর্থনৈতিক উন্নয়নের সূচক হিসাবে মানব উন্নয়ন সূচক খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তবে এই সূচকেরও কিছু সীমাবদ্ধতা আছে। **প্রথমত**, মানুষের উন্নয়ন ও বঞ্চনা পরিমাপ করার জন্য এখানে মাত্র তিনটি বিষয় বিবেচনা করা হয়েছে,যথা, আয়ু, শিক্ষা এবং আয়। কিন্তু জীবনধারণের গুণ বা মান আরো অনেক বিষয়ের উপর নির্ভর করে। **দ্বিতীয়ত**, সূচকটি গঠন করার সময় বিভিন্ন উপসূচককে সমান গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। যেমন, আয়ু প্রত্যাশা সূচক, শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্জন সূচক এবং মাথাপিছু প্রকৃত অন্তর্দেশীয় উৎপাদন সূচকের সরল যৌগিক গড় হল মানব উন্নয়ন সূচক। অর্থাৎ এক্ষেত্রে প্রতিটি উপসূচকের গুরুত্ব হল। বাস্তবে, মানব উন্নয়ন নির্ধারণে এই তিনটি বিষয়ের গুরুত্ব সমান নাও হতে পারে।

তবুও আমরা বলবো যে, মানুষের জীবনযাত্রার মান পরিমাপ করার ক্ষেত্রে HDI নির্ণয় এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। এই সূচক নিছক অর্থনৈতিক উন্নয়ন বা অর্থনৈতিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের উপর জোর দেয়নি, এটি মানুষের সার্বিক উন্নয়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। উন্নয়নের অন্তিম লক্ষ্য যে মানুষের কল্যাণ, সেই বিষয়ের উপর HDI সঠিকভাবেই আলোকপাত করেছে। এখানেই সূচকটির উৎকর্ষ ও সার্থকতা।

৭.৪ মানব উন্নয়নের বিভিন্ন ভাগ

Mahbub ul Haq এর তথ্য অনুযায়ী মানব উন্নয়নের চারটি প্রয়োজনীয় ভাগ আছে।

(1) সমতা (2) স্থায়িত্ব (3) উৎপাদনশীলতা (4) ক্ষমতায়ন।

(1) সমতা : অর্থনৈতিক সম্পদের অসমবন্টন যথাসম্ভব কমাতে হবে। প্রত্যেক মানুষের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধাতে সমঅধিকার থাকা দরকার। বিভিন্ন অর্থনৈতিক কাঠামোতে ক্ষমতার বিন্যাস সমভাবে হওয়া দরকার। ভূমি সংস্কার হলো একটি অর্থনৈতিক পদ্ধতি যার মাধ্যমে কৃষি জমির মালিকানা এবং ক্ষমতার পুনর্বিন্যাস সম্ভব হয়। এছাড়া আর্থিক নীতিরও পুনর্বিন্যাস যারফলে ধনীদের থেকে সম্পদ গরীবের দিকে যায় ঋণদান পদ্ধতিরও পুনর্বিন্যাস যার ফলে গরীব কৃষক এবং ছোটো ব্যবসায়ীরা কম সুদে ঋণ পেতে পারে। নারীদের সমঅধিকারে সুযোগ দান এবং সমক্ষমতা প্রদান। এইগুলির মাধ্যমে সমতা আসতে পারে এবং মানব উন্নয়নে সহায়ক হতে পারে।

(2) স্থায়িত্ব : মানব উন্নয়নের একটি প্রয়োজনীয় দিক হলো পরের প্রজন্ম তাদের অস্তিত্ব এবং উন্নয়ন যাতে সঠিকভাবে করতে পারে। মানবিক যত সুবিধা ও সুযোগ আছে তার স্থায়িত্ব বজায় রাখতে হবে।

(3) উৎপাদনশীলতা : মানুষের জন্য বিনিয়োগ খুব গুরুত্বপূর্ণ মানুষের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করার জন্য। অর্থনৈতিক বিকাশ এই মানবিক উন্নয়নের একটি অংশ। মানুষের দক্ষতা, কর্মক্ষমতা, উৎপাদনশীলতা অর্থনৈতিক বিকাশের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। অন্যান্য অংশগুলি হল সমতা ক্ষমতায়ন ইত্যাদি।

(4) ক্ষমতায়ন : মানবিক উন্নয়ন মানুষের ক্ষমতায়ন এর উপর নির্ভর করে। এখানে মানুষের ইচ্ছাশক্তি খুব প্রয়োজনীয়। রাজনৈতিক এবং সামাজিক গণতন্ত্র একান্ত জরুরী। শিক্ষার বিস্তার ও এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয়। তাই শিক্ষাক্ষেত্রে বিনিয়োগ প্রয়োজন। একটা সহায়ক পরিবেশ দরকার যেখানে মানুষজন ব্যাঙ্ক ঋণ নিতে পারবে এবং বিনিয়োগে সহায়তা করতে পারবে।

৭.৫ মানব উন্নয়ন সূচক ও তার গঠন

রাষ্ট্রসঙ্ঘের উন্নয়ন কর্মসূচি (United Nations Development Programme বা UNDP) অনুযায়ী 1990 সাল থেকে প্রতি বছর মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন (Human Development Report) প্রকাশ করা হয়। এতে বিভিন্ন দেশের উন্নয়নের মাত্রা তুলনা করার জন্য একটি মানব উন্নয়ন সূচক বা সংক্ষেপে HDI (Human Development Index) তৈরি করা হয়। জনসাধারণের প্রত্যাশিত আয়ু, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, শিক্ষা, সক্ষমতা (capability), মাথাপিছু আয়, উৎপন্ন দ্রব্যের উপর স্বত্বাধিকার (entitlement) এবং সবরকম সামাজিক সুরক্ষার (social safety net) ভিত্তিতে এই সূচক তৈরি করা হয়। এই সূচক তৈরির পিছনে অর্থনীতিবিদ মাহবুব-উল-হকের প্রচেষ্টা এবং অমর্ত্য সেনের প্রেরণা অনেকখানি কাজ করেছে।

UNDP-র প্রতিবেদনে মানব উন্নয়ন সূচকের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে যে, মানব উন্নয়ন সূচক হল "a composite index measuring average achievement in three basic dimensions of human development — a long and healthy life, knowledge and a decent standard of living." দেখা যাচ্ছে যে, মানব উন্নয়ন সূচক তিনটি ক্ষেত্রে মানব উন্নয়নের গড় সাফল্য বিবেচনা করে। এই তিনটি ক্ষেত্র হল : (i) একটি দীর্ঘ ও স্বাস্থ্যবান জীবন যা প্রত্যাশিত আয়ু সূচকের দ্বারা মাপা হয় (ii) জ্ঞান যা শিক্ষা সূচকের দ্বারা মাপা হয় এবং (iii) একটি সন্তোষজনক জীবনযাত্রার মান যা স্থূল অভ্যন্তরীণ উৎপাদন সূচক দ্বারা পরিমাপ করা হয়। তাই HDI তৈরি করার জন্য তিন ধরনের তথ্যের প্রয়োজন : (i) জন্মকালে প্রত্যাশিত গড়পড়তা আয়ু, (ii) শিক্ষার মান, যা মাপা হয় সাক্ষরতার হার ও স্কুলে ভর্তির হারের সাহায্যে এবং (iii) মাথাপিছু জাতীয় আয় এবং অভ্যন্তরীণ জাতীয় উৎপাদন (GDP)। এই তিন ধরনের তথ্য ব্যবহার করে তিনটি উপসূচক তৈরি করা হয়, যথা, প্রত্যাশিত আয়ু সূচক (life expectancy index), শিক্ষা সূচক (education index) এবং স্থূল অভ্যন্তরীণ উৎপাদন সূচক (Gross Domestic Product Index)। মানব উন্নয়ন সূচক হল এই তিনটি উপসূচকের যৌগিক গড়। এখন এই উপসূচকগুলি কীভাবে তৈরি করা যায় দেখা যাক।

এই উপসূচকগুলির যেকোনো একটি সূচক তৈরি করতে হলে জানতে হবে দেশে সংশ্লিষ্ট বিষয়টির প্রকৃত মূল্য কত এবং তার সর্বোচ্চ মূল্য ও সর্বনিম্ন মূল্য কত হওয়া উচিত। উপসূচক তৈরি করা হয় নিম্নলিখিত সূত্রের সাহায্যে।

$$\text{সংশ্লিষ্ট সূচক} = \frac{\text{[illegible]}}{\text{[illegible]}}$$

2003 সালের মানব উন্নয়ন প্রতিবেদনে 2001 সালের মানব উন্নয়ন সূচক হিসাব করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন নির্দেশকের (indicators) নিম্নলিখিত মান ধরা হয়েছিল :

নির্দেশক	**সর্বাধিক মান**	**সর্বনিম্ন মান**
জন্মকালে প্রত্যাশিত আয়ু (বছরে)	85	25
প্রাপ্তবয়স্ক সাক্ষরতার হার	100	0
প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও তৃতীয় স্তরে মোট ভর্তির অনুপাত (%)	100	0
মাথাপিছু স্থূল অভ্যন্তরীণ উৎপাদন (মার্কিন ডলারের ক্রয়ক্ষমতার সমতার (PPP$) ভিত্তিতে)	40,000	100

এই সমস্ত মানের ভিত্তিতে বিভিন্ন উপসূচকের মান হিসাব করা হয়।

(1) **প্রত্যাশিত আয়ুসূচক :** 2001 সালে ভারতের জনসাধারণের প্রত্যাশিত আয়ু ছিল 63.3। তাহলে ভারতের ক্ষেত্রে ওই বছর প্রত্যাশিত আয়ুসূচক : $L = \frac{63.3 \quad 25}{85 \quad 25} \quad 0.64$ (oppr)

(2) **শিক্ষা সূচক :** এক্ষেত্রে প্রথমে প্রাপ্তবয়স্ক সাক্ষরতার হার হিসাব করা হয়। এরপর সম্মিলিতভাবে মোট ভর্তির অনুপাত বা প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও তৃতীয় ক্ষেত্রের সূচক হিসাব করা হয়। এই দুটির গুরুত্বশীল গড় হল শিক্ষা সূচক। প্রাপ্তবয়স্ক সাক্ষরতার সূচককে $2/3$ এবং দ্বিতীয় সূচককে $1/3$ গুরুত্ব দেওয়া হয়। নীচে উদাহরণ দেওয়া হল :

প্রাপ্তবয়স্ক সাক্ষরতার সূচক $= A \quad \frac{a \quad 0}{100 \quad 0} \qquad \frac{a}{100}$ যেখানে a হল প্রাপ্তবয়স্ক সাক্ষরতার হার। যেমন 2001 সালে ভারতের প্রাপ্তবয়স্ক সাক্ষরতার সূচক $= \frac{58 \quad 0}{100 \quad 0} \quad 0.58$

সম্মিলিত প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং তৃতীয় স্তরের শিক্ষা ক্ষেত্রে মোট ভর্তির সূচক

$$= GE \quad \frac{e \quad 0}{100 \quad 0} \quad \frac{56}{100} \quad 0.56$$

সুতরাং শিক্ষা সূচক, $E \quad \frac{2}{3} \quad A \quad \frac{1}{3} \quad GE$

$$\frac{2}{3} \quad 0.58 \quad \frac{1}{3} \quad 0.56 \quad 0.57$$

(3) **স্থূল অভ্যন্তরীণ উৎপাদন সূচক :** মানব উন্নয়ন সূচকে যে দীর্ঘ ও স্বাস্থ্যবান জীবনের এবং শিক্ষা ও জ্ঞানের কথা বলা হয়েছে তা মূলত আয়ের উপর নির্ভরশীল। এর জন্য স্থূল অভ্যন্তরীণ উৎপাদন সূচক নির্ণয় করা হয়। এই উদ্দেশ্যে আয়ের লগারিদম ব্যবহার করা হয়। ভারতে 2001 সালে মাথাপিছু আয় (মার্কিন ডলারের ক্রয়ক্ষমতার সমতার ভিত্তিতে) ছিল 2840 ডলার। সুতরাং ভারতের স্থূল অভ্যন্তরীণ উৎপাদন সূচক (GDP Index) $\frac{\log 2840 \quad \log 100}{\log 40{,}000 \quad \log 100} \quad 0.56$

এখন, মানব উন্নয়ন সূচক হল আয়ু সূচক, শিক্ষা সূচক এবং স্থূল অভ্যন্তরীণ উৎপাদন সূচকের সরল যৌগিক গড়। সুতরাং, মানব উন্নয়ন সূচক $= \frac{1}{3} \quad L \quad \frac{1}{3} \quad GE \quad \frac{1}{3} \quad$ GDP. Index

ভারতের উদাহরণ অনুযায়ী 2001 সালে ভারতের

$$HDI = \frac{1}{3} \quad 0.64 \quad \frac{1}{3} \quad 0.57 \quad \frac{1}{3} \quad 0.56 \quad 0.59 \quad (appr)$$

এই মানব উন্নয়ন সূচকের মান সর্বাধিক 1 এবং সর্বনিম্ন শূন্য। কোনো দেশের সূচকের মান 0.8-এর বেশি হলে সেই দেশের মানব উন্নয়ন সূচক উত্তম বা দেশটি প্রথম শ্রেণিভুক্ত বলা হয়। আর যদি সূচকের মান 0.5 থেকে 0.8-এর মধ্যে থাকে তবে সেই দেশের মানব উন্নয়ন সূচক মধ্যম বা দেশটি দ্বিতীয় শ্রেণিভুক্ত বলা হয়। আর যদি সূচকের মান 0.5 অপেক্ষা কম হয় তাহলে এর মানব উন্নয়ন সূচক অধম বা দেশটি তৃতীয় শ্রেণিভুক্ত বলা হয়। 2010 সালে ভারতের HDI ছিল 0.645 অর্থাৎ ভারতের মানব উন্নয়ন মধ্যম স্তরের। 2019 সালের HDI অনুযায়ী 189টি দেশের মধ্যে ভারতের ক্রমিক অবস্থান ছিল 131 তম।

৭.৬ ভারতে শিক্ষার বিস্তার

(নয়া) ধ্রুপদী তত্ত্বে উৎপাদনের প্রধান দুটি উপাদান হল মূলধন ও শ্রম। এই শ্রমকে আমার মানব মূলধন বলতে পারি। এর মধ্যে রয়েছে শ্রমিকের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, অভিজ্ঞতা, ট্রেনিং প্রভৃতি। এগুলির পরিমাণ ও মান বাড়লে মূলধনকে আরো দক্ষ ও কার্যকরী ভাবে ব্যবহার করা যায়। ফলে ফার্মের উৎপাদনশীলতা বাড়ে এবং তা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সাহায্য করে। শ্রমিকের শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতির জন্য বিনিয়োগকে তাই বলা হয় মানব মূলধন গঠন। আমরা বর্তমান এককে ভারতে শিক্ষাক্ষেত্র ও স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে অগ্রগতি বিচার করবো। প্রথমে আমরা শিক্ষা ক্ষেত্রে ভারতের প্রসার বা অগ্রগতি বিবেচনা করব।

1951 সাল থেকে প্রায় 40 বছর ধরে ভারতের শিক্ষাখাতে ব্যয় ছিল GDP-র নগণ্য অংশ। 2007 সালে শিক্ষাখাতে ব্যয় হয়েছিল GDP-র মাত্র 3.2 শতাংশ যদিও লক্ষ্যমাত্রা ছিল 6 শতাংশ। এর আগে 1964 সালে শিক্ষা ব্যবস্থায় সামগ্রিক সমীক্ষার জন্য কোঠারি কমিশন গঠন করা হয়। এই কমিশনের রিপোর্টের (1966) ভিত্তিতে সরকার 1968 সালে জাতীয় শিক্ষানীতি (National Education Policy, 1968) ঘোষণা করে। এই শিক্ষানীতিতে 14 বছর পর্যন্ত বয়স্ক শিশুদের বাধ্যতামূলক এবং অবৈতনিক শিক্ষার কথা বলা হয়। এরপর 1986 সালে ঘোষিত হয় National Policy on Education বা শিক্ষা সম্পর্কে জাতীয় নীতি। 1992 সালে এর কিছু সংশোধন করা হয়। সংশোধন-সহ এই জাতীয় শিক্ষানীতির মূল গৃহীত ব্যবস্থাগুলি ছিল নিম্নরূপ :

1. মাধ্যমিক ক্ষেত্রে বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রবর্তন,
2. দেশের বিভিন্ন স্থানে উচ্চমানের শিক্ষাকেন্দ্র ও গবেষণাকেন্দ্র স্থাপন,
3. কারিগরি, চিকিৎসা ও কৃষিভিত্তিক শিক্ষার প্রসার,
4. বহু সংখ্যক কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন,
5. কারিগরি শিক্ষার প্রসারের উদ্দেশ্যে গ্রামীণ এলাকায় পলিটেকনিক কলেজ স্থাপন,

6. গ্রামীণ এলাকায় শিক্ষার প্রসারের জন্য জাতীয় গ্রামীণ উচ্চতর শিক্ষা সংসদ (National Rural Higher Education Council) প্রতিষ্ঠা,
7. বয়স্ক ও মহিলার শিক্ষার জন্য বিশেষ কর্মসূচি,
8. মহিলাদের শিক্ষার প্রসারের জন্য মহিলা শিক্ষা সংসদ (Women Education Council) স্থাপন,
9. নিরক্ষরতা দূর করতে জাতীয় সাক্ষরতা কমিশন (National Literacy Commission বা NLC) স্থাপন,
10. গ্রামীণ এলাকার বুদ্ধিমান ছাত্রদের আধুনিক শিক্ষা প্রদানের উদ্দেশ্যে নবোদয় বিদ্যালয় স্থাপন,
11. বদলির চাকরিতে কর্মরত কর্মচারীদের সন্তানদের জন্য কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় স্থাপন প্রভৃতি

এছাড়া, সাধারণ শিক্ষার প্রসারের জন্য সরকার কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। এদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হল :

1. 2001 সালে (6-14) বছরের সমস্ত বালক -বালিকাকে প্রাথমিক শিক্ষাদানের জন্য চালু হয় সর্বশিক্ষা অভিযান (Sarva Siksha Abhijan বা SSA)।
2. 2010 সালের 1 এপ্রিল থেকে কার্যকর হয় Right to Education Act (RTE Act, 2010)।
3. মাধ্যমিক শিক্ষার প্রসারের জন্য চালু হয় Rashtriya Madhyamik Siksha Abhijan (RMSA)।
4. ছাত্র ভর্তি বাড়াতে এবং তাদের পুষ্টির জোগান দিতে স্কুলগুলিতে চালু হয় National Programme of Mid-Day Meals.
5. Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya (KGBV) চালু হয় SC, ST , OBC এবং সংখ্যালঘু ছাত্রীদের জন্য। এগুলি আবাসিক (Residential) বিদ্যালয়।
6. দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে মডেল স্কুল স্থাপন, এবং
7. শিক্ষায় পিছিয়ে থাকা অঞ্চলে শিক্ষার প্রসারের জন্য ছাত্রীনিবাস স্থাপন।

এছাড়া, সাম্প্রতিক বছরগুলিতে সরকারের শিক্ষা খাতে ব্যয় বেড়েছে। শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে নানান সুযোগ-সুবিধা (স্কলারশিপ এবং বেতন মকুব) অনেক বেড়েছে। এর ফলে ছাত্রসংখ্যা বেড়েছে, স্কুলছুট কমেছে এবং সাক্ষরতার হার বেড়েছে। 2011 সালে ভারতে সাক্ষরতার হার ছিল 74 শতাংশ। 2021 সালে তা 80 শতাংশ ছাড়িয়ে গেছে।

৭.৭ ভারতে শিক্ষাক্ষেত্রে অগ্রগতির মূল্যায়ন

1980-র দশক থেকে শিক্ষার বিস্তারের জন্য ভারত সরকার নানা ব্যবস্থা গ্রহণ করে চলেছে। এর ফলে অবশ্যই দেশে শিক্ষার প্রসার ঘটেছে। কিন্তু সাফল্যের পাশাপাশি শিক্ষাক্ষেত্রে নানা ব্যর্থতাও রয়েছে। সংক্ষেপে সেগুলি আমরা নীচে উল্লেখ করছি :

1. সর্বজনীন বুনিয়াদি শিক্ষার লক্ষ্য এখনও পূরণ হয়নি।
2. ভারতে সাক্ষরতার হার বেড়েছে তা ঠিক। কিন্তু সংখ্যার বিচারে পৃথিবীতে নিরক্ষরের সংখ্যা ভারতে সর্বাধিক।
3. ভারতের অধিকাংশ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক সরকারি স্কুলের গুণগত মান খুবই খারাপ। এসমস্ত স্কুলে শিক্ষক, সাজসরঞ্জাম, শ্রেণিকক্ষ এবং নানা পরিকাঠামোর অভাব।
4. ভারতে সাধারণ শিক্ষার মান নিম্ন, এবং তা দিন দিন আরও কমছে।
5. ভারতে স্কুলছুটের হার যথেষ্ট বেশি।
6. মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে বৃত্তিমূলক শিক্ষার বিশেষ প্রসার ঘটেনি।
7. শিক্ষা ক্ষেত্রে বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে এবং একই রাজ্যের মধ্যে গ্রাম ও শহরের মধ্যে নানা ধরনের অসমতা রয়েছে।
8. শিক্ষাক্ষেত্রে সরকারের ব্যয় বাড়লেও তা প্রয়োজনের তুলনায় কম।

বর্তমানে সরকার অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো শিক্ষাক্ষেত্রেও বেসরকারি পুঁজি আহ্বান করছে। সেক্ষেত্রে আশঙ্কা হয় যে, শিক্ষা পরিষেবা নিম্নবিত্ত ও দরিদ্র মানুষের নাগালের বাইরে চলে যাবে।

৭.৮ ভারতে স্বাস্থ্যক্ষেত্রের প্রসার বা অগ্রগতি

দেশে স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নতি ঘটলে শ্রমিকেরও স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটে। তাদের উৎপাদনশীলতা বাড়ে। ফলে দেশের জাতীয় উৎপাদন ও জীবনযাত্রার মানে উন্নতি ঘটে। পরিকল্পনাকালে (1951-2017) ভারত সরকার স্বাস্থ্যক্ষেত্রের উন্নতির জন্য নানা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। এর ফলে ভারতের স্বাস্থ্যক্ষেত্রের যথেষ্ট অগ্রগতি ঘটেছে। স্বাস্থ্যক্ষেত্রের সাফল্যগুলিকে সংক্ষেপে নিম্নলিখিত ভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে :

(i) জন্মকালে প্রত্যাশিত আয়ু যথেষ্ট বেড়েছে। 1970 সালে একজন ভারতীয়ের গড় আয়ু ছিল 48 বছর। 2011 সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় প্রায় 67 বছর আর 2021 তা প্রায় 70 বছর।

(ii) মৃত্যুহার উল্লেখযোগ্য ভাবে কমেছে। 1971 সালে প্রতি হাজারে মৃত্যুর হার ছিল 14.9, আর 2011 সালে তা 7.1-এ নেমে আসে।

(iii) শিশুমৃত্যুর হারও যথেষ্ট কমেছে। 1971 সালে প্রতি হাজার নবজাতকে 129 ছিল শিশুমৃত্যুর সংখ্যা। 2011 সালে তা 44-এ নেমে আসে।

(iv) প্রসূতি মৃত্যুর হারও অনেক কমেছে। 2010 সালে প্রতি লাখ নবজাতকের ক্ষেত্রে প্রসবকালীন মৃত্যুর সংখ্যা ছিল 200; আর 2016-18 সময়কালে তা 113তে নেমে আসে।

এই তথ্যগুলি ভারতের স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে সাম্প্রতিক অগ্রগতি বা সাফল্য নির্দেশ করছে। তবে সাফল্যের পাশাপাশি নানা দুর্বলতাও আছে। সংক্ষেপে সেগুলি নিম্নরূপ :

(i) ভারতের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সুযোগ-সুবিধার অধিকাংশ শহরাঞ্চলে কেন্দ্রীভূত। আধুনিক চিকিৎসার সুবিধা থেকে গ্রামের লোকেরা অনেকাংশে বঞ্চিত। যার ফলে, মৃত্যুহার, শিশুমৃত্যুর হার, শিশু এবং গর্ভবতী মায়েদের রক্তাল্পতা ইত্যাদি সব বিচারে গ্রামীণ জনসাধারণের অবস্থা শহরবাসীদের তুলনায় খারাপ।

(ii) যক্ষা, বসন্ত ও কলেরা বাদ দিলে কিছু সংক্রামক রোগ এখনও নিয়ন্ত্রণ করা যায়নি। AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome), HIV (Human Immuno-deficiency Virus) এবং SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome) প্রভৃতি সাম্প্রতিক সময়ের সংক্রামক রোগ দিন দিন বেড়েই চলেছে।

(iii) ভারতে সম্প্রতি অনেক স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে কিন্তু সেগুলির অনেক ক্ষেত্রেই উপযুক্ত সংখ্যক ডাক্তার ও সাজসরঞ্জাম নেই। গ্রামীণ ক্ষেত্রে একথা বিশেষভাবে সত্য। ফলে গ্রামীণ দরিদ্রদের সামর্থ্যের বাইরে খরচ করে শহরে এসে চিকিৎসা করতে হয় অথবা বিনা চিকিৎসাতেই পড়ে থাকতে হয়। তাই শহরের তুলনায় গ্রামে মৃত্যুহার বেশি।

(iv) উন্নত দেশগুলির তুলনায় ভারতে জাতীয় আয়ের স্বল্প অংশই স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে ব্যয়িত হয়। উন্নত দেশগুলিতে যেখানে জাতীয় আয়ের 10 শতাংশ বা তার বেশি স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে ব্যয়িত হয়, ভারতে সেখানে জাতীয় আয়ের 4 শতাংশেরও কম স্বাস্থ্য খাতে ব্যয়িত হয়।

(v) একথা ঠিক যে, পরিকল্পনাকালে ভারতের গড় আয়ু বেড়েছে, মৃত্যুহার কমেছে, শিশুমৃত্যুর হার কমেছে, প্রসূতি মৃত্যুর হার কমেছে ইত্যাদি। কিন্তু এই বিষয়গুলিতে ভারত অনেক স্বল্পোন্নত বা উন্নয়নশীল দেশের থেকেও অনেক পিছিয়ে আছে। সুতরাং, স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে আপেক্ষিক বিচারে ভারত অনেক পিছিয়ে।

৭.৯ স্বাস্থ্যক্ষেত্রের উন্নতিকল্পে সরকারি ব্যবস্থা

ভারতের স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে নানা দুর্বলতা ও সীমাবদ্ধতা রয়েছে। সেই সীমাবদ্ধতাগুলি দূর করার জন্য ভারত সরকার বিভিন্ন সময়ে নানা কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। সংক্ষেপে সেগুলি নিম্নরূপ :

1. 2013 সালে চালু হয় National Health Mission (NHM)। উপযুক্ত মানের স্বাস্থ্য পরিষেবা সকলের কাছে পৌঁছে দেওয়াই এই কর্মসূচির উদ্দেশ্য। 2005 সালে গ্রামীণ জনসংখ্যার জন্য গৃহীত হয়েছিল National Rural Health Mission (NRHM)। আর 2013 সালে শহরের লোকেদের জন্য চালু হয়েছিল National Urban Health Mission (NUHM)। এই দুটি প্রকল্পকে একত্রিত করেই চালু হয় NHM কর্মসূচি।
2. 2005 সালে চালু হয় Janani Suraksha Yojona (JSY)। এর উদ্দেশ্য হল প্রসূতি এবং নবজাতকের মৃত্যুর হার কমানো।
3. 2003 সালে ভারত সরকার ঘোষণা করে Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojona (PMSSY)। এর উদ্দেশ্য হল দেশে চিকিৎসা এবং চিকিৎসা সংক্রান্ত শিক্ষার মান বাড়ানো। এর জন্য AIIMS (All India Institute of Medical Sciences)-এর ন্যায় উন্নত মানের মেডিক্যাল কলেজ স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।
4. 2014 সালে 2 অক্টোবর গৃহীত হয় Swachh Bharat Mission (Gramin)। এর উদ্দেশ্য হল গ্রামাঞ্চলে শৌচালয় নির্মাণ করা এবং খোলা জায়গায় মলত্যাগ বন্ধ করা।
5. গ্রামীণ জনগণের স্বাস্থ্য সচেতনতা বাড়াতে নানা উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই কাজে ASHA (Accredited Social Health Activist) এবং অঙ্গনওয়ারি (Anganwadi) কর্মীদের যুক্ত করা হয়েছে।
6. ভারতের স্বাস্থ্য ক্ষেত্রের উন্নতির জন্য আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি হল :
   (i) Rivised National Tuberculosis Control Programme (RNTCP),
   (ii) National Vector Borne Disease Control Programme (NVBDCP),
   (iii) National Programme for Control of Blindness (NPCB),
   (iv) National Leprosy Eradication Programme (NLEP),
   (v) National AIDS Control Programme (NACP), এবং
   (vi) শিশুদের পুষ্টি ও বিকাশের জন্য 1975 সালে চালু হয় সুসংহত শিশু বিকাশ পরিষেবা (Integrated Child Development Services বা ICDS)।

তবে এসব খাতে ব্যয়িত টাকার পরিমাণ প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট কম। সরকারকে স্বাস্থ্য খাতে ব্যয় বরাদ্দ বাড়াতে হবে। তাছাড়া, স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রে গ্রাম ও শহরের মধ্যে বৈষম্য দূর করতে হবে। ASHA কর্মীদের ট্রেনিং দিয়ে গ্রামীণ এলাকায় মৌল স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদান করতে হবে। প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে পরিষেবা উন্নত করতে হবে। তা না হলে শহরের বড় হাসপাতালগুলিতে গ্রাম থেকে আসা রোগীর স্রোত বন্ধ করা যাবে না। আর তার ফলে শহরের হাসপাতালগুলিতেও রোগী পরিষেবার মান দিন দিন কমতে থাকবে।

৭.১০ মানব উন্নয়ন সূচকের ক্ষেত্রে ভারতের অগ্রগতি ও সমস্তরের দেশের সাথে তুলনা

আমরা জানি যে, মানব উন্নয়ন সূচক (Human Development Index বা HDI) হল আয়ু প্রত্যাশা সূচক, শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্জন সূচক এবং মাথাপিছু প্রকৃত অন্তর্দেশীয় উৎপাদন সূচকের সরল যৌগিক গড়। এই সূচকের মান শূন্য থেকে একের মধ্যে বিরাজ করে। কোনো দেশের ক্ষেত্রে এই সূচকের মান 0.5 অপেক্ষা কম হলে সেই দেশটি মানব উন্নয়নের নিম্নস্তরে রয়েছে বলে ধরা হয়। আর সূচকের মান 0.5 থেকে 0.8-এর মধ্যে হলে দেশটির মানব উন্নয়ন মধ্যম স্তরে এবং সূচকের মান 0.8-এর বেশি হলে দেশটির মানব উন্নয়ন উচ্চস্তরে ঘটেছে বলে ধরা হয়। 3.5 নং সারণিতে আমরা ভারতের HDI-এর মানের গতিপ্রকৃতি দেখিয়েছি 1990 থেকে 2019 সাল পর্যন্ত। সারণি থেকে দেখা যাচ্ছে যে, মোটামুটি ভাবে 2000 সাল পর্যন্ত ভারতের HDI-এর মান ছিল 7.1-এর নীচে। সুতরাং 2000 সাল পর্যন্ত ভারতের মানব উন্নয়ন নিম্নস্তরে ছিল। এরপর স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও আয়ু সূচকের উন্নতি ঘটার ফলে ভারতের HDI-এর মান 0.5-এর সীমা অতিক্রম করে। 2019 সালে ভারতের HDI-এর মান ছিল 0.645 অর্থাৎ ভারতের মানব উন্নয়ন হল মধ্যম স্তরের। সারণি থেকে আরও দেখা যাচ্ছে যে, 1990-2019 সময়কালে ভারতে মানব উন্নয়নের ক্ষেত্রে অগ্রগতি ঘটেছে, তবে তা খুবই ধীর গতিতে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য

সারণি 7.1

ভারতের HDI মানের প্রবণতা

(1990-2019)

বছর	HDI-এর মান
1990	0.429
1995	0.461
2000	0.495
2005	0.536
2010	0.579
2015	0.624
2016	0.630
2017	0.640
2018	0.642
2019	0.645

সূত্র : hdr.undp.org

ও মাথাপিছু আয়ের উন্নতির উপর ভারতকে আরো জোর দিতে হবে। তবেই তার HDI-এর মানে উন্নতি ঘটবে।

সারণি 7.2

ভারতসহ সমগোত্রীয় নির্বাচিত কিছু দেশের মানব উন্নয়ন সূচক (2019)

দেশ	মানব উন্নয় সূচকের মান
শ্রীলঙ্কা	0.782
ব্রাজিল	0.765
চিন	0.761
লিবিয়া	0.724
ইন্দোনেশিয়া	0.718
ফিলিপাইনস	0.718
ভেনেজুয়েলা	0.711
মিশর	0.707
ভিয়েতনাম	0.704
ইরাক	0.674
ভুটান	0.654
ভারত	0.645
বাংলাদেশ	0.632
নেপাল	0.602
মায়ানমার	0.583
জিম্বাবোয়ে	0.571
পাকিস্তান	0.557
আফগানিস্তান	0.511
সুদান	0.510
ইথিওপিয়া	0.485

সূত্র : em.n.wikipedia.org

এখন ভারতের সমস্তরের বা সমগোত্রীয় দেশগুলির তুলনায় ভারতের HDI-এর অবস্থান কেমন, তা দেখা যাক। বিষয়টি আমরা সারণি 7.2 নং সারণিতে বিবেচনা করেছি। সারণি থেকে দেখা যাচ্ছে যে, 2019 সালের HDI-এর মানের ক্ষেত্রে ভারতের সমগোত্রীয় অনেক দেশই ভারতের থেকে এগিয়ে। এরূপ কয়েকটি দেশ হল শ্রীলঙ্কা, ব্রাজিল, চিন, লিবিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইনস, ভেনেজুয়েলা, মিশর, ভিয়েতনাম, ইরাক এবং ভুটান। এই দেশগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য শ্রীলঙ্কার নাম। 2019 সালে শ্রীলঙ্কার HDI-এর মান ছিল 0.782, যেখানে ভারতের HDI-এর মান 0.645 মাত্র। দেখা যাচ্ছে, শ্রীলঙ্কা তার সম্পদকে মানব উন্নয়নে ভারতের চেয়ে আরো সফলভাবে ব্যবহার করতে সমর্থ হয়েছে। এমনকি, ভারতের তুলনায় স্বল্পোন্নত দেশ ভুটানেরও HDI (0.654) ভারতের চেয়ে বেশি। অন্যদিকে, ভারতের কিছু সমগোত্রীয় দেশ HDI-এর বিচারে ভারত থেকে পিছিয়ে। উল্লেখযোগ্য কয়েকটি এরূপ দেশ হল বাংলাদেশ, নেপাল, মায়ানমার, জিম্বাবোয়ে এবং পাকিস্তান। আফগানিস্তান, সুদান ও ইথিওপিয়া মানব উন্নয়নের বিচারে ভারত থেকে অনেকখানি পিছিয়ে। কিন্তু আত্মতুষ্টির কিছু নেই। HDI-এর বিচারে শ্রীলঙ্কা, ইন্দোনেশিয়া, মিশর ও ভুটানের চেয়ে ভারত পিছিয়ে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, 2019 সালের HDI-এর মান অনুযায়ী 189টি দেশের মধ্যে

ভারতের ক্রমিক অবস্থান ছিল 131-তম। আর বলা বাহুল্য, ভারতের HDI-এর মান (0.645) নির্দেশ করে যে, ভারতের মানব উন্নয়ন মধ্যম স্তরের। নরওয়ে, আয়ারল্যান্ড, সুইজারল্যান্ড, জার্মানি, সুইডেন, অস্ট্রেলিয়া, নেদারল্যান্ডস, যুক্তরাজ্য, কানাডা এবং আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের 2019 সালে HDI-এর মান ছিল 0.926 বা তার উপরে। সেই স্থানে পৌঁছাতে গেলে ভারতকে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে হবে।

৭.১১ সারাংশ

১. **ভারতে শিক্ষার বিস্তার :** পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শুরু থেকে (1950-51) বর্তমান সময় পর্যন্ত ভারতের শিক্ষা ক্ষেত্রের বিপুল প্রসার ঘটেছে। সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি কারিগরি শিক্ষার সুযোগ দ্রুত হারে বেড়েছে। বর্তমান শতাব্দীর শুরু থেকে একথা বিশেষভাবে প্রযোজ্য। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা এবং ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা উভয়ই দৃঢ়ভাবে বেড়েছে। 1986 ও 1992 সালের জাতীয় শিক্ষা নীতির সুপারিশ ক্রমে ভারত সরকার শিক্ষা ক্ষেত্রে নানা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল : (i) মাধ্যমিক স্তরে বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রসার, (ii) কারিগরি শিক্ষা এবং কৃষিশিক্ষার প্রসার, (iii) বহুসংখ্যক উচ্চমানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন, (iv) বয়স্ক ও মহিলা শিক্ষা প্রসারের কর্মসূচি গ্রহণ, গ্রামীণ এলাকায় শিক্ষার প্রসারের জন্য কর্মসূচি গ্রহণ প্রভৃতি। শিক্ষার প্রসারের জন্য আরো কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ব্যবস্থা হল : (i) সর্বশিক্ষা অভিযান, (ii) রাষ্ট্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযান, (iii) স্কুলে মিড-ডে মিল প্রদান কর্মসূচি, (iv) মডেল স্কুল স্থাপন, (v) শিক্ষায় পিছিয়ে পড়া অঞ্চলে ছাত্রীনিবাস স্থাপন প্রভৃতি। এই সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে ভারতে শিক্ষা ক্ষেত্রের ব্যাপক প্রসার ও উন্নতি ঘটেছে। সাক্ষরতার হার বেড়েছে, ছাত্র ভর্তির হার বেড়েছে, স্কুলছুটের হার কমেছে ইত্যাদি।

২. **ভারতে শিক্ষা ক্ষেত্রের অগ্রগতির মূল্যায়ন :** শিক্ষাক্ষেত্রের প্রসারের জন্য ভারত সরকার নানা ব্যবস্থা গ্রহণ করে চলেছে। ফলে দেশে শিক্ষা ক্ষেত্রের যথেষ্ট অগ্রগতি ঘটেছে। তবে সাফল্যের পাশাপাশি নানা ব্যর্থতাও রয়েছে। সংক্ষেপে সেই ব্যর্থতাগুলি হল : i) সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষাদানের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ হয়নি, (ii) সাক্ষরতার হার বাড়লেও সংখ্যার বিচারে ভারতে নিরক্ষরের সংখ্যা বিশ্বে সর্বাধিক, (iii) শিক্ষার সাধারণ মান খুবই নিম্ন, (iv) অনেক স্কুলের পরিকাঠামোর মান খুবই খারাপ, (v) মাধ্যমিক ক্ষেত্রে বৃত্তিমূলক শিক্ষার অগ্রগতি অতি সামান্যই, (vi) শিক্ষা ক্ষেত্রে বেসরকারিকরণের প্রবণতা ক্রমবর্ধমান। এর ফলে শিক্ষা পরিষেবা ক্রমশই আর্থিকভাবে দুর্বল শ্রেণির নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে। ভারত সরকারকে এই সমস্ত বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি দিতে হবে।

৩. **ভারতে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রের প্রসার বা অগ্রগতি :** 1951 সালে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণের পর থেকে ভারত সরকার স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নতি ঘটাতে অনেক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। এসবের

ফলে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে যে বিশেষ সুফলগুলি পাওয়া গেছে সেগুলি হল : মৃত্যুহার কমেছে, শিশুমৃত্যুর হার কমেছে, মানুষের গড় আয়ু বেড়েছে, প্রসূতি মৃত্যুর হার কমেছে, অনেক মারণ ব্যাধির প্রকোপ কমেছে ইত্যাদি। তবে পাশাপাশি অনেক ব্যর্থতাও আছে। ভারতের স্বাস্থ্য ক্ষেত্রের উল্লেখযোগ্য ব্যর্থতাগুলি হল : গ্রাম ও শহরের মধ্যে স্বাস্থ্য পরিষেবার বণ্টনে অসাম্য, সংক্রামক রোগ প্রতিরোধে ব্যর্থতা, স্বাস্থ্য ক্ষেত্রের অদক্ষ পরিচালন ব্যবস্থা এবং স্বাস্থ্য আধিকারিকের অভাব, স্বাস্থ্য খাতে প্রয়োজনের তুলনায় স্বল্প ব্যয়, সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলির নিম্নমানের রক্ষণাবেক্ষণ, আন্তর্জাতিক স্তরে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে ভারতের পশ্চাৎপদ অবস্থা প্রভৃতি।

৪. **স্বাস্থ্য ক্ষেত্রের উন্নতিকল্পে সরকারি ব্যবস্থা :** ভারতের স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে নানা দুর্বলতা ও সীমাবদ্ধতা রয়েছে। এই সীমাবদ্ধতাগুলি দূর করতে ভারত সরকার বিভিন্ন সময়ে নানা প্রকল্প বা কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল : National Health Mission (NHM) কর্মসূচি গ্রহণ, Janani Suraksha Yojana (JSY), Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojana (PMSSY), National AIDS Control Programme (NACP) প্রভৃতি। এসবের ফলে ভারতের স্বাস্থ্য ক্ষেত্র তার দুর্বলতাগুলি কিছুটা কাটিয়ে উঠেছে। সরকারি স্বাস্থ্য ক্ষেত্রের উন্নতি না ঘটলে বেসরকারি ক্ষেত্রের দাপট বাড়বে এবং স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে বেসরকারি পুঁজির অনুপ্রবেশ ঘটবে। তখন স্বাস্থ্য পরিষেবার দাম ভীষণ বেড়ে যাবে। তখন সাধারণ চিকিৎসার পরিষেবাও দরিদ্রদের নাগালের বাইরে চলে যাবে। ভারতের স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে সেই সম্ভাবনা যেন দিন দিন উজ্জ্বল হয়ে উঠছে।

৫. **মানব উন্নয়ন ও মানব উন্নয়ন সূচক :** মানব উন্নয়নের মূল কথা হল মানুষের জীবনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির নির্বাচনের সুযোগ বা ক্ষমতা বাড়া। অর্থনৈতিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের বাইরেও মানুষের কিছু চাওয়ার থাকে, যেমন, সুস্বাস্থ্য, পরিচ্ছন্ন ভৌত পরিবেশ, রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনের নানা কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ প্রভৃতি। এককথায় বলতে গেলে, নিছক সম্পদ নয়, সম্পদের উপযুক্ত ব্যবহারই মানব উন্নয়ন নির্ধারণ করে। এই মানব উন্নয়ন পরিমাপ করার জন্য যে সূচক ব্যবহার করা হয় তাই-ই হল মানব উন্নয়ন সূচক (Human Development Index বা HDI)। 1990 সাল থেকে রাষ্ট্রসংঘের উন্নয়ন কর্মসূচি বিভিন্ন দেশের ক্ষেত্রে এই HDI পরিমাপ করে আসছে। HDI হল আয়ু প্রত্যাশা সূচক, শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্জন সূচক এবং মাথাপিছু প্রকৃত অন্তর্দেশীয় উৎপাদন সূচকের সরল যৌগিক গড়। এই সূচকের মান শূন্য থেকে একের মধ্যে বিরাজ করে। যে সমস্ত দেশের ক্ষেত্রে এই সূচকের মান 0.5 অপেক্ষা কম, সেই সমস্ত দেশ মানব উন্নয়নের নিম্নস্তরে রয়েছে বলে মনে করা হয়। আর সূচকের মান 0.5 থেকে 0.8-এর মধ্যে হলে মানব উন্নয়ন মধ্যম স্তরে এবং সূচকের মান 0.8-এর বেশি হলে মানব উন্নয়ন উচ্চ স্তরে ঘটেছে বলে মনে করা হয়।

৬. **মানব উন্নয়ন সূচকের ক্ষেত্রে ভারতের অগ্রগতি ও সমস্তরের দেশের সাথে তুলনা :** 1990 সাল থেকে 2019 সাল পর্যন্ত ভারতের মানব উন্নয়ন সূচকের মান থেকে দেখা যাচ্ছে যে, সময়ের অগ্রগতির সাথে সাথে ভারতের মানব উন্নয়ন সূচকের মানে উন্নতি ঘটেছে। তবে সেই উন্নতি বা অগ্রগতি খুব ধীরে ঘটেছে। আর সমগোত্রীয় দেশগুলির সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যাচ্ছে যে, ভারতের সমগোত্রীয় বেশ কিছু দেশ মানব উন্নয়নের বিচারে ভারতের থেকে এগিয়ে রয়েছে।

৭.১২ অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত উত্তরের প্রশ্নাবলি

১. মানব মূলধন গঠন বলতে কী বোঝ?

২. ভারতে নবোদয় বিদ্যালয় কেন স্থাপন করা হয়?

৩. ভারতে কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় স্থাপন করার মুখ্য উদ্দেশ্য কী?

৪. Mid-day Meal কর্মসূচির প্রধান উদ্দেশ্য কী?

৫. ভারতের স্বাস্থ্য ক্ষেত্র সম্পর্কিত PMSSY ও NACP-র পুরো নাম বল।

৬. AIDS এবং HIV-র পুরো কথাগুলি কী কী?

৭. NHM এবং ASHA-র পুরো নাম বল।

৮. ICDS এবং MDM-এর পুরো নাম কী?

৯. মানব উন্নয়ন সূচক কী?

১০. মানব উন্নয়ন সূচক কে প্রকাশ করে?

১১. মানব উন্নয়ন সূচকের গঠনে ব্যবহৃত উপ-সূচকগুলি কী কী?

১২. মানব উন্নয়ন সূচক তৈরিতে কার অবদান সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য?

মাঝারি উত্তরের প্রশ্নাবলি

১. ভারতে শিক্ষা ক্ষেত্রের অগ্রগতির মূল্যায়ন কর।

২. ভারতের স্বাস্থ্য ক্ষেত্রের কয়েকটি সমস্যার উল্লেখ কর।

৩. ভারতের স্বাস্থ্য ক্ষেত্রের অগ্রগতি বিচার কর।

৪. মানব উন্নয়নের ধারণাটি ব্যাখ্যা কর।

৫. মানব উন্নয়নের সূচক ব্যাখ্যা কর।

দীর্ঘ উত্তরের প্রশ্নাবলি

১. ভারতে শিক্ষা ক্ষেত্রের বিস্তার সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ লেখ।

২. ভারতে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রের উন্নতির জন্য সরকার গৃহীত ব্যবস্থাগুলি উল্লেখ কর।

৩. মানব উন্নয়ন সূচক কী? এই সূচকের গঠন পদ্ধতি বর্ণনা কর।

৪. মানব উন্নয়ন সূচকের ক্ষেত্রে ভারতের অগ্রগতির মূল্যায়ন কর।

৫. মানব উন্নয়নের বিভিন্ন ভাগগুলি ব্যাখ্যা কর।

সঠিক উত্তরের প্রশ্নাবলী (MCQ)

১. মানব উন্নয়ন সূচক তৈরী হয়

(ক) অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিমাপ করার জন্য
(খ) মানব উন্নয়ন পরিমাপ করার জন্য
(গ) জমির উন্নয়ন পরিমাপ করার জন্য
(ঘ) কোনোটিই নয়

২. National Health Mission তৈরী হয়

(ক) 2020 সালে (খ) 2013 সালে
(গ) 2010 সালে (ঘ) কোনোটিই নয়

৩. Swachh Bharat Mission এর উদ্দেশ্য কি?

(ক) গ্রামাঞ্চলে বাসস্থান তৈরী করা (খ) গ্রামাঞ্চলে শৌচালয় স্থাপন করা
(গ) গ্রামাঞ্চলে ব্যাঙ্ক তৈরী করা (ঘ) কোনোটিই নয়

৪. মানব উন্নয়ন কি নির্ধারণ করে?

(ক) নিছক সম্পদ (খ) সম্পদের ব্যবহার
(গ) সম্পদের সৃষ্টি (ঘ) কোনোটই নয়

৭.১৩ গ্রন্থপঞ্জি

১. সেখ সেলিম (2011) : *ভারতের পরিকল্পনা ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন*, গ্রন্থমিত্র, কলকাতা।

২. সরখেল, জয়দেব, সেখ সেলিম ও অনিন্দ্য ভুক্তা (2020) : *অর্থনৈতিক উন্নয়ন : প্রতিষ্ঠান, তত্ত্ব ও প্রয়োগ*, বুক সিন্ডিকেট প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা।

৩. সরখেল, জয়দেব ও সেখ সেলিম (2022) : *ভারতীয় অর্থনীতি*, বুক সিন্ডিকেট প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা।

৪. Sarkhel, Jaydeb, Seikh Salim & Anindya Bhukta (2017) : *Economic Development : Institutions*, Theory and Policy, Book Syndicate Private Limited, Kolkata.

৫. Jhingan, M. L. (2002) : *The Economics of Development and Planning*, Vrinda Publications (P) Ltd., Delhi.

৬. Mishra Puri (2008) *Indian Economy*, Himanaya Publishing House.

একক – ৮ ❑ ভারতবর্ষে দারিদ্র

গঠন

৮.১ উদ্দেশ্য

৮.২ প্রস্তাবনা

৮.৩ দারিদ্রের পরিমাপ

৮.৪ বহুমাত্রিক দারিদ্রের সূচক

৮.৫ দারিদ্র রেখা এবং ইহার ধারণা

৮.৬ ক্রমাগত দারিদ্রের কারণ

৮.৭ দারিদ্রের পরিমাপ এবং দারিদ্রের প্রকোপ

৮.৮ 1950 সাল থেকে দারিদ্রের প্রকোপ

৮.৯ দারিদ্র দূরীকরণে সরকারী প্রচেষ্টা

৮.১০ দারিদ্র দূরীকরণে অর্থনৈতিক সংস্কারের প্রভাব

৮.১১ সারাংশ

৮.১২ অনুশীলনী

৮.১৩ গ্রন্থপঞ্জি

৮.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে ছাত্রছাত্রীরা জানতে পারবে

- দারিদ্র এবং ভারতীয় অর্থনীতিতে দারিদ্রের সমস্যা
- দারিদ্রের ধারণাটি ও অনেকটা পরিষ্কার হবে
- দারিদ্রের দুষ্টচক্র এবং দারিদ্রের কারণগুলি বুঝতে পারবে
- দারিদ্রের পরিমাপ এবং দারিদ্রের প্রকোপ কিভাবে ভারতীয় অর্থনীতিকে পঙ্গু করে তুলেছিল বিশেষ করে স্বাধীনতার ঠিক পরে তা জানতে পারবে
- সরকার তার বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কি কি ব্যবস্থা নিয়েছে দারিদ্র দূরীকরণের জন্য তাও জানা যাবে

৮.২ প্রস্তাবনা

যে কোনো দেশের অর্থনীতিতে দারিদ্র একটি অত্যন্ত ঘোরতর সমস্যা। দেশের যদি জনসংখ্যার একটি বড় অংশ দারিদ্র রেখার নিচে বসবাস করে তাহলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন কোনোভাবেই সংগঠিত হতে পারে না। কারণ ওই অংশের জনসংখ্যা চাহিদা ও জীবনযাত্রার মান অত্যন্ত কম হওয়াতে উৎপাদন এবং বিনিয়োগ ব্যহত হয়। তাতে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয় না এবং দারিদ্রের প্রকোপ এবং দুষ্টচক্র দেখা দেয় যা থেকে বেরিয়ে আসা খুব কঠিন হয়ে পড়ে। আয়ের অসম বন্টন যদি না কমানো যায় তাহলে দারিদ্রের প্রকোপ বাড়তেই থাকে। দারিদ্র দূরীকরণের যে সমস্ত সরকারী ব্যবস্থা চালু আছে তা কতটা ফলদায়ক হয়েছে সে ব্যাপারেও আলোকপাত করা হয়েছে।

৮.৩ দারিদ্রের পরিমাপ

বিভিন্ন রিপোর্ট অনুযায়ী গ্রামীণ ভারতে এক চতুর্থাংশেরও বেশী জনসংখ্যা দারিদ্র রেখার নীচে বসবাস করে। গ্রামীণ জনসংখ্যার প্রায় 25.7% দারিদ্ররেখার নীচে বসবাস করে। শহরের ক্ষেত্রে এই চিত্রটি একটু উন্নত। এখানে প্রায় 13.7% জনসংখ্যা দারিদ্র রেখার নীচে বসবাস করে।

একটি খুব প্রচলিত দারিদ্র পরিমাপ পদ্ধতি যা আয় এবং ভোগের মাত্রার উপর নির্ভর করে এবং যদি আয় বা ভোগ একটি নির্দ্দিষ্ট সর্বনিম্ন মাত্রার নীচে থাকে তাহলে বলা হয় সেই পরিবারটি দারিদ্র রেখার (Below the Poverty Line, BPL) নীচে থাকে।

- দারিদ্র রেখা নির্ধারণ—বর্ত্তমান ভারতে দারিদ্র পরিমাপ Ministry of statistics and Programme Implementation (MOSPI) এর তত্ত্বাবধানে National Sample Survey office দ্বারা সংগ্রহ করে NITI আয়োগের একটি task force এর দ্বারা সংগঠিত হয়েছে। NITI আয়োগ পরিকল্পনা কমিশনের জায়গায় গঠিত হয়েছে। আগে পরিকল্পনা কমিশনই এই দারিদ্রের পরিমাপ করেছে।
- ভোগ বনাম আয়—দারিদ্র রেখার পরিমাপ ভোগ ব্যয়ের উপর নির্ধারিত হয় আয়ের উপর নয়। কারণগুলি হল—
  - আয় কখনই স্থির থাকে না বিশেষ করে যারা দিনমজুর এবং অসংগঠিত শ্রমিক তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু ভোগের মাত্রা সাধারণত স্থির থাকে।
  - অতিরিক্ত আয়ের সুযোগ থাকে যা হিসাবের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা কঠিন।

ভোগের সংগ্রহ করা হয় একটি নির্দ্দিষ্ট সময়ের উপর ভিত্তি করে। যেমন ধরা যাক 30 দিন সময় ঠিক করা হয় এবং জানতে চাওয়া হয় যে গত 30 দিনে ভোগের মাত্রা কিরূপ ছিল।

দারিদ্র রেখার পরিমাপ

- দারিদ্রের প্রকৃত পরিমাপ—প্রকৃত দারিদ্র United Nations World Summit for Economic Development এর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী প্রকৃত দারিদ্র হলো এমন এক অবস্থা যেখানে মানুষের যেগুলির মূল প্রয়োজনীয় জিনিস (basic needs) সেগুলি থেকে দারুণভাবে বঞ্চিত হয়। সেগুলি হলো খাদ্য, পানীয় জল, স্বাস্থ্, আশ্রয়, শিক্ষা এবং জ্ঞান।
- এগুলি শুধুমাত্র আয়ের উপর নির্ভর করে না, সামাজিক যে সমস্ত সেবাগুলি আছে সেগুলি কতটা ভোগ করতে পারে তার উপর নির্ভর করে।
- নির্দ্দিষ্ট সীমিত সুবিধা—বিশ্বব্যাঙ্ক বিভিন্ন উন্নয়নশীল দেশ যেমন ভারত যে সমস্ত পদ্ধতি অবলম্বন করে তা ভৌগলিক অবস্থানে স্থির থাকে।

দারিদ্রের পরিমাপের আপেক্ষিক তত্ত্ব :

আপেক্ষিক দারিদ্র : কোনো একটি দেশের কোনো পরিবারের আয় যখন সেই দেশের গড় আয়ের থেকে কম হয় তখন যে দারিদ্র দেখা দেয় তাকে বলে আপেক্ষিত দারিদ্র (Relative Poverty)

- যারা এই ধরনের দারিদ্রের মধ্যে থাকে তারা সবসময় যে সবরকমের মূল যে প্রয়োজনীয় বিষয় তা থেকে বঞ্চিত হয় তা নয় আবার সমাজের উচ্চতর আয়ের মানুষজনের মত জীবনযাত্রার মান বজায় রাখতে পারে না।
- দারিদ্র প্রান্তিক — এই পদ্ধতিতে অর্থনৈতিক ভাবে দুর্ব্বল মানুষদের একটা অংশ সব সময়ই দারিদ্র রেখার নীচে বসবাস করে।

ভারতবর্ষে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ ও সংস্থার নানা হিসাবের মাধ্যমে দারিদ্র সম্পর্কে ন্যূনতম মান পরিমাপের চেষ্টা হয়েছে।

(১) প্রণব বর্ধনের হিসাব—প্রণব বর্ধনের মতে, একজন ব্যক্তির ন্যূনতম ভোগের জন্য 1960-61 সালের মূল্যমানে মাসিক মাথাপিছু 15 টাকা প্রয়োজন। ওই ব্যয় যারা করতে পারে না তারাই দারিদ্র সীমার নীচে বসবাস করে।

(২) ডান্ডেকার ও রথের সমীক্ষা—একজন ব্যক্তির প্রতিদিন ন্যূনতম (দৈনিক মাথাপিছু 2400 ক্যালরি গ্রামাঞ্চলে এবং 2100 ক্যালোরি শহরাঞ্চলে) ভোগের জন্য প্রয়োজন। এই ভোগ যারা করতে পারে না তারা দারিদ্র সীমার নীচে বসবাস করে।

(৩) পরিকল্পনা কমিশনের হিসাব—পরিকল্পনা কমিশন বর্ত্তমানে দারিদ্র সীমার নিচে বসবাসকারী জনসংখ্যার হিসাবে করে থাকে জাতীয় নমুনা সমীক্ষা প্রতিষ্ঠান (NSSO) দ্বারা পরিচালিত 1990-2000 সালের 55 তম রাউন্ডের প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে বর্ত্তমানে দারিদ্র সীমার নির্ধারণ করে NITI আয়োগ। জাতীয় নমুনা সমীক্ষা প্রতিষ্ঠানের থেকে তথ্য সংগ্রহ করে।

সারণি 8.1

তালিকা ভারতে দারিদ্র সীমার নীচে বসবাসকারী জনসাধারণের শতকরা হিসাব

সময়	শহরাঞ্চল	গ্রামাঞ্চল	গ্রামাঞ্চল ও শহারাঞ্চল একত্রে
1973–74	49	56.4	54.9
1977–78	45.2	53.1	51.3
1983	40.8	45.7	44.5
1987–88	38.3	39.1	38.9
1993–94	32.4	37.3	36.0
1999–2000	23.6	27.1	26.1
2000–2001	19.5	21.6	20.4

Source : Planning Commission of India.

উপরের 8.1 সারণিতে দেখা যাচ্ছে যে, শহরাঞ্চলে দারিদ্র সীমার নিচে বসবাসকারী লোকের সংখ্যা ক্রমশ কমেছে এবং গ্রামাঞ্চলেও কমেছে। এটা সম্ভব হয়েছে বিভিন্ন পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় নেওয়া দারিদ্র দূরীকরণ কর্মসূচীর দ্বারা।

৮.৪ বহুমাত্রিক দারিদ্রের সূচক

NITI Ayog “Multidimensional Poverty in India since 2005-06” নামক একটি paper প্রকাশ করেছে যেখানে বলা হয়েছে যে, গত ১০ বছরে 24.82 crore মানুষ Multidimensional দারিদ্র থেকে মুক্তি পেয়েছে।

বহুমাত্রিক দারিদ্র সূচক কি? (Multidimenisional Poverty Index (MPI)

জাতীয় বহুমাত্রিক দারিদ্র, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, জীবনধারণের মান এই তিনটি সমগুরুত্ব সম্পন্ন মাত্রায় এইগুলিতে কিরূপ বঞ্চনা হয়েছে তা পরিমাপ করে। এইগুলি ১২টি Sustainable Development Goals সন্নিহিত নির্দেশক উপস্থাপন করে। এগুলি হলো পুষ্টি, শিশু এবং যুব মৃত্যুহার, মায়ের স্বাস্থ্য, বিদ্যালয় এ যাওয়া এবং পড়াশুনা চালিয়ে যাওয়া, বিদ্যালয়ের উপস্থিতি, রান্নার জ্বালানী, শৌচালয়, পানীয় জল, বিদ্যুৎ, ঘরবাড়ী, সম্পদ এবং ব্যাঙ্ক আমানত।

যাইহোক্ জাতীয় বহুমাত্রিক দারিদ্র সূচক (MPI) 12টি সূচক লক্ষণ (Indicators) এবং বিশ্ব MPI 10টি সূচক অন্তর্ভুক্ত করেছে।

বিশ্ব MPI সূচক

মাত্রা	সূচক	দারিদ্রের পরিমাপ
স্বাস্থ্য	পুষ্টি, শিশু, মৃত্যুহার	দারিদ্রের গভীরতা
শিক্ষা	কত বছর বিদ্যালয়ে বিদ্যালয়ে উপস্থিতি	মাথাপিছু গণনা
জীবন ধারণের মান	রান্না, জ্বানালী, বিদ্যুৎ, শৌচালয়, বাসস্থান, পানীয় জল, সম্পদ	

জাতীয় MPI সূচক

সূচক এবং তাদের গুরুত্ব

স্বাস্থ্য	vs	পুষ্টি শিশু ও যুব মৃত্যুহার মায়ের স্বাস্থ্য
শিক্ষা		বিদ্যালয়-এ কত বছর বিদ্যালয়ে উপস্থিতি
জীবন ধারণের মান	vs	রান্নার জ্বালানী স্বাস্থ্যপ্রকল্প (Sanitation) পানীয় জল, বাসস্থান, বিদ্যুৎ, সম্পদ, ব্যাঙ্ক জমা

৮.৫ দারিদ্র রেখা এবং ইহার ধারণা

সাধারণত চরম দরিদ্রের ধারণাটি দারিদ্র রেখার মাধ্যমে আলোচিত হয়ে থাকে। ভারতে দারিদ্র বিচার করার জন্য জীবনযাপনের নিম্নতম প্রয়োজনকে মানদণ্ড হিসাবে ব্যবহার করা হয়। সুতরাং দারিদ্র রেখা এমন একটি সীমা যার নীচে আয় থাকলে কোনো ব্যক্তির পক্ষে তার ন্যূনতম প্রয়োজনও মেটানো সম্ভব হয় না। ভারতের ন্যায় উন্নয়নশীল দেশের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো দারিদ্রের দুষ্টচক্র। দারিদ্রের সমস্যা সম্পর্কে সঠিক ধারণা পেতে হলে চূড়ান্ত দারিদ্র (Absolute Poverty) এবং আপেক্ষিক দারিদ্রের (Relative Poverty) মধ্যে পার্থক্য জানা প্রয়োজন। চূড়ান্ত দারিদ্র অবস্থায় ব্যক্তির আয় এত কম যে, ঐ আয় দিয়ে জীবন ধারনের উপযোগী ন্যূনতম প্রয়োজনটুকু মেটানো সম্ভব হয় না, অপরদিকে আপেক্ষিক দারিদ্র বলতে বোঝায় অর্থনীতির তীব্র অর্থনৈতিক বৈষম্য। এই ধারণায় বলা হয় জীবন ধারনের জন্য প্রয়োজনীয় আয় থাকা সত্ত্বেও সমাজের ধনী ব্যক্তিদের সাথে তাদের আয়ের পার্থক্য খুব বেশী, কাজেই

মানুষের বেঁচে থাকার জন্য যে পরিমাণ খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান ইত্যাদির প্রয়োজন হয় তার সংস্থান যারা করতে পারে না, তাদেরকে দারিদ্র বলা হয়। অন্যভাবে বলা যায়, দামসূচক ধরে যে মাথাপিছু আয় ন্যূনতম মাথাপিছু ভোগ ব্যয়ের জন্য প্রয়োজন বলে মনে করা হয়, তাকে দারিদ্ররেখা বলে।

৮.৬ ক্রমাগত দারিদ্রের কারণ

দারিদ্র্যের প্রধান কারণগুলি হল—

(১) দারিদ্রের দুষ্টচক্র—ভারতে দারিদ্রের প্রধান কারণ হলো অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা। অর্থনৈতিক অনগ্রসরতার প্রধান কারণ হলো দারিদ্রের দুষ্টচক্র। ভারতের স্বল্প জাতীয় আয়, স্বল্প সঞ্চয়, স্বল্প মূলধন গঠন, স্বল্প মাথাপিছু উৎপাদন ইত্যাদি কারণে দারিদ্র চক্রাকারে আবর্তন করছে এবং ভারতীয় অর্থনীতিকে স্থায়ীভাবে দারিদ্রের মধ্যে আবদ্ধ রেখেছে।

(২) পরিকল্পনার ত্রুটি—পরিকল্পনা রূপায়নের নানাপ্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতি দেশের বর্ত্তমান দারিদ্রের অন্যতম কারণ বলে অনেকে মত দেন।

(৩) জনসংখ্যা বৃদ্ধি—ভারতে দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি দারিদ্রের একটি অন্যতম কারণ বলে অনেকে মনে করেন। দেশে যেটুকু উৎপাদন ও আয় বৃদ্ধি পাচ্ছে তা জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। উদ্বৃত্ত থাকছে না।

(৪) ক্রমবর্ধমান দামস্তর বা মুদ্রাস্ফীতি—দেশে মুদ্রাস্ফীতির তীব্রতা বৃদ্ধি পেয়েছে ফলে নিম্ন আয়ের ব্যক্তিদের আর্থিক আয় দিন দিন খারাপ হয়েছে।

(৫) আয় ও সম্পদের অসম বন্টন—সম্পদের অসম বন্টন থেকে সৃষ্টি হয়েছে আয়ের অসম বন্টন। গ্রামাঞ্চলে ধনী চাষীরা এবং শহরাঞ্চলে শিল্পপতিরা অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুফল ভোগ করছে। দরিদ্র জনসাধারণের কাছে সুফল পৌঁছচ্ছে না।

(৬) ত্রুটি পূর্ণ কর ব্যবস্থা—ভারতে কর রাজস্বের এক বিরাট অংশ সংগ্রহ হয় পরোক্ষ কর থেকে যার বোঝা মূলত বহন করে দেশের দরিদ্র জনসাধারণ।

(৭) সরকারী ক্ষেত্রের ব্যর্থতা ও বেসরকারী ক্ষেত্রের জনস্বার্থ বিরোধী আচরণ ভারতে সরকারী ক্ষেত্রে প্রচুর বিনিয়োগ হয়েছে অথচ অযোগ্য পরিচালনার জন্য মুনাফার চেয়ে ক্ষতিই বেশী হয়েছে। বেসরকারী ক্ষেত্র শুধুমাত্র মুনাফা করার জন্য অপেক্ষাকৃত কম ঝুঁকিপূর্ণ জায়গায় বিনিয়োগ করছে।

(৮) অপর্যাপ্ত সরকারী ভর্ত্তুকী—দারিদ্রসীমার নীচে বসবাসকারী জনসাধারণের জন্য সরকারি ভর্ত্তুকির পরিমাণ প্রয়োজনের তুলনায় কম।

৮.৭ দারিদ্রের পরিমাপ এবং দারিদ্রের প্রকোপ

ভারতবর্ষের একটি বড় সমস্যা হলো দারিদ্র। তাই ভারতের পরিকল্পনার একটি প্রধান উদ্দেশ্য হলো দারিদ্র দূরীকরণ। কিন্তু দারিদ্রের আয়তন পরিমাপের উদ্দেশে কোন্ মাপকাঠি ব্যবহার করা হবে সেই বিষয়ে অর্থনীতিবিদরা নানা মত পোষণ করেন।

(১) প্রণব বর্ধনের হিসাব—প্রণব বর্ধনের হিসাব অনুযায়ী 1960–61 সালে গ্রামাঞ্চলে 38.0 শতাংশ জনসাধারণ দারিদ্র সীমার নীচে বসবাস করতো, ওই সালের মূল্যমানে মাসিক মাথাপিছু ১৫ টাকা প্রয়োজন হতো।

(২) ভারতের পরিকল্পনা কমিশন দ্বারা গঠিত টাস্ক ফোর্স গ্রামাঞ্চলে 2400 ক্যালরি যুক্ত খাদ্যশস্য এবং শহরাঞ্চলে 2100 ক্যালোরিযুক্ত খাদ্যশস্য একজন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির দৈনিক ন্যূনতম প্রয়োজন বলে মনে করে। গ্রামাঞ্চলে ও শহরাঞ্চলে এই ন্যূনতম দৈনিক ক্যালোরি গ্রহণের ভিত্তিতে মাথাপিছু মাসিক ভোগব্যয়কে দারিদ্র বলে চিহ্নিত করা হয়েছে।

সারণি 8.2

দারিদ্র পরিমাপ বিভিন্ন Committee

বছর	Lakhdawala Committee Estimates			Tendulkar Committee Estimates			Rangarajan Committee Estimates		
	Rural গ্রামীণ	Urban শহর	Total মোট	Rural গ্রামীণ	Urban শহর	Total মোট	Rural গ্রামীণ	Urban শহর	Total মোট
1994-1994	37.3	32.4	36.0	50.1	31.8	45.3	....	...	...
2004-2005	28.3	25.7	27.5	41.8	25.7	37.2	....	...	...
2009-2010	....	....	....	20.9	20.9	29.8	39.6	35.1	38.2
2011-2012	....	....	....	13.7	13.7	21.9	30.9	26.4	29.5

বিশ্বব্যাঙ্ক এর প্রদত্ত সংজ্ঞা অনুযায়ী একজন মানুষ অত্যন্ত দরিদ্র যদি সে প্রতিদিন 1.90 আন্তর্জাতিক ডলারের কম আয় করে। যা মুদ্রাস্ফীত এবং দাম পরিবর্ত্তন অনুযায়ী ঠিক করা হয়।

এশিয়ান উন্নয়ন ব্যাঙ্কের তথ্য অনুযায়ী 1.51 ডলার প্রতি মানুষের প্রতিদিন হল দারিদ্র রেখা।

Lakhdawala Committee (1993) : টাস্ক ফোর্স Lakhdawala-র চেয়ারপার্সন হিসাবে যে অনুমানগুলি করেছিল তা হলো ভোগ-দাম-index-শিল্প শ্রমিক (CPI-IW) এবং ভোগ-দাম কৃষি শ্রমিক (CPI-AL)-তে যে দ্রব্য ও সেবাকর্মগুলি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে সেটাই একজন দরিদ্রের ভোগের ধরণ নির্দেশ করে।

মতামত : ভোগ ব্যয় গণনা করা দরকার ক্যালরি ভোগের উপর জাতীয় নির্দ্দিষ্ট দারিদ্ররেখা ঠিক করা দরকার এবং CPI-IW এবং CPI-AL-র উপর নির্ভর করে তা পুর্ননবীকরণ করা দরকার।

৮.৮ 1950 সাল থেকে দারিদ্রের প্রকোপ

ভারতে দারিদ্রের প্রকোপ

2011-12 শতকরা দরিদ্রের হিসাব

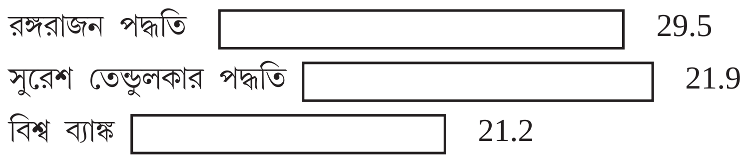

সূত্র পরিকল্পনা কমিশন

সারণি 8.3

ভারতে দারিদ্রসীমার নীচে বসবাসকারী জনসাধারণের শতকরা হিসাব

সময়	গ্রামাঞ্চল	শহরাঞ্চল	একত্রে
1973-1974	56.4	49.0	54.9
1977-1978	53.1	45.2	51.3
1983	45.7	40.8	44.5
1987-1988	39.1	38.2	38.9
1993-1994	37.3	32.4	36.0
1999-2000	27.1	23.6	26.1

সারণি 8.3 থেকে দেখা যাচ্ছে যে গ্রামাঞ্চলে ও শহরাঞ্চলে 1950 এর পর থেকে দারিদ্রের সংখ্যা কমছে।

দারিদ্র পরিমাপের বিভিন্ন যে পদ্ধতিগুলি আছে যেমন

(ক) মাথা গণনার পদ্ধতি (Head Count Rating method)

(খ) মাথা পিছু ভোগের পরিমাণভিত্তিক পদ্ধতি (Percapita Consumption method)

(গ) আয় বৈষম্যভিত্তিক পদ্ধতি (Inequality in Income Distribution Based Process)

তাদের মধ্যে মাথা পিছু ভোগের পরিমাণভিত্তিক পদ্ধতিটি সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য কারণ এই পদ্ধতিতে বলা হয় কোনো ব্যক্তির স্বাভাবিক স্বাস্থ্য বজায় রাখার জন্য সর্বনিম্ন কত ক্যালোরি প্রোটিন ও ভিটামিন প্রয়োজন।

৮.৯ দারিদ্র দূরীকরণে সরকারী প্রচেষ্টা

পঞ্চম পরিকল্পনা থেকে দারিদ্র দুরীকরণের জন্য লক্ষভিত্তিক কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। উল্লেখযোগ্য কর্মসূচীগুলি হলো :

(১) সুসংহত গ্রামীণ উন্নয়ন কর্মসূচী (Integrated Rural Development Programme, IRDP) : গ্রামাঞ্চলে দারিদ্র দূরীকরণের জন্য 1976-77 সালে সুসংহত গ্রামীণ উন্নয়ন কর্মসূচী চালু করা হয়। এই কর্মসূচীর উদ্দেশ্য হলো ঋণ ও ভর্তুকীর মাধ্যমে গ্রামাঞ্চলের দরিদ্রতম পরিবারকে সাহায্য করা।

(২) জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান কর্মসূচী (National Rural Employment Programme, NREP) : গ্রামাঞ্চলে দারিদ্র দূরীকরণের জন্য 1980 সালে জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান কর্মসূচী নেওয়া হয়। মজুরীভিত্তিক অতিরিক্ত কর্মসংস্থান চালু করা।

(৩) গ্রামীণ ভূমিহীন কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা কর্মসূচী (Landless Employment Gurantee Programme, RLEGP) : গ্রামাঞ্চলে দারিদ্র দূর করার জন্য 1983 সালে সম্পূর্ণভাবে কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা পুষ্ট গ্রামীণ ভূমিহীন কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা কর্মসূচী শুরু করা হয়।

(৪) জওহর রোজগার যোজনা (JRY) : 1989 সালে জওহর রোজগার যোজনা নামে একটি গ্রামীণ কর্মসূচী শুরু করা হয় গ্রামাঞ্চলে বেকারদের কর্মসংস্থান তৈরী করার জন্য।

(৫) নেহেরু রোজগার যোজনা (NRY) : শহরাঞ্চলে দারিদ্র দূর করার জন্য 1989 সালে নেহেরু রোজগার যোজনা চালু করা হয়। উদ্দেশ্য হলো ছোটো ছোটো ব্যবসায়ীদের ঋণ দেওয়া, মজুরীর বিনিময়ে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা, বাসস্থান উন্নয়ন ইত্যাদি।

৮.১০ দারিদ্র দূরীকরণে অর্থনৈতিক সংস্কারের প্রভাব

1991 সালের 24 জুলাই নতুন শিল্পনীতির প্রকাশের মধ্য দিয়ে ভারতে আনুষ্ঠানিক ভাবে এবং জোর কদমে আর্থিক সংস্কার প্রক্রিয়া শুরু হয়। অবশ্য তার আগে 1980-র দশকের মাঝামাঝি সময় থেকেই ভারতে বিভিন্ন অর্থনৈতিক কার্যকলাপের উপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ কমতে থাকে। 1991 সালের শিল্পনীতিতে যে সমস্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে, সংক্ষেপে সেগুলি হল :

সরকারি ক্ষেত্রের বেসরকারিকরণ এবং বিলগ্নিকরণ করার কথা বলা হয়েছে, বৈদেশিক মুদ্রার উপর নিয়ন্ত্রণ কমানো হয়েছে, বিদেশি মূলধনের ভারতে বিনিয়োগের পথ সুগম করা হয়েছে, শিল্পক্ষেত্রে একচেটিয়া ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণ কমানো হয়েছে, ব্যাঙ্ক, বিমা প্রভৃতি আর্থিক ক্ষেত্রে বিদেশি কোম্পানিকে প্রবেশের সুযোগ দেওয়া হয়েছে, বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে আমদানি-রপ্তানি নীতিকে উদার করা হয়েছে, সরকারি ক্ষেত্রের সঙ্কোচনের কথা বলা হয়েছে ইত্যাদি। এই সমস্ত কর্মসূচিকে সংক্ষেপে বলা হচ্ছে

উদারীকরণ, বেসরকারিকরণ এবং বিশ্বায়ন বা ভুবনীকরণ (Liberalisation, Privatisation and Globalisation বা সংক্ষেপে LPG)। এই আর্থিক সংস্কারের প্রভাব ভারতের দারিদ্র্যের সমস্যার উপর কেমন হবে তাই-ই আমরা বিবেচনা করব। আর্থিক সংস্কারের ফলে ভারতে কি দারিদ্র্যের হার কমবে? দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসকারী লোকেরা এই উদারনীতির ফলে কতটা উপকৃত হবে? এই বিভাগে আমরা সেই বিষয়টির উপর আমাদের আলোচনা নিবদ্ধ রাখবো।

অর্থনৈতিক সংস্কার ও বি-নিয়ন্ত্রণের কর্মসূচির মূল কথা হল অবাধ অর্থনীতির (*laisser faire* economy) প্রবর্তন করা। অর্থনৈতিক কাজকর্মে সরকারি হস্তক্ষেপ যতখানি সম্ভব কমানো হবে এবং বাজারি শক্তির দ্বারা সবকিছু নির্ধারিত হবে। অ্যাডাম স্মিথ-এর অদৃশ্য হাত (invisible hand) বাজারে চাহিদা ও জোগানের দ্বারা অর্থাৎ বাজারি শক্তির দ্বারা নির্ধারিত হয় তাহলে যার ক্ষমতা বেশি, শুধু সেই ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান টিকে থাকবে। দরিদ্র জনগণের আর্থিক ক্ষমতা কম। তাই সংস্কার-পরবর্তী যুগে তারা বাজার থেকে হঠে যাবে। তারা ক্রমাগত প্রান্তবাসী (marginalised) হয়ে পড়বে। অনেক প্রয়োজনীয় দ্রব্য ও সেবাকার্য তাদের নাগালের অর্থাৎ ক্রয়ক্ষমতার বাইরে চলে যাবে। তা ছাড়া, বাজার ব্যবস্থায় survival of the fittest নীতি অর্থাৎ যোগ্যতমের টিকে থাকার নীতি কাজ করে বলে এই ব্যবস্থায় আয় ও সম্পদের বৈষম্য বাড়বে। এর ফলেও দারিদ্র্য বাড়বে। ভারতে দরিদ্রতম ব্যক্তিদের স্বল্পমূল্যে বা বিনামূল্যে গম চাল ইত্যাদি খাদ্যদ্রব্য বিতরণের ব্যবস্থা চালু আছে। একে বলা হয় গণবণ্টন ব্যবস্থা (Public Distribution System)। আর্থিক সংস্কারের যুগে সরকার যদি এই ব্যবস্থা থেকে সরে আসে, তাহলে দারিদ্র্যসীমার নীচে (Below Poverty Line বা BPL) বাসকারী ব্যক্তিদের অবর্ণনীয় দুঃখ-দুর্দশার মধ্যে পড়তে হবে। সুতরাং সংস্কার-পরবর্তী যুগে বরং সরকারকে দরিদ্রদের জন্য কল্যাণমূলক কাজকর্ম (welfare activities) আরো বেশি করে করতে হবে। নতুবা জীবনধারণের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যটুকুও তারা সংগ্রহ করতে পারবে না। অবশ্য ভোগ বরাদ্দ বা রেশনিং ব্যবস্থায় তারা মূলত পেয়ে থাকে চাল ও গম। চিনি খুবই কম পরিমাণে কখনও কখনও দেওয়া হয়। কেরোসিনের দাম বাজার মূল্য অপেক্ষা কম হলেও সেই কম মূল্য দেবার ক্ষমতা অনেক দরিদ্রের নেই। আর দরিদ্রদের প্রোটিনের প্রধান উৎস হল ডাল। কিন্তু ডাল রেশন দোকানে দেওয়া হয় না বললেই চলে। আর্থিক সংস্কারের যুগে গরিবেরা আরও প্রান্তবাসী হবার ফলে এ সমস্ত দ্রব্য তারা বাজার থেকে কিনতে আরো পারবে না। সরকারকে তাই গণবণ্টন ব্যবস্থার পরিধি বাড়াতে হবে। তাছাড়া, সুস্থ ও ভদ্রস্থ জীবনযাপন করতে হলে কিছু একান্ত প্রয়োজনীয় পরিষেবার প্রয়োজন হয়। খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান ছাড়াও লাগে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবহন প্রভৃতি পরিষেবা। আর্থিক সংস্কারের মাধ্যমে বাজার ব্যবস্থার প্রবর্তনের ফলে এ সমস্ত পরিষেবার দাম বাড়ছে। অনেকেই এগুলি আর বাজার থেকে সংগ্রহ করতে পারবে না। ফলে দারিদ্র্যসীমার নীচে লোকের সংখ্যা আরো বাড়বে।

বিভিন্ন সমীক্ষায় ফলাফল থেকে দেখা যাচ্ছে যে, আর্থিক সংস্কারের পরবর্তী সময়ে ভারতে কৃষি ও শিল্প উভয় ক্ষেত্রেই অর্থনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন বেড়েছে। গ্রামীণ ভারতে ভূমিহীন চাষির সংখ্যা

বাড়ছে। ফলে কৃষি শ্রমিকের সংখ্যা বাড়ছে। কৃষিজমি ক্রমাগত বড় চাষির দখলে চলে যাচ্ছে। গ্রামীণ আয়ের প্রধান উৎস হল কৃষিজমি। সেই কৃষিজমি বড় জোতদারদের কাছে চলে যাওয়ার অর্থ হল, গ্রামীণ ভারতে আয় বৈষম্য বাড়ছে। শিল্পক্ষেত্রেও একই চিত্র দেখা যাচ্ছে। সেখানে মুষ্টিমেয় শিল্পগোষ্ঠীর আয় ও সম্পদ দ্রুত হারে বেড়েছে। পাশাপাশি অসংখ্য ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিযোগিতায় হেরে গিয়ে রুগণ্ শিল্পে পরিণত হয়েছে। অনেক ক্ষুদ্র শিল্প তাদের কারবার বন্ধ করে দিয়েছে। সরকারের বিমুদ্রাকরণ নীতি ঘোষণার (নভেম্বর, 2016) পরে পরেই অনেক ক্ষুদ্র শিল্প ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান একান্ত নিরুপায় হয়ে তাদের কারবার গুটিয়ে দিয়েছে। কোভিড মহামারি শুরুর পর (মার্চ, 2020) দরিদ্র ব্যক্তিদের অবস্থা অত্যন্ত করুণ হয়ে পড়েছে। কোভিড অতিমারির ফলে ঘোষিত লক ডাউন প্রভাবের জন্য লক্ষ লক্ষ পরিযায়ী শ্রমিক কাজ হারিয়েছে।

তাই সংস্কার-পরবর্তী কালে সরকারকে আরো বেশি বেশি দারিদ্র্য দূরীকরণ কর্মসূচি রূপায়িত করতে হবে। গণবণ্টন ব্যবস্থাকে আরো প্রসারিত ও কার্যকর করতে হবে। লক্ষ্যভিত্তিক গণবণ্টন ব্যবস্থার মাধ্যমে (Targeted Public Distribution System বা TPDS) কেবলমাত্র দরিদ্রতম ও দুর্বলতম ব্যক্তিদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সরবরাহ করতে হবে। দরিদ্র শ্রেণির জন্য প্রচলিত বার্ধক্য ভাতা, বিধবা ভাতা প্রভৃতি কর্মসূচিকে আরো জোরদার করতে হবে। দরিদ্র বেকারদের বেকার ভাতা দিতে হবে। আর্থিক সংস্কারের ফলে কর্মচ্যুত ব্যক্তিদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি পরিষেবা দরিদ্রদের মধ্যে বিনামূল্যে সরবরাহ করতে হবে।

একথা ঠিক যে, আর্থিক সংস্কারের ফলে ভারতের জাতীয় ও মাথাপিছু আয় বেড়েছে। কিন্তু মাথাপিছু আয় একটা গড় হিসাব মাত্র। এতে আয়ের বণ্টন ধরা পড়ে না। ফলে মাথাপিছু আয় বাড়লেও কোনো দেশে দারিদ্র্য বাড়তে পারে। তাছাড়া, উন্নয়নের 'চুঁইয়ে পড়া প্রভাব' (Trickle down effect) দরিদ্র শ্রেণির কাছ পর্যন্ত পৌঁছায় না। তাই দরিদ্র শ্রেণির উপর আর্থিক সংস্কারের বিরূপ প্রভাব কাটাতে ভারত সরকারকে দারিদ্র্য দূরীকরণ কর্মসূচি আরো জোর দিয়ে রূপায়িত করতে হবে।

৮.১১ সারাংশ

উন্নয়নশীল দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে সবচেয়ে বড় বাধা হলো দারিদ্রের দুষ্টচক্র। দারিদ্র যেখানে দারিদ্র সৃষ্টি করে এবং দারিদ্রের উপস্থিতিকে দীর্ঘায়িত করে দারিদ্রের সঙ্গে দারিদ্রের চক্রাকার সম্পর্ক স্থাপন করে তাকে দারিদ্রের দুষ্টচক্র বলে। দারিদ্র পরিমাপের বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে তার মধ্যে মাথাপিছু ভোগের পরিমাণভিত্তিক পদ্ধতিটি অত্যন্ত কার্যকরী। প্রণববর্ধন, ডান্ডেকার, তেন্ডুলকার এই দারিদ্রসীমা নির্ধারণে তাদের মাপকাঠি বর্ণনা করেছেন।

ভারতে দারিদ্রের কারণ হিসাবে মূলত দারিদ্রের দুষ্টচক্র, পরিকল্পনার ত্রুটি, জনসংখ্যা বৃদ্ধি, বেকারত্ব,

কৃষিতে চিরাচরিত প্রথার প্রয়োগ এইগুলিই তুলে ধরা হয়েছে। এছাড়াও অনেক সামাজিক ও রাজনৈতিক কারণও রয়েছে। দারিদ্র দূরীকরণে বিভিন্ন সরকারি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে যেমন সুসংহত গ্রামীণ উন্নয়ন কর্মসূচী, জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান কর্মসূচী, জওহর রোজগার যোজনা, নেহেরু রোজগার যোজনা ইত্যাদি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

ভারতে আয়বৈষম্য হ্রাস করার উদ্দেশ্যে স্বাধীনতার পর থেকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। সংক্ষেপে সেই ব্যবস্থাগুলি নিম্নরূপ :

(i) ভূমি সংস্কার কার্যসূচিতে জোতের ঊর্ধ্বসীমা ঘোষণা করা হয়েছে। উদ্‌বৃত্ত জমি ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বণ্টনের কথা বলা হয়েছে।

(ii) কৃষি শ্রমিকদের জন্য ন্যূনতম মজুরি আইন প্রণীত হয়েছে।

(iii) গ্রামাঞ্চলের পিছিয়ে পড়া ব্যক্তিদের জন্য বিভিন্ন সময়ে নানা কর্মসূচি গৃহীত হয়েছে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল : সুসংহত গ্রামীণ উন্নয়ন কর্মসূচি (Integrated Rural Development Programme বা IRDP), জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিয়োগ কর্মসূচি (National Rural Employment Programme বা NREP), কাজের বিনিময়ে খাদ্য (Food for Work বা FFW) প্রকল্প, জওহর রোজগার যোজনা (Jawahar Rozgar Yojana বা JRY), মহাত্মা গান্ধি জাতীয় গ্রামীণ নিয়োগ নিশ্চয়তা কর্মসূচি (Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme বা MGNREGS) প্রভৃতি।

(iv) বোনাস আইন প্রবর্তন করা হয়েছে। এর মূলকথা হল শিল্প-কারখানার লাভের একটা অংশ শ্রমিককে প্রদান।

(v) শিল্পের বণ্টনে আঞ্চলিক বৈষম্য কামানোর জন্য অনগ্রসর অঞ্চলে শিল্প স্থাপনে নানা উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে।

(vi) 1969 সালে শিল্পক্ষেত্রে একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ করতে Monopolies and Restrictive Trade Practices Act বা MRTP আইন পাশ করা হয়েছিল।

৮.১২ অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত দৈর্ঘ্যের উত্তরের প্রশ্নাবলী

১. দারিদ্রের দুষ্টচক্র কি?

২. দারিদ্র সীমা বলতে কি বোঝায়?

৩. দ্বৈত অর্থব্যবস্থা কি?

৪. দারিদ্রের দুইটি কারণ লেখ।

৫. দারিদ্র দূরীকরণে দুইটি সরকারী পদক্ষেপ লেখ

মাঝারি দৈর্ঘ্যের উত্তরের প্রশ্নাবলী

১. দারিদ্রের দুষ্টচক্রটি কিভাবে চক্রাকারে দেখান হয় ব্যাখ্যা কর।

২. দারিদ্র সীমা প্রণববর্ধন, ডান্ডেকার রথ কি বলেছেন ব্যাখ্যা কর।

৩. দারিদ্র পরিমাপের দুইটি পদ্ধতি ব্যাখ্যা কর।

দীর্ঘ দৈর্ঘ্যের উত্তরের প্রশ্নাবলী

১. দারিদ্রের কারণগুলি ব্যাখ্যা কর।

২. দারিদ্র দূরীকরণে সরকারী ব্যবস্থাগুলি ব্যাখ্যা কর।

৩. 1950 এর পর থেকে দারিদ্রের প্রকোপ ব্যাখ্যা কর।

সঠিক উত্তর নির্বাচনের প্রশ্নাবলী (MCQ)

১. মাথাপিছু ভোগব্যয় পরিকল্পনা কমিশন অনুযায়ী দারিদ্র সীমা কত গ্রামাঞ্চলে—

(ক) দৈনিক 2000 ক্যালরি (খ) দৈনিক 2200 ক্যালরি
(গ) দৈনিক 2400 ক্যালরি (ঘ) কোনোটিই নয়

২. মাথাপিছু ভোগব্যয় শহরাঞ্চলে দারিদ্র সীমা কত?

(ক) দৈনিক 2200 ক্যালরি (খ) দৈনিক 2400 ক্যালরি
(গ) দৈনিক 2100 ক্যালরি (ঘ) কোনোটিই নয়

৩. দারিদ্রের দুষ্টচক্র কিভাবে আবর্তিত হয়—

(ক) সরলরেখা (খ) চক্রাকার
(গ) কোনোটিই নয়

৪. জওহর রোজগার যোজনা কি?

(ক) ভোগ বৃদ্ধি করার ব্যবস্থা (খ) দারিদ্র দূরীকরণের ব্যবস্থা
(গ) কোনোটিই নয়

৮.১৩ গ্রন্থপঞ্জি

১. সরখেল, জয়দেব ও সেখ সেলিম (2022) : ভারতের অর্থনীতি, বুক সিন্ডিকেট প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা।

২. — (2019) : ব্যষ্টিগত অর্থনীতি ও ভারতের অর্থনীতি, বুক সিন্ডিকেট প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা।

৩. Kapila, Uma (2017-18) : Indian Economy, Academic Foundation, New Delhi.

৪. সেখ সেলিম (2011) : ভারতের পরিকল্পনা ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন, গ্রন্থমিত্র, কলকাতা।

৫. Lucas, E. B. Robert and Gustav F. papanek (1988) : The Indian Economy, Oxford University Press, New Delhi.

৬. Nani Ajoy Kumar (2010) : আধুনিক ভারতীয় অর্থনীতির রূপরেখা, B. B. Kundu Grandson.

একক – ৯ ❑ ভারতের আয় বৈষম্য

গঠন

৯.১ উদ্দেশ্য

৯.২ প্রস্তাবনা

৯.৩ আয়ের অসমবন্টন পরিমাপের কয়েকটি প্রচলিত পদ্ধতি

৯.৩.১ গিনি সহগ অসমতা বিষয়ে

৯.৩.২ **Theil** সূচক

৯.৩.৩ **Decile** বিচ্ছুরণ অনুপাত

৯.৩.৪ সবচেয়ে দরিদ্র **x%** লোকের আয়/ভোগের অংশ

৯.৪ ভারতীয় অর্থনীতিতে আয়ের বৈষম্য **(HDI measurement)**

৯.৫ বৈষম্যের কারণ

৯.৬ বৈষম্যের ফল

৯.৭ বৈষম্য দুরীকরণে গৃহীত ব্যবস্থা

৯.৮ বৈষম্য দুরীকরণে সংস্কারের ফলাফল

৯.৯ সারাংশ

৯.১০ অনুশীলনী

৯.১১ গ্রন্থপঞ্জি

৯.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে ছাত্রছাত্রীরা জানতে পারবে ভারতে আয়ের বৈষম্যের কারণ ও তার প্রতিকারে সরকারী ব্যবস্থা। এছাড়াও আয় বৈষম্যের পরিমাপের বিভিন্ন পদ্ধতি সম্পর্কেও একটি ধারণা করতে পারবে। অর্থনৈতিক সংস্কারের ফলে তার কি প্রভাব পড়েছে আয় বৈষম্যে তাও এই এককটি থেকে জানা যাবে। ভারতে আয়বৈষম্যের অর্থনৈতিক ফলাফল কি তাও জানা যাবে।

৯.২ প্রস্তাবনা

ভারতে আয়বৈষম্য স্বাধীনতার আগে থেকে একটি গভীর সমস্যা, স্বাধীনতার ঠিক পরেই ভারত সরকার ভারতকে জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র এবং জনসাধারণের কল্যাণ বৃদ্ধিকে অর্থনৈতিক পরিকল্পনার লক্ষ হিসাবে ঘোষণা করে। তাই বলা হয়, ভারতের অর্থনৈতিক পরিকল্পনার লক্ষ শুধুমাত্র জাতীয় আয়ের বৃদ্ধিই নয়। জাতীয় আয় যাতে দেশের জনসাধারণের মধ্যে সুষমভাবে বন্টিত হয় সেদিকে লক্ষ রাখা। পরিকল্পনায় এই নীতি ঘোষিত হওয়া সত্ত্বেও ভারতে আয়বন্টনে বৈষম্য বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। তাই ভারতীয় অর্থনীতির একটি প্রধান সমস্যা হলো আয় ও সম্পদ বন্টনে বৈষম্য। এব্যাপারে সরকারী ব্যবস্থা অনেক নেওয়া হলেও ভারতে এখনো এই সমস্যা বেশ প্রকটভাবে আছে সমাজের বিভিন্ন স্তরে। এই আয় বৈষম্য পরিমাপ করারও নানা প্রচেষ্টা হয়েছে। এই পরিমাপগুলির বিশেষ কয়েকটি পরিমাপও বিবেচনা করা হবে। এই আয় বৈষম্যের ফলে ভারতীয় অর্থনীতিতে নানা ধরণের ঘটনা ঘটছে যা কাম্য নয়। এই ফলাফলগুলি নিয়েও বর্তমান এককে আলোচনা করা হবে। আয় বৈষম্য দূর করার জন্য ভারত সরকার যে সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে সেগুলিও উল্লেখ করা হবে এবং এই ব্যবস্থাগুলির সংক্ষিপ্ত মূল্যায়নের চেষ্টা করা হবে।

৯.৩ আয়ের অসমবন্টন পরিমাপের কয়েকটি প্রচলিত পদ্ধতি

৯.৩.১ গিনি সহগ অসমতা বিষয়ে

লোরেঞ্জ রেখার সাহায্যে আয় বৈষম্য পরিমাপের আর একটি মাপকাঠি পাওয়া যায়। সেটি হল গিনি সহগ। ইতালির পরিসংখ্যানবিদ সি. গিনি-র নাম অনুসারে পরিমাপটির নাম দেওয়া হয়েছে গিনি সহগ। গিনি সহগ হল লোরেঞ্জ রেখা ও সমতা রেখার মধ্যবর্তী অঞ্চলের ক্ষেত্রফল এবং সমতা রেখার ডান দিকের পুরো অঞ্চলের ক্ষেত্রফলের অনুপাত। কোনো দেশের আয় বৈষম্যের মাত্রা যত বাড়ে, সমতা রেখা এবং লোরেঞ্জ রেখার মধ্যবর্তী অঞ্চলের আয়তন তত বাড়ে। ফলে আয় বৈষম্যের মাত্রা যত বাড়ে, গিনি সহগের মান তত বাড়ে। তত্ত্বগত ভাবে গিনি সহগের মান শূন্য থেকে একের মধ্যে হতে পারে। দেশটিতে কোনো আয় বৈষম্য না থাকলে গিনি সহগের মান শূন্য হবে। আর আয়বৈষম্য চরম মাত্রার হলে গিনি সহগের মান একের সমান হবে। তবে সাধারণত গিনি সহগের মান 0.2 থেকে 0.7-এর মধ্যে থাকতে দেখা যায়। গিনি সহগের মান 0.2 বা তার কাছাকাছি হলে তা আয় বণ্টনের মোটামুটি সমতা নির্দেশ করে। অন্যদিকে, গিনি সহগের মান 0.7-এর কাছাকাছি হলে তা মোটামুটি ভালো মাত্রায় আয় বৈষম্য নির্দেশ করে।

৯.৩.২ Theil সূচক

Theil সূচক হল রাশিবিজ্ঞানের একটি পদ্ধতি। এটি প্রধানত অর্থনৈতিক বৈষম্য এবং অন্যান্য অর্থনৈতিক বিষয় পরিমাপ করতে ব্যবহৃত হয়। অবশ্য এটি জাতিগত বিচ্ছিন্নতা (racial segregation) পরিমাপ করতেও ব্যবহৃত হয়েছে। আয় বৈষম্য পরিমাপের এই পদ্ধতি Statistical Information Theory-কে ভিত্তি করে নির্মিত। Theil সূচকের মান শূন্য থেকে একের মধ্যে বিরাজ করে। যদি সমস্ত ব্যক্তির আয় সমান হয় অর্থাৎ কোনো আয় বৈষম্য নেই, তখন সূচকের মান শূন্য হয়। যদি একজন ব্যক্তির হাতে সমস্ত আয় কেন্দ্রীভূত হয় অর্থাৎ আয় বৈষম্য সর্বাধিক, তখন সূচকটির মান 1-এর সমান হবে। অর্থাৎ Theil সূচকের মান যত বেশি, আয় বৈষম্য তত বেশি।

৯.৩.৩ দশমক (Decile) বিচ্ছুরণ অনুপাত

দশমক (Decile) হল রাশিবিজ্ঞানে কোনো চলরাশির কেন্দ্রীয় প্রবণতা পরিমাপের একটি পদ্ধতি। কোনো চলরাশির (মনে করি, বিভিন্ন ব্যক্তির আয়) মানগুলিকে ছোটো থেকে বড় অর্থাৎ ঊর্ধ্বক্রমে সাজালে দশমকগুলি ওই মানগুলিকে সমান দশটি ভাগে ভাগ করে। নয়টি দশমক (D_1, D_2, ..., D_9) সমগ্র বিভাজনটিকে সমান দশটি অংশে বিভক্ত করে। প্রথম বা নিম্নতম দশমক (D_1)-এর বাঁদিকে 10 শতাংশ এবং ডানদিকে বাকি 90 শতাংশ মান বণ্টিত থাকে।

10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

D_1 D_2 D_3 D_4 D_5 D_6 D_7 D_8 D_9

তেমনি, দ্বিতীয় দশমক (D_2)-এর বাঁদিকে 20 শতাংশ এবং ডানদিকে বাকি 80 শতাংশ মান বণ্টিত থাকে, ইত্যাদি। সরল রাশিতথ্যমালার বা সরল পরিসংখ্যা বিভাজনের ক্ষেত্রে প্রথমে রাশিতথ্যগুলিকে (এক্ষেত্রে বিভিন্ন ব্যক্তির আয়গুলিকে) তাদের মান অনুযায়ী ঊর্ধ্বক্রমে সাজানো হয়। যদি রাশির সংখ্যা (অর্থাৎ ব্যক্তির সংখ্যা) n হয় তাহলে প্রথম দশমক হল :

$D_1 \quad \frac{n \quad 1}{10}$ - তম রাশির মান। তেমনি, $D_2 \quad \frac{2(n \quad 1)}{10}$ -তম রাশির মান।

$D_3 \quad \frac{3(n \quad 1)}{10}$ -তম রাশির মান, ইত্যাদি।

এই দশমকের (D_1, D_2, ..., D_9) মান থেকে আয় বণ্টনের প্রকৃতি বোঝা যায়। আয়ের কোনো সীমায় (range) যদি মানগুলি খুব কাছাকাছি থাকে, (অর্থাৎ আয় বৈষম্য কম) তখন দুটি পরপর দশমকের মধ্যে পার্থক্য কম হবে। বিপরীত ক্ষেত্রে, দুটি দশমকের মধ্যে পার্থক্য বেশি হবে। অনেক সময়, আয় বৈষম্যের পরিমাপ হিসাবে বিশুদ্ধ সংখ্যা (pure number) বা একক-মুক্ত (unit free) সংখ্যা পেতে

কোনো দশমককে বিস্তৃতির কোনো পরিমাপ (যেমন, বিস্তার বা Range, চতুর্থক বিচ্যুতি বা Quartile Deviation, গড় বিচ্যুতি বা Mean Deviation, সমক বিচ্যুতি বা Standard Deviation) দ্বারা ভাগ করা হয়।

৯.৩.৪ সবচেয়ে দরিদ্র x% লোকের আয়/ভোগের অংশ

এটিও আয়বৈষম্য পরিমাপের একটি পদ্ধতি। পরিমাপটি খুব সরল এবং সেজন্য সাধারণ মানুষের কাছে খুবই জনপ্রিয়। পরিমাপটির নামেই বোঝা যাচ্ছে যে, এক্ষেত্রে দেশের দরিদ্রতম অংশ জাতীয় আয়ের কতটা পায় বা দেশের জাতীয় ভোগ ব্যয়ে তাদের অংশ কত, তা বিবেচনা করে আয় বৈষম্য সম্পর্কে ধারণা করা হয়। যেমন, আমরা উদাহরণস্বরূপ আগেই উল্লেখ করেছি যে, বিশ্বব্যাঙ্কের তথ্য অনুযায়ী, 2021 সালে ভারতে দরিদ্র 50 শতাংশ পেয়েছে জাতীয় আয়ের মাত্র 13 শতাংশ। এই তথ্য ভারতের জাতীয় আয়ের বণ্টনে তীব্র বৈষম্য প্রকাশ করছে। আয় বৈষম্য আলোচনার ক্ষেত্রে এই ধরনের অনুপাতের কথা প্রায়ই বলা হয়। এই রকম একটি অনুপাত **কুজনেৎস অনুপাত** নামে পরিচিত। কুজনেৎস অনুপাতটি হল কোনো দেশের জনসংখ্যার সবচেয়ে ধনী 20 শতাংশের আয় এবং সবচেয়ে দরিদ্র 20 শতাংশের আয়ের অনুপাত। যে দেশে আয় বৈষম্যর মাত্রা যত বেশি, সে দেশে কুজনেৎস অনুপাতের মান তত বেশি। বিপরীত ক্ষেত্রে, কুজনেৎস অনুপাতের মান কম। আদর্শ অবস্থায় (অর্থাৎ যেখানে কোনো বৈষম্য নেই) কুজনেৎস অনুপাতের মান একের সমান।

৯.৪ ভারতীয় অর্থনীতিতে আয়ের বৈষম্য (HDI measurement)

মানব উন্নয়ন সূচক (Human Development Index বা HDI হল আয়ু-প্রত্যাশা সূচক, শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্জন সূচক এবং মাথাপিছু প্রকৃত অন্তর্দেশীয় উৎপন্ন সূচকের সরল যৌগিক গড়। এই মানব উন্নয়ন সূচকের মান দেখে কোনো দেশের মানব উন্নয়ন কোন্ স্তরে রয়েছে তা জানা যায়। এই HDI-এর মান শূন্য থেকে একের মধ্যে বিরাজ করে। যে সমস্ত দেশের ক্ষেত্রে এই সূচকের মান 0.5-এর কম, সেই সমস্ত দেশ মানব উন্নয়নের নিম্নস্তরে রয়েছে বলে মনে করা হয়। বিশ্ব অর্থনীতিতে এরূপ দেশগুলি হল নাইজার, চাদ, বুরুণ্ডি, দক্ষিণ সুদান, মালি, মোজাম্বিক, ইথিওপিয়া প্রভৃতি। যে সমস্ত দেশে এই সূচকের মান 0.5 থেকে 0.8-এর মধ্যে রয়েছে, তাদের মানব উন্নয়ন মধ্যম স্তরে রয়েছে বলে ধরা হয়। এরূপ কয়েকটি দেশের উদাহরণ হল ঘানা, জাম্বিয়া, মায়ানমার, নেপাল, কেনিয়া, চিন, ভারত, জিম্বাবোয়ে, পাকিস্তান, সিরিয়া, নাইজিরিয়া, উগান্ডা প্রভৃতি। আর যে সমস্ত দেশের HDI-এর মান 0.8-এর বেশি, তাদের মানব উন্নয়ন উচ্চস্তরে ঘটেছে বলে ধরা হয়। এরূপ দেশের উদাহরণ হল নরওয়ে, কানাডা, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, যুক্তরাজ্য, সুইজারল্যান্ড, সুইডেন, ডেনমার্ক, আয়ারল্যান্ড, জার্মানি, অস্ট্রেলিয়া, নেদারল্যান্ডস প্রভৃতি। এভাবে HDI-এর মানের দ্বারা বিভিন্ন দেশের মধ্যে মানব উন্নয়নের

বৈষম্য বিচার করা যায়। ঠিক তেমনি, কোনো দেশের মধ্যে বিভিন্ন প্রদেশ বা অঞ্চলের মানব উন্নয়নের সূচকের মানের দ্বারা ওই প্রদেশগুলির মধ্যে মানব উন্নয়নের বৈষম্যের স্তর প্রকাশ করা যেতে পারে। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের মানব উন্নয়ন সূচক যদি আমরা বিবেচনা করি, তাহলে দেখা যাচ্ছে, যে রাজ্যগুলিতে মাথাপিছু আয় বেশি (যেমন, হরিয়ানা, পাঞ্জাব, মহারাষ্ট্র, গুজরাট, কর্ণাটক, কেরালা প্রভৃতি), সেই রাজ্যগুলিতে মানব উন্নয়ন সূচকের মানও বেশি। আর যে রাজ্যগুলিতে মাথাপিছু আয় কম (যেমন, ছত্তিশগড়, মধ্যপ্রদেশ, আসাম, রাজস্থান, ওড়িশা, বিহার, ঝাড়খণ্ড প্রভৃতি), সেই রাজ্যগুলিতে মানব উন্নয়ন সূচকের মানও কম। সুতরাং, অন্তত পরোক্ষভাবে মানব উন্নয়ন সূচকের মাধ্যমে আমরা আন্তঃরাজ্য আয়বৈষম্য সম্পর্কে ধারণা পেতে পারি। মানব উন্নয়ন সূচক সম্পর্কে আমরা 3নং এককে বিশদে আলোচনা করেছি।

৯.৫ বৈষম্যের কারণ

ভারতে আয় বণ্টনের বৈষম্যের পিছনে অনেক বিষয় কাজ করেছে। সংক্ষেপে সেই বিষয়গুলি নিম্নরূপ :

(i) ভারতে সম্পদের মালিকানা বন্টনে বৈষম্য রয়েছে। গ্রামাঞ্চলে জমিই হল আয়ের প্রধান উৎস। সেই জমির বণ্টনে বৈষম্য বিদ্যমান। শহরের সম্পত্তি সম্পর্কেও একই কথা খাটে। সম্পত্তির বণ্টনে বৈষম্য আয় বণ্টনে বৈষম্য সৃষ্টি করেছে।

(ii) ভারতে জাতীয় আয় বৃদ্ধির পাশাপাশি কর্মসংস্থান সমান তালে বাড়েনি। ফলে সৃষ্টি হয়েছে বেকারত্ব। বাড়তি আয় বেশি লোকের মধ্যে বণ্টিত হয়নি। মূলধন-প্রধান বা মূলধন-নিবিড় উৎপাদন কৌশল গ্রহণ করার ফলে মুষ্টিমেয় পুঁজির মালিকের হাতে আয় কেন্দ্রীভূত হয়েছে।

(iii) ভারতে ধনিক শ্রেণির একটা অংশের হাতে বিপুল পরিমাণ কালো টাকা। তারা নানা কৌশলে আয় কর ফাঁকি দিয়েছে। এর ফলেও আয় বৈষম্য বেড়েছে।

(iv) ভারতীয় অর্থনীতি তত্ত্বগত ভাবে মিশ্র অর্থনীতি হলেও এখানে ধনতন্ত্রের বৈশিষ্ট্যগুলিই বেশি জোরদার। আর আয় বৈষম্য ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির একটি মৌল বৈশিষ্ট্য।

(v) ভারতে আয় বৈষম্যের পিছনে মুদ্রাস্ফীতি বা দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিও কাজ করেছে। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির ফলে সংগঠিত ক্ষেত্রে নিযুক্ত ব্যক্তিদের বেতন বেড়েছে বটে, কিন্তু ব্যাপক ও বৃহত্তর অসংগঠিত ক্ষেত্রে বেতন তেমন বাড়েনি। এর ফলে সংগঠিত ও অসংগঠিত ক্ষেত্রের মধ্যে আয় বৈষম্য বেড়েছে।

(vi) ভারতে বিভিন্ন রকম সরকারি নীতির সুবিধা উচ্চ আয়ের লোকেরাই বেশি করায়ত্ত করেছে। এর ফলেও ভারতে আয় বৈষম্য বেড়েছে।

(vii) ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের অসততা, উচ্চবিত্ত ব্যক্তিদের আয় ও সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণ জারির ক্ষেত্রে আমলাতান্ত্রিক শৈথিল্য ও দুর্বলতা, আয় বৈষম্য কমাতে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণে রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাব ইত্যাদি বিষয়ও ভারতে আয় বৈষম্য বাড়াতে সাহায্য করেছে।

জনসংখ্যা বৃদ্ধি হল ভারতে আয়বন্টনে বৈষম্য বৃদ্ধির পাওয়ার একটি অন্যতম কারণ। আর্থিক দিক দিয়ে স্বচ্ছল উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত পরিবারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় কম হারে, কিন্তু দরিদ্র পরিবারে জনসংখ্যা বেশী হারে বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য দরিদ্র পরিবারের আর্থিক অবস্থা খারাপ হচ্ছে। ফলে আয় বৈষম্যও বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৯.৬ বৈষম্যের ফল

স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে ভারতের জাতীয় ও মাথাপিছু আয় বেড়েছে। কিন্তু তাতে দেশের সাধারণ লোকের জীবনযাত্রার মান বেড়েছে কিনা তা বলা যায় না, কেননা মাথাপিছু আয় একটি গড় হিসাব মাত্র। দেশের কয়েকজন ধনীর আয় যদি বাড়ে তাহলে দেশের মাথাপিছু আয় বাড়বে কিন্তু সাধারণ লোকের জীবনযাত্রার মান বাড়বে না। এক্ষেত্রে দেশে আয় বণ্টনের বৈষম্য বাড়ছে। সুতরাং দেশে আয় বৈষম্য বাড়লে জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান নাও বাড়তে পারে। ভারতেও মাথাপিছু আয় বেড়েছে বটে, কিন্তু পাশাপাশি আয় বৈষম্যেও বেড়েছে। ফলে জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান বাড়েনি। ভারতে আয় বৈষম্যের গভীরতা কতটা, তা বিভিন্ন সময়ে পরিমাপের চেষ্টা করা হয়েছে। আমরা প্রধান কয়েকটি এরূপ পরিমাপের উল্লেখ করব।

1. ভারতের আয় বৈষম্য অনুসন্ধান করার জন্য 1960 সালে মহলানবিশ কমিটি গঠিত হয়। 1964 সালে এই কমিটি তার প্রতিবেদন পেশ করে। কমিটির সিদ্ধান্ত ছিল যে, ভারতের গ্রামাঞ্চলে ওই সময় উচ্চ আয়ের 5 শতাংশ ব্যক্তি মোট আয়ের 17 শতাংশ ভাগ করত। আর দরিদ্রতম ২০ শতাংশ লোক জাতীয় আয়ের মাত্র 9 শতাংশ ভোগ করত। কমিটি শহরাঞ্চলের ক্ষেত্রেও আয় বৈষম্য পরিমাপ করে। কমিটি দেখেছিল যে, 1960-এর দশকে ভারতের শহরাঞ্চলে উচ্চ আয়ের 5 শতাংশ ব্যক্তি দেশের মোট আয়ের 26 শতাংশ ভোগ করত। আর দরিদ্রতম 20 শতাংশ পেয়েছিল জাতীয় আয়ের মাত্র 7 শতাংশ। সুতরাং কমিটির মতে, ভারতের আয় বণ্টনে যথেষ্ট বৈষম্য ছিল এবং গ্রাম অপেক্ষা শহরে এই বৈষম্য আরো বেশি। কমিটি এই আয় বৈষম্যের পিছনে দুটি প্রধান কারণ উল্লেখ করেছিল। সে দুটি হল : (i) ব্যাপক বেকারত্ব ও অর্ধ-বেকারত্ব এবং শ্রমের স্বল্প উৎপাদনশীলতা এবং (ii) উচ্চবিত্তদের দ্বারা কর ফাঁকি (tax evasion)।

2. বিশ্বব্যাঙ্কের রিপোর্ট থেকে আমরা ভারতের দুটি বছরের আয় বৈষম্যের চিত্র পাই। প্রথমটি 1975-76 সালের জন্য এবং দ্বিতীয়টি 1983 সালের জন্য। বিশ্বব্যাঙ্কের সমীক্ষা অনুযায়ী,

ভারতে 1975-76 সালে উচ্চ আয়ের 20 শতাংশ পরিবার জাতীয় আয়ের 49.4 শতাংশ ভোগ করত। অন্যদিক, নিম্ন আয়ের 20 শতাংশ পরিবার জাতীয় আয়ের মাত্র 7 শতাংশ ভোগ করত। এই তথ্য থেকে বোঝা যায় যে, ভারতে ওই সময় আয় বণ্টনে তীব্র বৈষম্য বর্তমান ছিল। 1983 সালের সমীক্ষায় আয় বৈষম্য বিচার করার জন্য মাথাপিছু ব্যয়ের বণ্টন বিবেচনা করা হয়েছে। সমীক্ষার ফল হল, 1983 সালে ভারতে উচ্চ আয়ের 20 শতাংশ পরিবারের ব্যয়ের পরিমাণ হল মোট ব্যয়ের 41.4 শতাংশ। আর নিম্ন আয়ের 20 শতাংশ পরিবারের ভোগ ব্যয়ের পরিমাণ ছিল মোট ভোগ ব্যয়ের 8.1 শতাংশ মাত্র। সুতরাং, এই দ্বিতীয় সমীক্ষার ফলাফলও ভারতের আয় বণ্টনের বৈষম্য নির্দেশ করছে। তবে 1975-76 সালের তুলনায় 1983 সালে আয় বৈষম্য কিছুটা হ্রাস পেয়েছে।

3. আয় বণ্টনের বৈষম্যের আর একটি হিসাব পাই NCAER বা National Council of Applied Economic Research-এর সমীক্ষা থেকে। এই সমীক্ষা অনুযায়ী, 1960 সালে ভারতে শহর ও গ্রাম এলাকার উচ্চ আয়ের 10 শতাংশ পরিবার যথাক্রমে জাতীয় আয়ের 42.4 শতাংশ এবং 33.6 শতাংশ ভোগ করত। অপরদিকে, নিম্ন আয়ের 20 শতাংশ গ্রামীণ ও শহরের পরিবার মোট আয়ের মাত্র 4 শতাংশ ভোগ করত। সুতরাং, এ সমীক্ষাও ভারতের আয় বৈষম্যের চিত্রকেই তুলে ধরছে। সমীক্ষা থেকে আরো জানা যাচ্ছে যে, গ্রামাঞ্চলের তুলনায় শহরাঞ্চলে আয় বৈষম্য বেশি।

4. আমরা বিশ্বব্যাঙ্ক কর্তৃক ভারতের আয় বৈষম্য সম্পর্কে সাম্প্রতিকতম সমীক্ষার ফল আগেই উল্লেখ করেছি। বিশ্বব্যাঙ্কের 2022 সালের জানুয়ারি মাসের প্রতিবেদন থেকে জানা যাচ্ছে যে, ভারতের সচ্ছল বা ধনী 10 শতাংশ ব্যক্তি 2021 সালে জাতীয় আয়ের 57 শতাংশ ভোগ করত। আর নিম্ন আয়ের 50 শতাংশ ব্যক্তি জাতীয় আয়ের মাত্র 13 শতাংশ ভোগ করত। সুতরাং মাঝারি আয়ের 40 শতাংশ ব্যক্তি জাতীয় আয়ের 30 শতাংশ ভোগ করত। এই তথ্য ভারতের জাতীয় আয়ের তীব্র আয় বৈষম্যকেই তুলে ধরে। শুধু তাই-ই নয়। বিশ্বব্যাঙ্কের প্রতিবেদন অনুযায়ী ভারতে সাম্প্রতিক কালে আয় বৈষম্য বেড়েছে।

৯.৭ বৈষম্য দুরীকরণে গৃহীত ব্যবস্থা

ভারতে আয়বৈষম্য হ্রাস করার উদ্দেশ্যে স্বাধীনতার পর থেকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। সংক্ষেপে সেই ব্যবস্থাগুলি নিম্নরূপ :

(i) ভূমি সংস্কার কার্যসূচিতে জোতের ঊর্ধ্বসীমা ঘোষণা করা হয়েছে। উদ্‌বৃত্ত জমি ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বণ্টনের কথা বলা হয়েছে।

(ii) কৃষি শ্রমিকদের জন্য ন্যূনতম মজুরি আইন প্রণীত হয়েছে।

(iii) গ্রামাঞ্চলের পিছিয়ে পড়া ব্যক্তিদের জন্য বিভিন্ন সময়ে নানা কর্মসূচি গৃহীত হয়েছে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল : সুসংহত গ্রামীণ উন্নয়ন কর্মসূচি (Integrated Rural Development Programme বা IRDP), জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিয়োগ কর্মসূচি (National Rural Employment Programme বা NREP), কাজের বিনিময়ে খাদ্য (Food for Work বা FFW) প্রকল্প, জওহর রোজগার যোজনা (Jawahar Rozgar Yojana বা JRY), মহাত্মা গান্ধি জাতীয় গ্রামীণ নিয়োগ নিশ্চয়তা কর্মসূচি (Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme বা MGNREGS) প্রভৃতি।

(iv) বোনাস আইন প্রবর্তন করা হয়েছে। এর মূলকথা হল শিল্প-কারখানার লাভের একটা অংশ শ্রমিককে প্রদান।

(v) শিল্পের বণ্টনে আঞ্চলিক বৈষম্য কামানোর জন্য অনগ্রসর অঞ্চলে শিল্প স্থাপনে নানা উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে।

(vi) 1969 সালে শিল্পক্ষেত্রে একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ করতে Monopolies and Restrictive Trade Practices Act বা MRTP আইন পাশ করা হয়েছিল।

(vii) কর ফাঁকি বন্ধ করতে এবং কালো টাকা উদ্ধার করতে বিভিন্ন সময়ে নানা ব্যবস্থা ভারত সরকার গ্রহণ করেছে।

(viii) শহরাঞ্চলে সম্পত্তির উপর ঊর্ধ্বসীমা ধার্য করা হয়েছে।

(ix) নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের ক্ষেত্রে ভরতুকি প্রদান, ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিদের সহজ শর্তে ঋণদান প্রভৃতি গ্রহণ করা হয়েছে।

কিন্তু এতসব ব্যবস্থা গ্রহণ করা সত্ত্বেও ভারতে আয় বৈষম্য কমেনি। আসলে গৃহীত ব্যবস্থাগুলি সমস্যার গভীরে প্রবেশ করতে পারেনি। অনেক ক্ষেত্রেই গৃহীত ব্যবস্থাগুলি ঠিকঠাক রূপায়িত হয়নি। যেমন, অনেক রাজ্যেই ভূমি সংস্কার কর্মসূচি রূপায়িত হয়নি। অনেক রাজ্যে তা আবার এত দেরিতে রূপায়িত হয়েছে যে, উদ্‌বৃত্ত জমি বিশেষ পাওয়া যায়নি। ন্যূনতম কৃষি মজুরি আইনও সর্বত্র অনুসরণ করা হয় না। ভারতে যে বিপুল পরিমাণ কালো টাকা রয়েছে তাও উদ্ধার করা যায়নি। কালো টাকা উদ্ধারের জন্য 2016 সালের নভেম্বর মাসে সরকার 500 ও 1,000 টাকার নোট বাতিল ঘোষণা করে (বিমুদ্রাকরণ বা demonetisation)। কিন্তু এর দ্বারা কালো টাকা উদ্ধার করা যায়নি। দরিদ্রদের সাহায্যের জন্য যে সমস্ত কর্মসূচি গৃহীত হয়েছে সেগুলি প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। একচেটিয়া ব্যবসা রোধে যে আইন পাশ (MRTP Act) পাশ করা হয়েছিল তা 2009 সালে বাতিল হয়েছে। 1991 সালের

পর থেকে ভারতে আর্থিক সংস্কার শুরু হয়েছে, যার মূলকথা হল বাজার ব্যবস্থার প্রবর্তন। এই ব্যবস্থায় ধনী আরও ধনী হবে এবং দরিদ্র হবে দরিদ্রতর অর্থাৎ ভারতে আয় বৈষম্য আরো বাড়বে বলেই মনে হয়।

সামাজিক নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। আয় বন্টনে বৈষম্য হ্রাস করে দুর্ঘটনা, অসুস্থতা এবং নিরাপত্তাহীনতা দূর করার জন্য কয়েকটি সামাজিক নিরাপত্তা আইন পাশ করা হয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্যগুল হল : (1) শ্রমিক ক্ষতিপূরণ আইন (2) কর্মচারী রাজ্য বীমা আইন (3) কর্মচারী প্রভিডেন্ড ফান্ড আইন ইত্যাদি।

৯.৮ বৈষম্য দুরীকরণে অর্থনৈতিক সংস্কারের প্রভাব

1991 সালের 24 জুলাই নতুন শিল্পনীতির প্রকাশের মধ্য দিয়ে ভারতে আনুষ্ঠানিক ভাবে এবং জোর কদমে আর্থিক সংস্কার প্রক্রিয়া শুরু হয়। অবশ্য তার আগে 1980-র দশকের মাঝামাঝি সময় থেকেই ভারতে বিভিন্ন অর্থনৈতিক কার্যকলাপের উপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ কমতে থাকে। 1991 সালের শিল্পনীতিতে যে সমস্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে, সংক্ষেপে সেগুলি হল :

সরকারি ক্ষেত্রের বেসরকারিকরণ এবং বিলগ্নিকরণ করার কথা বলা হয়েছে, বৈদেশিক মুদ্রার উপর নিয়ন্ত্রণ কমানো হয়েছে, বিদেশি মূলধনের ভারতে বিনিয়োগের পথ সুগম করা হয়েছে, শিল্পক্ষেত্রে একচেটিয়া ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণ কমানো হয়েছে, ব্যাঙ্ক, বিমা প্রভৃতি আর্থিক ক্ষেত্রে বিদেশি কোম্পানিকে প্রবেশের সুযোগ দেওয়া হয়েছে, বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে আমদানি-রপ্তানি নীতিকে উদার করা হয়েছে, সরকারি ক্ষেত্রের সঙ্কোচনের কথা বলা হয়েছে ইত্যাদি। এই সমস্ত কর্মসূচিকে সংক্ষেপে বলা হচ্ছে উদারীকরণ, বেসরকারিকরণ এবং বিশ্বায়ন বা ভুবনীকরণ (Liberalisation, Privatisation and Globalisation বা সংক্ষেপে LPG)। এই আর্থিক সংস্কারের প্রভাব ভারতের দারিদ্র্যের সমস্যার উপর কেমন হবে তাই-ই আমরা বিবেচনা করব। আর্থিক সংস্কারের ফলে ভারতে কি দারিদ্র্যের হার কমবে? দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসকারী লোকেরা এই উদারনীতির ফলে কতটা উপকৃত হবে? এই বিভাগে আমরা সেই বিষয়টির উপর আমাদের আলোচনা নিবদ্ধ রাখবো।

অর্থনৈতিক সংস্কার ও বি-নিয়ন্ত্রণের কর্মসূচির মূল কথা হল অবাধ অর্থনীতির (*laisser faire* economy) প্রবর্তন করা। অর্থনৈতিক কাজকর্মে সরকারি হস্তক্ষেপ যতখানি সম্ভব কমানো হবে এবং বাজারি শক্তির দ্বারা সবকিছু নির্ধারিত হবে। অ্যাডাম স্মিথ-এর অদৃশ্য হাত (invisible hand) বাজারে চাহিদা ও জোগানের দ্বারা অর্থাৎ বাজারি শক্তির দ্বারা নির্ধারিত হয় তাহলে যার ক্ষমতা বেশি, শুধু সেই ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান টিকে থাকবে। দরিদ্র জনগণের আর্থিক ক্ষমতা কম। তাই সংস্কার-পরবর্তী যুগে তারা বাজার থেকে হঠে যাবে। তারা ক্রমাগত প্রান্তবাসী (marginalised) হয়ে পড়বে। অনেক

প্রযোজনীয় দ্রব্য ও সেবাকার্য তাদের নাগালের অর্থাৎ ক্রয়ক্ষমতার বাইরে চলে যাবে। তা ছাড়া, বাজার ব্যবস্থায় survival of the fittest নীতি অর্থাৎ যোগ্যতমের টিকে থাকার নীতি কাজ করে বলে এই ব্যবস্থায় আয় ও সম্পদের বৈষম্য বাড়বে। এর ফলেও দারিদ্র্য বাড়বে। ভারতে দরিদ্রতম ব্যক্তিদের স্বল্পমূল্যে বা বিনামূল্যে গম চাল ইত্যাদি খাদ্যদ্রব্য বিতরণের ব্যবস্থা চালু আছে। একে বলা হয় গণবণ্টন ব্যবস্থা (Public Distribution System)। আর্থিক সংস্কারের যুগে সরকার যদি এই ব্যবস্থা থেকে সরে আসে, তাহলে দারিদ্র্যসীমার নীচে (Below Poverty Line বা BPL) বাসকারী ব্যক্তিদের অবর্ণনীয় দুঃখ-দুর্দশার মধ্যে পড়তে হবে। সুতরাং সংস্কার-পরবর্তী যুগে বরং সরকারকে দরিদ্রদের জন্য কল্যাণমূলক কাজকর্ম (welfare activities) আরো বেশি করে করতে হবে। নতুবা জীবনধারণের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যটুকুও তারা সংগ্রহ করতে পারবে না। অবশ্য ভোগ বরাদ্দ বা রেশনিং ব্যবস্থায় তারা মূলত পেয়ে থাকে চাল ও গম। চিনি খুবই কম পরিমাণে কখনও কখনও দেওয়া হয়। কেরোসিনের দাম বাজার মূল্য অপেক্ষা কম হলেও সেই কম মূল্য দেবার ক্ষমতা অনেক দরিদ্রের নেই। আর দরিদ্রদের প্রোটিনের প্রধান উৎস হল ডাল। কিন্তু ডাল রেশন দোকানে দেওয়া হয় না বললেই চলে। আর্থিক সংস্কারের যুগে গরিবেরা আরও প্রান্তবাসী হবার ফলে এ সমস্ত দ্রব্য তারা বাজার থেকে কিনতে আরো পারবে না। সরকারকে তাই গণবণ্টন ব্যবস্থার পরিধি বাড়াতে হবে। তাছাড়া, সুস্থ ও ভদ্রস্থ জীবনযাপন করতে হলে কিছু একান্ত প্রয়োজনীয় পরিষেবার প্রয়োজন হয়। খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান ছাড়াও লাগে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবহন প্রভৃতি পরিষেবা। আর্থিক সংস্কারের মাধ্যমে বাজার ব্যবস্থার প্রবর্তনের ফলে এ সমস্ত পরিষেবার দাম বাড়ছে। অনেকেই এগুলি আর বাজার থেকে সংগ্রহ করতে পারবে না। ফলে দারিদ্র্যসীমার নীচে লোকের সংখ্যা আরো বাড়বে।

বিভিন্ন সমীক্ষায় ফলাফল থেকে দেখা যাচ্ছে যে, আর্থিক সংস্কারের পরবর্তী সময়ে ভারতে কৃষি ও শিল্প উভয় ক্ষেত্রেই অর্থনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন বেড়েছে। গ্রামীণ ভারতে ভূমিহীন চাষির সংখ্যা বাড়ছে। ফলে কৃষি শ্রমিকের সংখ্যা বাড়ছে। কৃষিজমি ক্রমাগত বড় চাষির দখলে চলে যাচ্ছে। গ্রামীণ আয়ের প্রধান উৎস হল কৃষিজমি। সেই কৃষিজমি বড় জোতদারদের কাছে চলে যাওয়ার অর্থ হল, গ্রামীণ ভারতে আয় বৈষম্য বাড়ছে। শিল্পক্ষেত্রেও একই চিত্র দেখা যাচ্ছে। সেখানে মুষ্টিমেয় শিল্পগোষ্ঠীর আয় ও সম্পদ দ্রুত হারে বেড়েছে। পাশাপাশি অসংখ্য ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিযোগিতায় হেরে গিয়ে রুগণ্ শিল্পে পরিণত হয়েছে। অনেক ক্ষুদ্র শিল্প তাদের কারবার বন্ধ করে দিয়েছে। সরকারের বিমুদ্রাকরণ নীতি ঘোষণার (নভেম্বর, 2016) পরে পরেই অনেক ক্ষুদ্র শিল্প ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান একান্ত নিরুপায় হয়ে তাদের কারবার গুটিয়ে দিয়েছে। কোভিড মহামারি শুরুর পর (মার্চ, 2020) দরিদ্র ব্যক্তিদের অবস্থা অত্যন্ত করুণ হয়ে পড়েছে। কোভিড অতিমারির ফলে ঘোষিত লক ডাউন প্রভাবের জন্য লক্ষ লক্ষ পরিযায়ী শ্রমিক কাজ হারিয়েছে।

তাই সংস্কার-পরবর্তী কালে সরকারকে আরো বেশি বেশি দারিদ্র্য দূরীকরণ কর্মসূচি রূপায়িত করতে হবে। গণবণ্টন ব্যবস্থাকে আরো প্রসারিত ও কার্যকর করতে হবে। লক্ষ্যভিত্তিক গণবণ্টন ব্যবস্থার মাধ্যমে

(Targeted Public Distribution System বা TPDS) কেবলমাত্র দরিদ্রতম ও দুর্বলতম ব্যক্তিদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সরবরাহ করতে হবে। দরিদ্র শ্রেণির জন্য প্রচলিত বার্ধক্য ভাতা, বিধবা ভাতা প্রভৃতি কর্মসূচিকে আরো জোরদার করতে হবে। দরিদ্র বেকারদের বেকার ভাতা দিতে হবে। আর্থিক সংস্কারের ফলে কর্মচ্যুত ব্যক্তিদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি পরিষেবা দরিদ্রদের মধ্যে বিনামূল্যে সরবরাহ করতে হবে।

একথা ঠিক যে, আর্থিক সংস্কারের ফলে ভারতের জাতীয় ও মাথাপিছু আয় বেড়েছে। কিন্তু মাথাপিছু আয় একটা গড় হিসাব মাত্র। এতে আয়ের বণ্টন ধরা পড়ে না। ফলে মাথাপিছু আয় বাড়লেও কোনো দেশে দারিদ্র্য বাড়তে পারে। তাছাড়া, উন্নয়নের 'চুঁইয়ে পড়া প্রভাব' (Trickle down effect) দরিদ্র শ্রেণির কাছ পর্যন্ত পৌঁছায় না। তাই দরিদ্র শ্রেণির উপর আর্থিক সংস্কারের বিরূপ প্রভাব কাটাতে ভারত সরকারকে দারিদ্র্য দূরীকরণ কর্মসূচি আরো জোর দিয়ে রূপায়িত করতে হবে।

ভারতে বিভিন্ন আর্থিক সংস্কারের ফলে আর্থিক সমৃদ্ধি অবশ্যই ঘটেছে। দেশের এই অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির ফলে মানুষের কাছে অর্থযোগান বৃদ্ধি পেয়েছে যার ফলে বাজারে চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তার ফলে উৎপাদন ও দ্রব্যের যোগানও বৃদ্ধি পাওয়ায় মানুষের সর্বস্তরের আয়ের মানুষদের আয় বৃদ্ধি পেয়েছে যা আর্থিক বৈষম্য দূর করতে সহায়ক হয়েছে। এইভাবে দেশে বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাওয়ায় আর্থিক সমৃদ্ধি আরও দ্রুততর হতে সাহায্য করছে। তবে শুধুমাত্র আইন প্রণয়ন করা এবং সুযোগ সুবিধা প্রদান করলেই যে বৈষম্য হ্রাস পাবে তা নয় দরকার হলো সরকারের সদিচ্ছা এবং নারীদের প্রকৃত ক্ষমতায়ন। নারী এবং শিশুদের বিভিন্ন জায়গায় যে কষ্টের সম্মুখীন হতে হচ্ছে, নারী পাচার, অধিকার লাভ বঞ্চিত হওয়া এগুলি বৈষম্যের ফলেই আরও বৃদ্ধি পাচ্ছে। এব্যাপারে সরকারকে সচেষ্ট হতে হবে।

৯.৯ সারাংশ

১. **ভারতে আয় বৈষম্য :** 1950-51 সাল থেকে ভারতের জাতীয় ও মাথাপিছু আয় যথেষ্ট বেড়েছে। কিন্তু আয় বাড়ার সাথে সাথে আয় বৈষম্যও বেড়েছে।

২. **আয় বৈষম্য পরিমাপের কয়েকটি প্রচলিত পদ্ধতি :** আয় বৈষম্য পরিমাপের কয়েকটি প্রচলিত পদ্ধতি হল : লোরেঞ্জ রেখা, গিনি সহগ, Theil সূচক, দশমক বিস্তৃতির অনুপাত, জাতীয় আয়ে বা ভোগব্যয়ে দরিদ্রতমদের অংশ প্রভৃতি।

৩. **ভারতে আয় বৈষম্যের পরিমাপ :** বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ এবং সংস্থা কর্তৃক ভারতে আয় বৈষম্য পরিমাপ করার চেষ্টা হয়েছে। সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল : মহলানবিশ কমিটির পরিমাপ, বিশ্বব্যাঙ্কের পরিমাপ, NCAER কর্তৃক পরিমাপ প্রভৃতি। এই পরিমাপগুলি থেকে জানা যায় যে, ভারতে আয় বণ্টনে বৈষম্যই শুধু রয়েছে তা নয়, সেই বৈষম্য সাম্প্রতিক কালে বেড়েছে।

৪. **ভারতে আয় বৈষম্যের কারণ :** বিভিন্ন কারণে ভারতে আয় বৈষম্য বৃদ্ধি পেয়েছে। সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল : সম্পদ বণ্টনে বৈষম্য, ক্রমবর্ধমান বেকার সমস্যা, আয় কর প্রদানে ফাঁকি, ধনতান্ত্রিক সমাজ কাঠামো, মুদ্রাস্ফীতি, সরকারের প্রশাসনিক দুর্বলতা ও আয় বৈষম্য দূরীকরণে অনীহা প্রভৃতি।

৫. **ভারতে আয় বৈষম্য কমাতে সরকারি ব্যবস্থা :** আয় বৈষম্য কমানোর জন্য ভারত সরকার যে সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল : দরিদ্রদের কর্মসংস্থানের জন্য গৃহীত বিভিন্ন ব্যবস্থা, কৃষিজোতের সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ ও উদ্‌বৃত্ত জমি ভূমিহীনদের মধ্যে বণ্টন, গ্রামাঞ্চলে বৃদ্ধ দিনমজুর এবং অসহায় বিধবাদের পেনশন প্রদান, কর্মহীনদের জন্য বেকার ভাতা প্রদান, শিল্পে একচেটিয়া ক্ষমতা রোধে কমিশন গঠন, আয় কর ফাঁকির প্রবণতা দূর করতে গৃহীত ব্যবস্থাদি, কালো টাকা উদ্ধারের চেষ্টা প্রভৃতি। কিন্তু এ সমস্ত ব্যবস্থা যথাযথ রূপায়িত হয়নি। ফলে ভারতে আয় বৈষম্য রয়েই গেছে।

৯.১০ অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত উত্তরের প্রশ্নাবলী

১. আয় বৈষম্যের দুইটি কারণ লেখ।

২. আয় বৈষম্য দূর করার দুইটি সরকারী ব্যবস্থার নাম লেখ।

৩. গিনি সহগ কি?

৪. ভারতে আয় বৈষম্য পরিমাপের দুইটি পদ্ধতির নাম লেখ।

মাঝারি উত্তরের প্রশ্নাবলী

১. আয় বৈষম্য বলতে কি বোঝ?

২. আয় বৈষম্যের পরিমাপের পদ্ধতিগুলি যে কোনো দুইটি ব্যাখ্যা কর।

৩. ভারতে আয় বৈষম্যের কারণগুলি ব্যাখ্যা কর।

দীর্ঘ উত্তরের প্রশ্নাবলী

১. ভারতে আয় বৈষম্যের কারণগুলি ব্যাখ্যা কর।

২. পরিকল্পনাকালে আয় বৈষম্য দূরীকরণ কি?

৩. ভারতে আয় বৈষম্য প্রতিকারের জন্য সরকারী ব্যবস্থাগুলি ব্যাখ্যা কর।

৪. আয় বৈষম্য পরিমাপের পদ্ধতিগুলি ব্যাখ্যা কর।

সঠিক উত্তর নির্বাচনের প্রশ্নাবলী (MCQ)

১. গিনি সহগ কি?

(ক) আয়বৃদ্ধির পরিমাপ (খ) আয় ও ব্যয়ের অনুপাত
(গ) আয় বৈষম্য পরিমাপের পদ্ধতি (ঘ) কোনোটিই নয়

২. Theil সূচকের মান কত?
(ক) ১ থেকে ২ এর মধ্যে (খ) শূন্য থেকে ১ এর মধ্যে
(গ) কোনোটিই নয়

৩. HDI পুরো কথাটি কি?
(ক) Human Development of India (খ) Human Development Index
(গ) কোনোটিই নয়

৪. NACER পুরো কথাটি কি?
(ক) National Council of Agricultural Economic Research
(খ) National Council of Applied Economic Research
(গ) কোনোটিই নয়

৯.১১ গ্রন্থপঞ্জি

১. সরখেল, জয়দেব ও সেখ সেলিম (2022) : ভারতের অর্থনীতি, বুক সিন্ডিকেট প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা।

২. — (2019) : ব্যষ্টিগত অর্থনীতি ও ভারতের অর্থনীতি, বুক সিন্ডিকেট প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা।

৩. Kapila, Uma (2017-18) : Indian Economy, Academic Foundation, New Delhi.

৪. সেখ সেলিম (2011) : ভারতের পরিকল্পনা ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন, গ্রন্থমিত্র, কলকাতা।

৫. Lucas, E. B. Robert and Gustav F. papanek (1988) : The Indian Economy, Oxford University Press, New Delhi.

৬. নন্দী অজয় কুমার (২০১০) আধুনিক ভারতীয় অর্থনীতির রূপরেখা, B. B. Kundu Grandsons, Kolkata.

একক – ১০ ❑ ভারতে কর্মসংস্থান ও বেকারী

গঠন

১০.১ উদ্দেশ্য

১০.২ প্রস্তাবনা

১০.৩ ভারতে বেকার সমস্যা

১০.৪ বেকারত্বের শ্রেণিবিভাগ

১০.৫ ভারতে বেকারত্বের প্রকৃতি

১০.৬ ভারতে বেকারির পরিমাণ

১০.৭ ভারতে বেকারত্বের কারণ

১০.৮ 1950 সাল থেকে কর্মসংস্থানের নীতি

১০.৯ অসংগঠিত অর্থনীতি

১০.১০ সারাংশ

১০.১১ অনুশীলনী

১০.১২ গ্রন্থপঞ্জি

১০.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে ছাত্রছাত্রীরা জানতে পারবে

- ভারতে বেকারত্বের প্রকৃতি
- ভারতে বেকারির আয়তন
- বেকারির কারণসমূহ
- বেকারত্ব দূর করতে ভারত সরকার অবলম্বিত ব্যবস্থাসমূহ
- ভারতে মহিলা ও শিশু শ্রমিকদের নিয়োগ ও মজুরির ধরন

১০.২ প্রস্তাবনা

ভারতীয় অর্থনীতিতে কিছু মৌল বা প্রধান সমস্যা রয়েছে। এরূপ কয়েকটি সমস্যা হল জনসংখ্যার সমস্যা, দারিদ্র্যের সমস্যা, আয় বৈষম্যের সমস্যা, বেকার সমস্যা, কালো টাকার সমস্যা প্রভৃতি। এদের মধ্যে আবার বোধহয় সবচেয়ে অস্বস্তিকর, সবচেয়ে দুর্ভাগ্যজনক সমস্যা হল বেকারত্বের সমস্যা। এই সমস্যাটি বর্তমানে ভারতীয় অর্থনীতিতে এক বিশাল ও ভয়াবহ সমস্যা হিসাবে দেখা দিয়েছে। বর্তমান এককে আমরা এই বেকার সমস্যার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করব। বেকারত্ব বিভিন্ন রকমের হতে পারে যেমন, কৃষিক্ষেত্রে প্রচ্ছন্ন ও মরশুমি বেকারত্ব, শহরাঞ্চলে শিক্ষিত যুবকদের মধ্যে বেকারত্ব, সংঘাতজনিত বেকারত্ব, প্রযুক্তিগত উন্নতির ফলে বেকারত্ব ইত্যাদি। বর্তমান এককে আমরা বিভিন্ন প্রকারের বেকারত্ব অর্থাৎ বেকারত্বের প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করবো। বেকারির সঠিক হিসাব পাওয়া খুব কঠিন। বেকারত্বের সংজ্ঞা অনুযায়ী বেকারের সংখ্যার পরিবর্তন ঘটবে। ভারতে বেকারির পরিমাপ কীভাবে করা হয় তাও এখানে আলোচনা করা হবে। বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য ভারত সরকার নানা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। এই ব্যবস্থাগুলি বা সরকারের নিয়োগনীতি নিয়েও আলোচনা করা হবে। ভারতে রয়েছে বিশাল অসংগঠিত ক্ষেত্র। এই অসংগঠিত ক্ষেত্রে নিয়োগের অবস্থা কেমন, তাও বিবেচনা করা হবে। সবশেষে, ভারতে মহিলা ও শিশু শ্রমিকদের নিয়োগের অবস্থা এবং মজুরির হার কেমন তাও বর্তমান এককে বিশ্লেষণ করা হবে।

১০.৩ ভারতে বেকার সমস্যা

তত্ত্বগতভাবে, প্রচলিত মজুরির হারে যারা কাজ করতে সক্ষম এবং ইচ্ছুক, কিন্তু কোনো কাজ পাচ্ছে না, তাদের বেকার বলা হয়। অর্থনীতিবিদ কেইনস এদের অনিচ্ছাকৃত বেকার বলেছেন। বাস্তবে অবশ্য বেকারত্ব পরিমাপ করতে বছরের মধ্যে কতদিন কোনো শ্রমিক কাজ পাচ্ছে বা পাচ্ছে না, তা বিচার করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, কোনো সমীক্ষায় বেকারের সংখ্যা গণনা করতে ধরা যেতে পারে যে, কোনো ব্যক্তি বছরে অন্তত অর্ধেক দিন (183 দিন বা তার বেশি) কাজ পেলে তাকে নিযুক্ত (employed) বলে বা বেকার নয় বলে ধরা হবে। অন্যদিকে, কোনো ব্যক্তি বছরের অর্ধেক দিন কাজ না পেলে তাকে বেকার (unemployed) বলে গণ্য করা হবে। আবার, বেকারত্বের অন্য সংজ্ঞাও গৃহীত হতে পারে।

বিশ্বের প্রায় সব দেশেই বেকার দেখা যায়। তবে ভারত-সহ কিছু উন্নয়নশীল দেশে বেকার সমস্যা এক ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। বেকার সমস্যা বর্তমানে ভারতের অন্যতম প্রধান সমস্যা। বেকার সমস্যা কোনো অর্থনীতির পক্ষে একটি সমস্যা, কেননা বেকারত্বের ফলে মানব শক্তির অপচয় ঘটে, দেশের মানব সম্পদের সবটা ব্যবহৃত হয় না। তা ছাড়া, বেকার সমস্যা এবং দারিদ্র্যের সমস্যা একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। কোনো ব্যক্তি বেকার বা কর্মহীন হয়ে পড়লে একসময় দরিদ্র হয়ে পড়ে। তাই

কোনো দেশের দারিদ্র্য দূর করতে হলে সর্বাগ্রে বেকার সমস্যার সমাধান করতে হবে, দেশের সক্ষম সকল ব্যক্তিকে কাজের সুযোগ তৈরি করতে হবে। এখানেই বেকার সমস্যা সমাধানের গুরুত্ব।

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথাও উল্লেখযোগ্য। ভারতের বেকার সমস্যার প্রকৃতি উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশের বেকার সমস্যার প্রকৃতি থেকে ভিন্ন। উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশে বেকারত্ব হল বাণিজ্যচক্রের ওঠা-নামার ফল। যখন বাণিজ্যচক্রের নিম্নগতি দেখা দেয় অর্থাৎ যখন দেশে মন্দাবস্থা দেখা দেয়, তখন জিনিসপত্রের মোট চাহিদা কমে যায়। ফলে দেশে উৎপাদন কমে, কর্মসংস্থান কমে এবং দেশে বেকারত্বের উদ্ভব হয়। বাণিজ্যচক্রের এই নিম্নগতি এক সময় শেষ হয়ে গেলে ঊর্ধ্বগতি শুরু হয়। তখন মন্দা কেটে যায় এবং দেশে দ্রব্যসামগ্রীর চাহিদা বাড়ে। ফলে উৎপাদন ও কর্মসংস্থান বাড়ে। দেশটিতে বেকারি দূর হয়। কিন্তু ভারতের ন্যায় স্বল্পোন্নত দেশে বেকারত্ব কোনো বাণিজ্যচক্রজনিত সমস্যা নয়। এখানে বেকারত্ব একটি কাঠামোগত সমস্যা। এর অর্থ হল, দেশের মূল অর্থনৈতিক কাঠামোর সঙ্গে বেকারত্বের সমস্যাটি জড়িত। এখানে বেকারত্বের মূল কারণ হল মূলধন এবং কিছু উৎপাদনশীল উপকরণের অভাব। ভারতের বেকার সমস্যা কোনো বাণিজ্যচক্রজনিত মন্দার সময় কার্যকরী চাহিদার অভাবের ফলে সৃষ্ট হয়।

১০.৪ বেকারত্বের শ্রেণিবিভাগ

কোনো দেশে যে বেকারত্ব দেখা যায় তা বিভিন্ন রকমের হতে পারে। বেকারত্বের প্রকৃতি অনুযায়ী একে কয়েকটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়। সেগুলি হল : প্রচ্ছন্ন বেকারত্ব, মরশুমি বেকারত্ব, প্রযুক্তিগত বা কাঠামোগত বেকারত্ব এবং বাণিজ্যচক্রজনিত বেকারত্ব। আমরা এই বেকারত্বগুলি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করব। ভারতীয় অর্থনীতিতেও এই সকল বেকারত্ব কমবেশি দেখতে পাওয়া যায়।

1. **প্রচ্ছন্ন বেকারত্ব (Disguised Unemployment) :** প্রচ্ছন্ন বেকারত্ব বলতে সেই উদ্‌বৃত্ত শ্রমিকদের বোঝায় যাদের উৎপাদন প্রক্রিয়া থেকে তুলে নিলেও মোট উৎপাদন কমে না, তাদের প্রচ্ছন্ন বেকারত্ব বা ছদ্মবেশী বেকারত্ব বলে। জনবহুল দেশের কৃষিক্ষেত্রে এরূপ প্রচ্ছন্ন বেকার দেখা যায়। এরূপ বেকারত্বের প্রধান কারণ হল জনসংখ্যার চাপ এবং বিকল্প নিয়োগের সুযোগের অভাব। কৃষিক্ষেত্র ছাড়াও শিল্প এবং অন্যান্য ক্ষেত্রেও এরূপ প্রচ্ছন্ন বেকারত্ব দেখা যায়। ভারতের কৃষিক্ষেত্রেও বিপুল পরিমাণ প্রচ্ছন্ন বেকারত্ব দেখা যায়। ভারত একটি জনবহুল দেশ এবং এর শিল্পক্ষেত্র তত উন্নত নয়। ফলে কৃষির উদ্‌বৃত্ত জনসংখ্যাকে শিল্প নিয়োগ দিতে পারেনি। ফলে সেই বাড়তি জনসংখ্যা কৃষিক্ষেত্রেই রয়ে গেছে এবং তাদের একটা বড় অংশই প্রচ্ছন্ন বেকার।

2. **মরশুমি বেকারত্ব (Seasonal Unemployment) :** মরশুমি বেকারত্ব বলতে সেই সমস্ত শ্রমিকদের বোঝায় যারা বিশেষ মরশুম বা ঋতুতে শুধু কাজ পায় এবং বাকি সময় বেকার

থাকে। প্রধানত কৃষিক্ষেত্রেই এই ধরনের বেকারত্ব দেখা যায়। কৃষিকাজ হল ঋতুভিত্তিক বা মরশুমভিত্তিক। সারা বছরই সাধারণত কৃষিকাজ হয় না। তা ছাড়া, জলসেচের অভাবের দরুণ কৃষিকাজে বৈচিত্র্য (diversification) থাকে না। ফলে কৃষক ও কৃষি শ্রমিকদের বছরের বেশ কয়েক মাস বসে থাকতে হয়। একেই মরশুমি বা ঋতুগত বেকারত্ব বলে। ভারতের কৃষিতেও এই ধরনের বেকারত্ব দেখা যায়। অবশ্য শুধুমাত্র কৃষিকার্যেই মরশুমি বেকারত্ব দেখা যায়, তা নয়। শিল্পক্ষেত্রেও মরশুমি বেকারত্ব দেখতে পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ, কাঁচা আখ সারা বছর পাওয়া যায় না। তাই যখন আখের ফসল পাওয়া যায়, তখনই চিনি কলগুলি চালু থাকে। বছরের অন্য সময় চিনি কলের কাজকর্ম অনেক কমে যায়। ফলে তখন চিনি কলগুলির অনেক শ্রমিক ছাঁটাই হয়ে যায়। এই ধরনের বেকারত্ব আসলে মরশুমি বেকারত্ব। তেমনি, গরমের সময় আইসক্রিমের কলগুলি চালু থাকে এবং অন্য সময় বন্ধ থাকে। তখন ওই কলগুলির শ্রমিকেরা বেকার হয়ে পড়ে। এটিও মরশুমি বা ঋতুগত বেকারত্ব। তেমনি, পাটকল, সরষে পেশাই কল প্রভৃতি ক্ষেত্রে এরূপ বেকারত্বের উদ্ভব হতে পারে। আবার, বছরের বিশেষ সময়ে স্কুল-কলেজের পাঠ্য পুস্তকের চাহিদা বাড়ে। তখন ছাপাই শিল্পে নিযুক্ত লোকের চাহিদা বাড়ে। কিন্তু বছরের অন্য সময় তাদের একাংশের কোনো কাজ থাকে না। সুতরাং, কৃষিকার্য ছাড়াও শিল্পক্ষেত্র এবং অন্যান্য জীবিকা ও পেশাতেও মরশুমি বা ঋতুগত বেকারত্ব দেখা যায়। তবে কৃষিকার্য বিশেষভাবে মরশুমভিত্তিক বা ঋতুভিত্তিক বলে মরশুমি বা ঋতুগত বেকারত্ব কৃষিক্ষেত্রেই বেশি দেখা যায়। এক্ষেত্রে বেকারত্বের প্রধান কারণ হল জলসেচ এবং উপযুক্ত ধরনের বীজ ও কৃষিপদ্ধতি অভাবের দরুন কৃষির বৈচিত্র্যহীনতা (non-diversification of agriculture)। ভারতীয় কৃষিতে বৈচিত্র্য কম। তাই ভারতীয় কৃষিতে বিপুল সংখ্যক মরশুমি বা প্রচ্ছন্ন বেকারত্ব দেখা যায়।

3. **প্রযুক্তিগত বা কাঠামোগত বেকারত্ব (Technological or Structural Unemployment) :** দেশের কাঠামোগত কোনো পরিবর্তন ঘটলে অথবা কলাকৌশলের পরিবর্তন ঘটলে কিছু শ্রমিক উদ্বৃত্ত হয়ে পড়তে পারে। শ্রমের এরূপ উদ্বৃত্ত অবস্থাকে প্রযুক্তিগত বা কাঠামোগত বেকারত্ব বলে। নতুন উৎপাদন কৌশলের (শ্রমসঞ্চয়ী) প্রবর্তন, নতুন দ্রব্য আবিষ্কার, দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তন ইত্যাদির ফলে এই ধরনের বেকারত্ব দেখা দিতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, কৃষিতে ট্রাকটর, হারভেস্টার, থ্রেসার প্রভৃতি শ্রম- সঞ্চয়ী যন্ত্রের ব্যবহার ঘটলে অনেক শ্রমিক উদ্বৃত্ত হয়ে পড়তে পারে। তেমনি, শিল্পক্ষেত্রে মূলধন নিবিড় (capital intensive) উৎপাদন কৌশল গ্রহণ করলে শ্রমিকের চাহিদা কমে যাবে। আবার, নতুন দ্রব্যের আবিষ্কার ও প্রচলন হলে তার পরিবর্ত দ্রব্যের শিল্পে উৎপাদন এবং শ্রমিক নিয়োগ কমে যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, প্লাস্টিক এবং নাইলন প্রবর্তনের ফলে অনেক পাটকলই রুগ্‌ণ

হয়ে পড়ছে এবং সেখানের শ্রমিক কাজ হারাচ্ছে। কমপিউটার এবং জেরক্স মেসিন আবিষ্কারের পর পুরনো টাইপিস্টদের কাজ হারাতে হয়েছে। এগুলি সবই প্রযুক্তিগত বেকারত্বের উদাহরণ। আবার, ভারতে যতই বৃহৎ আয়তনের কলকারখানা গড়ে উঠছে ততই অনেক মাঝারি ও ক্ষুদ্রায়তনের কারখানা প্রতিযোগিতায় পিছু হঠছে। তাদের একটা বড় অংশ রুগ্ণ শিল্পে পরিণত হচ্ছে এবং একসময় বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এর ফলে বেশ কিছু শ্রমিক কাজ হারাচ্ছে। এদেরেই বলা হয় কাঠামোগত বেকার। এক্ষেত্রে বেকারত্ব দেশে কাঠামোগত পরিবর্তনের ফল। শিল্প কাঠামোয় মূলধন প্রধান বড় শিল্পের আপেক্ষিক প্রাধান্য বাড়ছে এবং ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের আপেক্ষিক গুরুত্ব কমছে। আবার, কৃষি ও শিল্পের ক্ষেত্রে যন্ত্রের ব্যবহার বাড়ার ফলে বেকারি বা কর্মহীনতা বাড়ছে। একেও আমরা প্রযুক্তিগত বা কাঠামোগত বেকারত্ব বলতে পারি। ভারতেও কৃষি ও শিল্পের ক্ষেত্রে এধরনের নানা রকম পরিবর্তনের ফলে অনেক শ্রমিক কাজ হারাচ্ছে। সুতরাং, ভারতেও প্রযুক্তিগত বা কাঠামোগত বেকারত্বও লক্ষ করা যায়।

4. **বাণিজ্যচক্রজনিত বেকারত্ব (Cyclical Unemployment) :** কোনো দেশের অর্থনীতিতে আয়, কর্মসংস্থান, দামস্তর প্রভৃতি প্রধান অর্থনৈতিক চলরাশির কালগত ওঠানামা ঘটে। একে বাণিজ্যচক্র (trade cycle বা business cycle) বলে। ধনতান্ত্রিক অর্থনীতিতে এই ধরনের অর্থনৈতিক কার্যকলাপের এরূপ ওঠা-নামা বেশি পরিলক্ষিত হয়। বাণিজ্যচক্রের প্রধানত দুটি অংশ : ঊর্ধ্বগতি ও নিম্নগতি। বাণিজ্যচক্রের নিম্নগতির অবস্থাকে মন্দাবস্থা এবং ঊর্ধ্বগতির অবস্থাকে সমৃদ্ধির অবস্থা বলা হয়। এখন, বাণিজ্যচক্রের নিম্নগতি বা মন্দাবস্থার সময় জিনিসপত্রের চাহিদা কমে। ফলে জাতীয় আয় ও কর্মসংস্থান কমে। দেশে বেকারত্ব দেখা দেয়। এই ধরনের বেকারত্বকে বাণিজ্যচক্রজনিত বেকারত্ব বলে। অর্থাৎ, দেশে অর্থনৈতিক কার্যকলাপের স্তরে বাণিজ্যচক্রজনিত ওঠা-নামার ফলে, আরো নির্দিষ্ট করে বললে, বাণিজ্যচক্রের নিম্নগতির সময়ে বা মন্দাবস্থার সময়ে যে বেকারত্বের উদ্ভব ঘটে তাকে বাণিজ্যচক্রজনিত বেকারত্ব বলে। সাধারণত উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশেই এই ধরনের বেকারত্ব বেশি দেখতে পাওয়া যায়। 1930 সালের মহামন্দার সময় আমেরিকা এবং ইউরোপের উন্নত দেশগুলিতে ব্যাপক বেকারত্ব দেখা গিয়েছিল। সেটি ছিল বাণিজ্যচক্রজনিত বেকারত্ব। 1930 সালের পরেও বিশ্বের নানা ধনতান্ত্রিক দেশে বিভিন্ন সময়ে এধরনের বেকারত্ব দেখা গিয়েছে। ভারত যেহেতু উন্নত ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি নয়, তাই ভারতে এধরনের বেকারত্বের হার কিছুটা কম। তবে 1960-র দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে 1980 সাল পর্যন্ত ভারতে যে অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দিয়েছিল এবং যার প্রভাবে আয় ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির হার কমে যায়, তার পিছনে বিশ্ব অর্থনীতিতে মন্দাকে অনেকে দায়ী করেছেন। তাছাড়া, 1991 সালের পর ভারতে বিশ্বায়নের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। ভারত এখন বিশ্ব অর্থনীতির ওঠা-নামার দ্বারা অনেকখানিই প্রভাবিত। ধনতান্ত্রিক

দেশগুলির বাণিজ্যচক্রজনিত ওঠা-নামা এখন ভারতীয় অর্থনীতিকে অনেক বেশি প্রভাবিত করে। তাছাড়া, সংস্কার-পরবর্তী যুগে ভারত যত না মিশ্র অর্থনীতি, তার চেয়ে অনেকখানি ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি। ফলে ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির বাণিজ্যচক্র ভারতের ক্ষেত্রেও দেখা যাচ্ছে এবং বিশ্ব অর্থনীতিতে মন্দা হলে তার ঢেউ বা প্রভাব ভারতীয় অর্থনীতিতে অনুভূত হচ্ছে। ফলে বাণিজ্যচক্রজনিত বেকারত্ব ভারতেও লক্ষ করা যায়। ভারত যতই আর্থিক সংস্কারের পথে এবং বিশ্বায়িত অর্থনীতির পথে অগ্রসর হবে, ততই এই দেশে বাণিজ্যচক্রজনিত বেকারত্বের উপস্থিতি লক্ষ করা যাবে।

১০.৫ ভারতে বেকারত্বের প্রকৃতি

আমরা আগের বিভাগে উল্লেখ করেছি যে, কোনো দেশে মূলত চার ধরনের বেকারত্ব দেখা যায়। সেগুলি হল : (i) প্রচ্ছন্ন বা ছদ্মবেশী বেকারত্ব, (ii) মরশুমি বা ঋতুগত বেকারত্ব, (iii) প্রযুক্তিগত বা কাঠামোগত বেকারত্ব এবং (iv) বাণিজ্যচক্রজনিত বেকারত্ব। ভারতেও কমবেশি এই চারধরনের বেকারত্ব লক্ষ করা যায়। তবে অর্থনীতি হিসাবে প্রতিটি দেশই আলাদা। প্রতিটি দেশের বিভিন্ন অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্যের আপেক্ষিক গুরুত্ব আলাদা। এই আর্থ-সামাজিক কাঠামোর পার্থক্যের দরুন বেকারির ধরনে ও বিভিন্ন ধরনের বেকারির আপেক্ষিক গুরুত্বে কমবেশি পার্থক্য থাকতে পারে। এই কথাগুলি ভারতের অর্থনীতি সম্পর্কেও সমভাবে প্রযোজ্য। ভারতে যে বিভিন্ন ধরনের বেকারত্ব লক্ষ করা যায়, সেগুলিকে মোটামুটিভাবে দু'ভাগে ভাগ করা যেতে পারে : a) গ্রামীণ বেকারত্ব (rural unemployment) এবং (b) শহুরে বেকারত্ব (urban unemployment)। গ্রামীণ বেকারত্বকে আবার দু'ভাগে ভাগ করা যায় : (i) প্রচ্ছন্ন বা ছদ্মবেশী বেকারত্ব এবং (ii) মরশুমি বা ঋতুগত বেকারত্ব। শররাঞ্চলের বেকারত্বকেও আবার দু'ভাগে ভাগ করা যায় : (i) শিল্পক্ষেত্রের বেকারত্ব এবং (ii) শিক্ষিত যুবক-যুবতীদের মধ্যে বেকারত্ব। আমরা এই চার ধরনের বেকারত্ব সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করব। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, বেকারত্বের এই শ্রেণিবিভাগ একেবারে অভ্রান্ত বা দৃঢ় (watertight) শ্রেণিবিভাগ নয়। এই শ্রেণিবিভাগ পারস্পরিক ভাবে বিচ্ছিন্ন (mutually exclusive) নয়। একথা বলার তাৎপর্য এই যে শহরের বেকারত্বের মধ্যেও প্রচ্ছন্ন এবং মরশুমি বেকারত্ব থাকতে পারে এবং তেমনি, গ্রামীণ বেকারত্বের মধ্যে গ্রামীণ ক্ষুদ্র শিল্পে শিল্পগত বেকারত্ব এবং গ্রামীণ শিক্ষিত যুবকদের মধ্যে শিক্ষিত বেকারত্ব থাকতে পারে। আমরা এখানে আনুপাতিক গুরুত্বের ভিত্তিতে বেকারত্বের শ্রেণিবিভাগ করেছি।

গ্রামীণ বেকারত্ব (মরশুমি ও প্রচ্ছন্ন বেকারত্ব) : আমরা জানি যে ভারতের গ্রামীণ কার্যকলাপের প্রধান অংশই হল কৃষি সংক্রান্ত কার্যকলাপ। আর কৃষিকার্য হল মরশুমভিত্তিক বা ঋতুভিত্তিক। বছরের কিছু নির্দিষ্ট ঋতুতেই চা,ের কাজ হয়ে থাকে। ফলে কৃষক বা কৃষি শ্রমিকদের বছরের বেশ কয়েকমাস কর্মহীন হয়ে কাটাতে হয়। এই ধরনের কর্মহীনতাকে মরশুমি বা ঋতুগত বেকারত্ব বলে। গ্রামীণ ভারতের

বেকারত্বের একটা বড় অংশই হল মরশুমি বেকারত্ব। তা ছাড়া, ভারতের কৃষির একটা বড় অংশ মরশুমি বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভরশীল। এখানে সেচ ব্যবস্থার বিশেষ প্রসার ঘটেনি। ফলে ভারতের কৃষিকার্যে বৈচিত্র্য (diversification) ঘটেনি। সারাবছর কৃষিকাজ চলে না। তাই ভারতের কৃষিক্ষেত্রে মরশুমি বেকারত্বের আধিক্য। তবে আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে, মরশুমি বেকারত্ব শিল্পক্ষেত্রে এবং শহরের বিভিন্ন জীবিকাতেও দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু ভারতের কৃষিক্ষেত্রে বা গ্রামীণ অর্থনীতিতে মরশুমি বা ঋতুগত বেকারত্বের প্রাধান্য শহর বা শিল্পক্ষেত্রের তুলনায় অনেক বেশি। ভারতের গ্রামীণ বেকারত্বের আর একটি প্রধান রূপ বা ধরন হল প্রচ্ছন্ন বা ছদ্মবেশী বেকারত্ব। ভারতীয় কৃষিতে প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশি সংখ্যক ব্যক্তি নিযুক্ত। এই বাড়তি জনসংখ্যাকে যদি কৃষিকার্য থেকে তুলে নেওয়া হয়, তাহলেও মোট কৃষি উৎপাদন কমবে না। উৎপাদন অপরিবর্তিত রেখে যতজন শ্রমিককে উৎপাদন ক্ষেত্র থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়, ততজনকে অধ্যাপক নার্কস প্রচ্ছন্ন বা ছদ্মবেশী বেকার বলেছেন। এই প্রচ্ছন্ন বেকারদের মোট উৎপাদনে অবদান শূন্য বা, অন্যভাবে বলতে গেলে, এদের প্রান্তিক উৎপাদন শূন্য। ভারতের কৃষিতে এরূপ প্রচ্ছন্ন বেকারত্বের প্রধান দুটি কারণ হল জনসংখ্যার চাপ এবং বাড়তি শ্রমিকদের শিল্পক্ষেত্রের নিয়োগ করার ব্যর্থতা। ভগবতী কমিটির (1973) হিসাব অনুযায়ী, ভারতে মোট কর্মক্ষম মানুষের প্রায় 15 শতাংশ এরূপ প্রচ্ছন্ন বেকার। তথ্যটি তুলনায় পুরনো হলেও বর্তমানে অবস্থার বিশেষ হেরফের হয়েছে বলে মনে হয় না। এখানেও উল্লেখযোগ্য যে ভারতের কৃষিক্ষেত্র ছাড়া শিল্পক্ষেত্রে এবং অন্যান্য পেশার ক্ষেত্রেও প্রচ্ছন্ন বেকারত্ব বা স্বল্প নিযুক্তি (underemployment) বিপুলভাবে দেখা যায়।

শিল্প বেকারত্ব (Industrial Unemployment) : ভারতের শিল্প ও শহরাঞ্চলেও বেকারত্ব দেখতে পাওয়া যায়। ভারতে শিল্প বেকারত্বের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করতে পারি। **প্রথমত**, ভারতের শিল্পক্ষেত্রে বিভিন্ন কারণে মূলধন-নিবিড় উৎপাদন কৌশল গ্রহণ করা হয়েছে এবং হচ্ছে। ফলে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যাকে শিল্পক্ষেত্র কর্মসংস্থান দিতে পারেনি। এজন্য শিল্পক্ষেত্র এবং শহরাঞ্চলে বেকারত্ব ক্রমাগত বাড়ছে। **দ্বিতীয়ত**, ভারতের শিল্পক্ষেত্রে এবং শহরাঞ্চলের বেকারত্ব মূলত প্রযুক্তিগত বেকারত্ব। উৎপাদনের নিত্যনতুন কৌশল আবিষ্কার এবং অনেক কাজে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র প্রবর্তন ক্রমশ বেশি বেশি সংখ্যক লোকের কাজ কেড়ে নিচ্ছে। এর ফলেও ভারতের শিল্পক্ষেত্রে এবং শহরাঞ্চলে বেকারের পরিমাণ দিন দিন বাড়ছে। **তৃতীয়ত**, ভারতের কৃষি জনাকীর্ণ। ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পও নানা সমস্যার সম্মুখীন। ফলে গ্রামের উদ্বৃত্ত জনসংখ্যার একটা অংশ শহরে এসে ভিড় করছে। গ্রামাঞ্চলের প্রচ্ছন্ন বেকার শহরে এসে উন্মুক্ত বেকারে (open unemployment) পরিণত হচ্ছে। **চতুর্থত**, শহরাঞ্চলের বেকার সমস্যার আর একটি বৈশিষ্ট্য হল শিক্ষিত যুবকদের মধ্যে বেকার সমস্যার বৃদ্ধি। তবে এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, শিক্ষিত যুবকদের মধ্যে বেকারত্ব ভারতের গ্রামাঞ্চলেও দেখা যায়। তেমনি, গ্রামাঞ্চলে কোনো ক্ষুদ্র শিল্প ইউনিট বন্ধ হয়ে গেলে কিছু শ্রমিক কাজ হারায়। এই বেকারত্ব শিল্পক্ষেত্রের বেকারত্বেরই অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ শিল্পক্ষেত্রের বেকারত্ব কেবলমাত্র শহরাঞ্চলেই সীমাবদ্ধ, তা কিন্তু নয়। গ্রামাঞ্চলেও শিল্প বেকারত্ব থাকতে পারে।

শিক্ষিত যুবকদের মধ্যে বেকারত্ব (Unemployment among the educated youth) : ভারতে শিক্ষিত যুবকদের মধ্যে বেকারত্বের সমস্যা খুবই ব্যাপক। এই সমস্যা মূলত শহরাঞ্চলের মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যে বেশি লক্ষ করা যায়। অবশ্য সম্প্রতি শহরের নিম্নবিত্ত এবং গ্রামাঞ্চলেও এই সমস্যা ভয়ানক আকার ধারণ করেছে। 1980 সালের পর থেকে দেশে সাধারণ শিক্ষার বিস্তার ঘটেছে খুবই দ্রুত হারে। দেশে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বেড়েছে। ফলে শিক্ষিত কর্মপ্রার্থীর সংখ্যা ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। ভারতে শিক্ষার সুযোগ বেড়েছে বটে, তবে সাধারণ শিক্ষারই বেশি বিস্তার ঘটেছে। কারিগরি বা বৃত্তিমূলক শিক্ষার বিশেষ প্রসার ঘটেনি। ফলে কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করে কোনো শিক্ষার্থী বিশেষ কযেক ধরনের চাকরির (শিক্ষকতা, অফিসে কেরানি বা আধিকারিকের চাকরি প্রভৃতি) উপযুক্ত হয়ে উঠছে। স্ব-নিযুক্ত বা আত্মনির্ভরশীল কোনো কাজে তারা উপযুক্ত হয়ে ওঠেনি। বিশেষ বৃত্তি বা পেশাতে নিযুক্ত হওয়ার কাজের যোগ্যতা তারা অর্জন করেনি। আসলে এধরনের শিক্ষার সুযোগই ভারতে তেমন প্রসারিত হয়নি। ফলে শিক্ষিত যুবকদের মধ্যে বেকারত্ব বেড়েই চলেছে। বর্তমানে গ্রামাঞ্চলেও সাধারণ শিক্ষার বিস্তার ঘটেছে এবং তার ফলে গ্রামাঞ্চলেও শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা ক্রমাগত বেড়ে চলেছে।

১০.৬ ভারতে বেকারির পরিমাণ

কোনো দেশে মোট বিনিয়োগ বাড়লে উৎপাদন বাড়ে এবং উৎপাদন বাড়ার সাথে সাথে সাধারণত কর্মসংস্থান বাড়ে ও বেকারি কমে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ভারত-সহ কিছু দেশে এ ব্যাপারটি ঘটেনি। পরিকল্পনার যুগ থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত ভারতের মোট জাতীয় উৎপাদন যথেষ্ট বেড়েছে, কিন্তু কর্মসংস্থান তার সাথে তাল মিলিয়ে বাড়েনি। অনেক ক্ষেত্রে মোট নিয়োগ কমেছে। আসলে, নিয়োগ কতটা বাড়বে, তা প্রধানত উৎপাদন কৌশলের উপর নির্ভর করে। যদি উৎপাদন কৌশল মূলধন-নিবিড় হয় তাহলে বিনিয়োগ বাড়লে উৎপাদন বাড়বে, কিন্তু কর্মসংস্থান বাড়বে না। ভারতের ক্ষেত্রে তাই ঘটেছে। বৃহদায়তন শিল্পে মূলধন-নিবিড় উৎপাদন কৌশল গ্রহণ করার ফলে কর্মসংস্থান বাড়ার সম্ভাবনা কমে যাচ্ছে। আরো একটি কারণে বৃহদায়তন শিল্পে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি ঘটছে না। সেটি হল অব্যবহৃত উৎপাদন ক্ষমতা (excess productive capacity)। ভারতের বেশ কিছু বৃহদায়ন শিল্পে উদ্‌বৃত্ত উৎপাদন ক্ষমতা রয়েছে। এমনকি এই অব্যবহৃত উৎপাদন ক্ষমতা ক্রমশ বাড়ছে। এরূপ ক্ষেত্রে ওই শিল্পের উৎপন্ন দ্রব্যের চাহিদা বাড়লে অব্যবহৃত উৎপাদন ক্ষমতার একটা অংশ ব্যবহার করে সেই চাহিদা সহজেই মেটানো যায়। কিন্তু তাতে কর্মসংস্থান বিশেষ বাড়ে না। তাই ভারতে পরিকল্পনার যুগে শিল্পোৎপাদন বেড়েছে কিন্তু কর্মসংস্থান তেমন বাড়েনি। ফলে বেকারি বেড়েছে। যেমন, 1970-76 সময়কালে ভারতে সংগঠিত শিল্পের মোট উৎপাদন 32 শতাংশ বেড়েছিল, কিন্তু কর্মসংস্থান বেড়েছিল মাত্র 13 শতাংশ। আবার, 1963 থেকে 1969 সালের মধ্যে বৃহৎ শিল্পের উৎপাদন বেড়েছিল 15 শতাংশ কিন্তু কর্মসংস্থান বেড়েছিল মাত্র 9 শতাংশ।

বিভিন্ন অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় ভারতের কর্মসংস্থান কতটা বেড়েছে এবং তা বেকারি কমাতে কতটা সাহায্য করেছে তা এখন বিচার করা যেতে পারে। প্রথম পরিকল্পনায় (1951-56) কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছিল 70 লক্ষ। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় (1956-61) মোট 100 লক্ষ (বা এক কোটি) কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়। তৃতীয় পরিকল্পনা (1961-66) মোট 145 লক্ষ কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করতে পেরেছিল। সুতরাং প্রথম তিনটি পরিকল্পনার সময়কালে (1951-66) মোট কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয় 315 লক্ষ বা 3 কোটি 15 লক্ষ। এরপর যুদ্ধ, খরা প্রভৃতি প্রতিকূল পরিস্থিতির জন্য চতুর্থ পরিকল্পনা যথাসময়ে শুরু করা যায়নি। পরিবর্তে তিনটি বার্ষিক পরিকল্পনা (1966-69) গৃহীত হয়। এই সময়কালকে ভারতীয় পরিকল্পনার ইতিহাসে 'পরিকল্পনা থেকে ছুটি' (plan holiday) বলে অভিহিত করা হয়। ওই সময় থেকে দীর্ঘ 15 বছর ধরে (1965-80) ভারতীয় অর্থনীতিতে মন্দা চলে। স্বভাবতই তিনটি বার্ষিক পরিকল্পনায় কর্মসংস্থান বৃদ্ধির হার মোটেই ভালো ছিল না। চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা থেকে বিভিন্ন পরিকল্পনায় মোট কত কর্মসংস্থান হয়েছিল তার কোনো তথ্য পরিকল্পনা কমিশনের হিসাব থেকে পাওয়া যায় না। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া প্রদত্ত তথ্য থেকে ভারতে সংগঠিত শিল্পে কত কর্মসংস্থান হয়েছে তার হিসাব পাওয়া যায়। এখানে সংগঠিত শিল্প বলতে সরকারি সংস্থা এবং দশ বা তার বেশি শ্রমিক নিয়োগকারী অ-কৃষিক্ষেত্রের বেসরকারি সংস্থাকে বোঝানো হচ্ছে। শ্রমিক নিয়োগকারী অ-কৃষিক্ষেত্রের বেসরকারি সংস্থাকে বোঝানো হচ্ছে। চতুর্থ পরিকল্পনায় (1969-74) এরূপ সংগঠিত ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছিল 193 লক্ষ। পঞ্চম পরিকল্পনায় (1974-79) এই সংখ্যাটি হল 223 লক্ষ। বিভিন্ন পরিকল্পনায় কর্মসংস্থান বৃদ্ধির হার তুলনা করলে দেখা যায় যে, তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির বার্ষিক হার ছিল 6 শতাংশ। কিন্তু তিনটি বার্ষিক পরিকল্পনার সময়ে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির হার বার্ষিক 1 শতাংশে নেমে আসে। চতুর্থ পরিকল্পনায় কর্মসংস্থান বৃদ্ধির হার অবশ্য বাড়ে (4 শতাংশ)। কিন্তু পঞ্চম পরিকল্পনায় তা আবার কমে বার্ষিক 2.8 শতাংশ দাঁড়ায়। অষ্টম পরিকল্পনার সময়ে (1992-97) মোট কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছিল 420 লক্ষ। কিন্তু দেশে মোট শ্রমিকের সংখ্যা বাড়ার ফলে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির হার বার্ষিক 2.5 শতাংশে নেমে আসে। আর একটি কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (1980-85) পর্যন্ত সরকারি ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির হার ছিল তুলনামূলকভাবে বেশি। অন্যভাবে বলতে গেলে, বেসরকারি ক্ষেত্রে যে হারে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পেয়েছে, সরকারি ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান তার চেয়ে বেশি হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। অর্থাৎ ভারতের সরকারি ক্ষেত্র কর্মসংস্থান বৃদ্ধিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে অন্তত 1980-র দশকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত। তবে এর পর থেকে সরকারি ক্ষেত্রের ভূমিকা জাতীয় অর্থনীতিতে কমতে থাকে। ওই সময় থেকেই ভারতে উদারীকরণ প্রক্রিয়া শুরু হয় যা চরম গতি লাভ করে 1991 সালের শিল্পনীতিতে। সরকারি ক্ষেত্রে বেসরকারিকরণ ও বিলগ্নিকরণ প্রক্রিয়া শুরু হয়। স্বভাবতই, মোট কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সরকারি ক্ষেত্রের অবদান কমে যায়। এই ক্ষেত্রে আমাদের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পগুলি কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারত। কেননা ক্ষুদ্র শিল্পগুলি খুবই শ্রম-নিবিড় উৎপাদন কৌশল গ্রহণ করে। ফলে এদের কর্মসংস্থান সৃষ্টির ক্ষমতা খুব বেশি। 1969-70 সালে ভারতে ক্ষুদ্র ও কুটির

শিল্পে নিযুক্ত মোট লোকের সংখ্যা ছিল 235 লক্ষ বা 2 কোটি 35 লক্ষ। ষষ্ঠ পরিকল্পনার সময় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে কর্মসংস্থানের পরিমাণ বেড়ে দাঁড়ায় 326 লক্ষ বা 3 কোটি 26 লক্ষ। অর্থাৎ পরিকল্পনায় 5 বছরে বাড়তি কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয় প্রায় 1 কোটি।

আর একটি কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। আমাদের প্রতিটি পরিকল্পনায় যে সংখ্যক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে, তার চেয়ে বেশি সংখ্যক নতুন কর্মপ্রার্থী শ্রমের বাজারে যোগ দিয়েছে। ফলে প্রতিটি পরিকল্পনার শেষে বকেয়া বেকারের সংখ্যা বেড়েছে। পরিকল্পনাকালে কর্মক্ষম ব্যক্তির শতাংশ হিসাবে বেকারদের অনুপাত বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রথম পরিকল্পনাকালে মোট কর্মক্ষম ব্যক্তির 2.9 শতাংশ ছিল বেকার। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় এটি বেড়ে হয় 3 শতাংশ। তৃতীয় পরিকল্পনায় এটি বেড়ে দাঁড়ায় 4 শতাংশ। আর তিনটি বার্ষিক পরিকল্পনায় মোট কর্মক্ষম ব্যক্তিদের শতাংশ হিসাবে বেকারদের অনুপাত বেড়ে হয় 9.6 শতাংশ। 1971 সালের বেকারের সংখ্যার একটি হিসাব ভগবতী কমিটির রিপোর্ট (1973) থেকে পাওয়া যায়। ওই রিপোর্টে দেখা যায় যে 1971 সালে ভারতে মোট কর্মক্ষম ব্যক্তির সংখ্যা ছিল 18.04 কোটি এবং মোট বেকারের সংখ্যা ছিল 1.87 কোটি। শতাংশের বিচারে, 1971সালে ভারতে বেকারের হার ছিল মোট কর্মক্ষম ব্যক্তির 10.4 শতাংশ।

জাতীয় নমুনা সমীক্ষা সংস্থা (NSSO) ভারতে বেকারত্বের পরিমাপের জন্য 1972 সাল থেকে তিন রকম বেকারত্বের ধারণা প্রবর্তন করে। সেই ধারণাগুলি হল প্রচলিত পদমর্যাদাসম্পন্ন বেকারত্ব (usual status unemployment), সাপ্তাহিক পদমর্যাদাসম্পন্ন বেকারত্ব (weekly status unemployment) এবং দৈনিক পদমর্যাদাসম্পন্ন বেকারত্ব (daily status unemployment)। কোনো কর্মক্ষম ব্যক্তি এক বছর বা তার বেশি সময়কাল বেকার থাকলে তাকে প্রচলিত পদমর্যাদসম্পন্ন বেকার বলে ধরা হয়েছে। এটি আসলে দীর্ঘকালীন বেকারত্বের (chronic unemployment) ধারণা প্রকাশ করে। অন্যদিকে, কোনো কর্মক্ষম ব্যক্তি কোনো সপ্তাহে এক ঘণ্টার জন্যও কাজ না পেলে তাকে সাপ্তাহিক পদমর্যাদাসম্পন্ন বেকার বলে ধরা হয়। দৈনিক পদমর্যাদাসম্পন্ন বেকারত্বের ক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তি দিনে এক ঘণ্টা বা তার বেশি কিন্তু চার ঘণ্টার কম সময় কাজ করলে সে অর্ধদিবস কাজ করেছে বলে ধরা হয়। আর যদি কোনো ব্যক্তি দিনে চার ঘণ্টা বা তার বেশি সময় কাজ করে তবে ওই ব্যক্তি সারাদিন কর্মরত বলে ধরা হয়। সব হিসাবেই বা মাপকাঠিতেই ভারতে বেকারের সংখ্যা বেড়েছে। এই হিসাবগুলিতে কৃষিক্ষেত্রের প্রচ্ছন্ন বেকারদের বা স্বল্পসময়ের জন্য নিযুক্ত ব্যক্তিদের ধরা হয়নি। এদের ধরলে ভারতে বেকারত্বের হার আরও বেশি হবে। অবশ্য, গ্রামাঞ্চলে প্রচ্ছন্ন বেকারের সংখ্যা সম্পর্কে সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না। ভগবতী কমিটির রিপোর্ট থেকে এদের সংখ্যা সম্পর্কে একটি হিসাব পাওয়া যায়। এই কমিটির মতে, সপ্তাহে 14 ঘণ্টারও কম সময়ের (অর্থাৎ দৈনিক গড়ে দু-ঘণ্টা বা তার কম) জন্য কাজ পায় এরূপ ব্যক্তির সংখ্যা 97.5 লক্ষ। এদের কাজের পরিমাণ এত কম যে ভগবতী কমিটি এদের পূর্ণ বেকার হিসাবেই গণ্য করেছে। আর সপ্তাহে 28 ঘণ্টা (অর্থাৎ দৈনিক গড়ে 4 ঘণ্টা) কাজ পায় এমন ব্যক্তির সংখ্যা 2 কোটি 69 লক্ষ। এটি প্রচ্ছন্ন বেকারত্ব বা স্বল্প নিযুক্তির পরিমাণ। ভগবতী কমিটির মতে, ওই সময়ে (1971) ভারতে প্রচ্ছন্ন বেকারত্ব বা স্বল্প নিযুক্তির হার হল মোট কর্মক্ষম ব্যক্তিদের প্রায় 15 শতাংশ।

ভারতে শিক্ষিত বেকারদের সংখ্যা সম্পর্কেও নিখুঁত কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। ভারতে এরূপ বেকারদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা হয় এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ থেকে। কিন্তু এই তথ্যও ত্রুটিপূর্ণ। **প্রথমত,** অনেক শিক্ষিত বেকারই এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে নাম নথিভুক্ত করে না। **দ্বিতীয়ত,** অনেকে কাজ পাবার পরও তাদের নামের পুনর্নবীকরণ (renewal) করায়। কারণ তারা আরো ভালো কাজের সন্ধান করে। 2021 সালে ভারতে গ্র্যাজুয়েট এবং তার উপরে শিক্ষিত যুবক-যুবতীদের মধ্যে বেকারির হার ছিল 19.4 শতাংশ। দশম থেকে দ্বাদশ ক্লাস পর্যন্ত পড়াশোনা করেছে এরূপ লোকেদের ক্ষেত্রে বেকারির হার 10.3 শতাংশ। ষষ্ঠ থেকে নবম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করেছে এরূপ মানুষের মধ্যে বেকারির হার 1.5 শতাংশ। আর পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করা ব্যক্তিদের মধ্যে বেকারির হার 0.7 শতাংশ (সূত্র : www.statista.com)।

2020 সালের মার্চ মাসে ভারতে কোভিড মহামারি শুরু হয়। মহামারি নিয়ন্ত্রণ করতে ভারত সরকার 25 মার্চ, 2020 তারিখে সারাদেশে লকডাউন ঘোষণা করে। মোট চার দফায় 68 দিন সর্বভারতীয় স্তরে এই লকডাউন জারি ছিল (25 মার্চ থেকে 31 মে, 2020)। এই সর্বভারতীয় লকডাউনের সময় ভারতীয় অর্থনীতির যাবতীয় কর্মকাণ্ড বন্ধ ছিল। এছাড়া, রাজ্য ও স্থানীয় স্তরে জারি হয় অসংখ্য লকডাউন ও লোকের যাতায়াতের উপর নিয়ন্ত্রণ। ফলে কোভিড মহামারির বছর দুটিতে (2020-21 এবং 2021-22) অসংখ্য ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প বন্ধ হয়ে যায়। লক্ষ লক্ষ মানুষ তাদের জীবিকা হারায়। ফলে দুর্দশাগ্রস্ত হয় অসংগঠিত ক্ষেত্রের পরিযায়ী শ্রমিকেরা। স্বভাবতই কোভিড মহামারির সময় (যা কিছু দিনের মধ্যেই অতিমারিতে পরিণত হয়) ভারত-সহ পৃথিবীর বহু দেশেই বেকারি বৃদ্ধি পেয়েছে। CMIE (Centre for Monitoring Indian Economy) দ্বারা প্রকাশিত একটি হিসাব থেকে দেখা যাচ্ছে যে, 2021 সালের ডিসেম্বর মাসে ভারতে বেকারত্বের হার ছিল 7.9 শতাংশ। শহরে এই হার 9.3 শতাংশ এবং গ্রামীণ এলাকায় 7.3 শতাংশ। অনেকেই অবশ্য প্রকৃত সংখ্যাটা আরো বেশি বলে মনে করেন।

১০.৭ ভারতে বেকারত্বের কারণ

ভারতে বেকার সমস্যার পিছনে একাধিক কারণ রয়েছে। আমরা সেই কারণগুলিকে নিম্নলিখিত ভাবে সংক্ষেপে উল্লেখ করতে পারি :

1. **জনসংখ্যা বৃদ্ধি :** 1951 সাল থেকে 2010 সাল পর্যন্ত ভারতের জনসংখ্যা উচ্চহারে বৃদ্ধি পেয়েছে। সম্প্রতি (2020 সালের পর) অবশ্য জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কিছুটা কমেছে। তবে 1950-2010 সময়কালে জনসংখ্যা যেরূপ বেড়েছে, কর্মসংস্থান সেই হারে বাড়েনি। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে তাল রেখে কাজের সুযোগ বাড়েনি বলে বেকারের সংখ্যা ক্রমাগত বেড়েছে।

2. **প্রসারের মন্থর হার :** ভারতীয় অর্থনীতির প্রসারের হার (rate of growth) সব মিলিয়ে মন্থর। পরিকল্পনার প্রথম বছরগুলিতে (1951-65) বৃদ্ধির হার ছিল খুবই কম, যাকে অধ্যাপক

রাজ কৃষ্ণ 'উন্নয়নের হিন্দু হার' (Hindu rate of growth) বলে অভিহিত করেছেন। চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ পরিকল্পনার সময়ে বৃদ্ধির হার এমন কিছু বেশি ছিল না। সপ্তম পরিকল্পনা থেকে ভারতের বৃদ্ধির হার কিছুটা বেড়েছে। তবে সব মিলিয়ে ভারতীয় অর্থনীতির প্রসার হার মন্থরই বলা যেতে পারে। কৃষির অগ্রগতি ও রূপান্তরও খুব ধীর গতিতে ঘটেছে। শিল্পের অগ্রগতির হারও শ্রমিকের জোগান বৃদ্ধির হারের চেয়ে ছিল কম। সব মিলিয়ে তাই বেকারত্ব বেড়েছে।

3. **ভুল উৎপাদন কৌশল নির্বাচন :** ভারতের ন্যায় জনবহুল দেশের পক্ষে সঠিক উৎপাদন কৌশল হল শ্রম-প্রধান বা শ্রম-নিবিড় উৎপাদন কৌশল। কিন্তু ভারতের শিল্প ক্ষেত্রে প্রায়শই মূলধন-নিবিড় বা শ্রম-সঞ্চয়ী উৎপাদন কৌশল ব্যবহার করা হয়েছে। কোনো কোনো পরিকল্পনায় শ্রম নিবিড় উৎপাদন কৌশল গ্রহণের কথা বলা হয় বটে, কিন্তু সব মিলিয়ে ভারতের শিল্প ক্ষেত্রে প্রধানত মূলধন-নিবিড় উৎপাদন বেড়েছে বটে, কিন্তু শ্রমিক নিয়োগ বাড়েনি। ফলে বেকারত্ব বেড়েছে। ভুল বা অনুপযুক্ত উৎপাদন কৌশল নির্বাচন ভারতে বেকার সমস্যার অন্যতম প্রধান কারণ।

4. **উপযুক্ত নিয়োগ নীতির অভাব :** আমাদের পরিকল্পনা রচয়িতাগণ আলাদা ভাবে কোনো কর্মসংস্থান নীতির উপর গুরুত্ব দেননি। তাঁরা ধরে নিয়েছিলেন যে, উৎপাদন বাড়ানোর উপর জোর দিলে কর্মসংস্থান আপনা-আপনিই বাড়বে। কোনো পরিকল্পনাতেই পূর্ণ নিয়োগ অবস্থা অর্জনের কোনো লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়নি। পরিকল্পনায় সুপ্তভাবে ধরে নেওয়া হয়েছিল যে, বিনিয়োগ বাড়লেই তার সাথে কর্মসংস্থানও বাড়বে। কিন্তু বাস্তবে তা ঘটেনি। আসলে, বিনিয়োগ বাড়লে কর্মসংস্থান বাড়বে কিনা তা অনেক বিষয়ের উপর নির্ভর করে, বিশেষত উৎপাদন কৌশল শ্রম-নিবিড় না মূলধন-নিবিড়, তার উপর অনেকখানি নির্ভর করে।

5. **ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের রুগ্‌ণ অবস্থা :** আমাদের বিভিন্ন পরিকল্পনায় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের প্রসারের কথা বলা হয়েছে বটে, কিন্তু এগুলির সামগ্রিক উন্নয়ন ও বিস্তারের জন্য কোনো পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা গৃহীত হয়নি। মাঝে মাঝে কিছু সুযোগ-সুবিধার কথা বলা হয়েছে যেগুলি ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য পর্যাপ্ত নয়। ফলে পরিকল্পনা কালে অনেক ক্ষুদ্র শিল্প রুগ্‌ণ হয়ে পড়েছে। অনেক ক্ষুদ্র শিল্পই বন্ধ হয়ে গেছে। ক্ষুদ্র শিল্পের প্রকৃত সংখ্যা নিবন্ধীকৃত (registered) সংখ্যার চেয়ে অনেক কম। অথচ ক্ষুদ্র শিল্পগুলির নিয়োগ ক্ষমতা বৃহৎ শিল্পের তুলনায় অনেক বেশি। এগুলির উৎপাদন কৌশল খুবই শ্রম-নিবিড়। কিন্তু এই শিল্পগুলির প্রয়োজনীয় হারে বিকাশ ও বিস্তার ঘটেনি। ফলে কর্মসংস্থান বাড়েনি; বেকারত্ব বেড়েছে।

6. **ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থা :** ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থায় সাধারণ শিক্ষার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। এখানে বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও কারিগরি শিক্ষা উপযুক্ত গুরুত্ব পায়নি। ফলে বহু সংখ্যক গ্র্যাজুয়েট

এবং পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট তৈরি হয়েছে বটে, কিন্তু স্ব-নিযুক্ত হবার ব্যক্তি তৈরি হয়নি। এই সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিরা কয়েকটি বিশেষ ধরনের কাজে উপযুক্ত। বিশেষ কোনো বৃত্তি বা পেশায় নিযুক্ত হবার উপযুক্ত শিক্ষা এরা পায়নি। ফলে ভারতে সাধারণ শ্রমিক উদ্‌বৃত্ত হলেও উপযুক্ত দক্ষ ও কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন শ্রমিকের অভাব রয়েছে। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার অভাবের দরুণই ভারতে বহু সংখ্যক শিক্ষিত বেকারের সৃষ্টি হয়েছে।

7. **শিল্পে বাড়তি উৎপাদন ক্ষমতা :** 1970-এর দশকের সময় থেকেই ভারতের অধিকাংশ শিল্পেই বাড়তি উৎপাদন ক্ষমতা রয়েছে। তাদের উৎপাদন ক্ষমতার পরিপূর্ণ ব্যবহার হচ্ছে না। এর পিছনে নানা কারণ রয়েছে। প্রধান কারণগুলি হল : অনিয়মিত বিদ্যুতের জোগান, কাঁচামালের অভাব, পরিবহনের অসুবিধা, শিল্প বিরোধ প্রভৃতি। এখন, এই উদ্‌বৃত্ত ক্ষমতা থাকার ফলে শিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদা বাড়লে সেই চাহিদা পূরণ করতে শিল্পগুলি উদ্‌বৃত্ত উৎপাদন ক্ষমতা ব্যবহার করেই তা করতে পারছে। ফলে শ্রমিক নিয়োগ বিশেষ বাড়ছে না। তাই বেকারত্ব কমেনি।

8. **অন্যান্য কারণ :** ভারতের বেকারত্বের পিছনে আরো কয়েকটি কারণ আমরা উল্লেখ করতে পারি। সেগুলি হল : শ্রমিকদের মধ্যে চলনশীলতার অভাব, ভারতের সরকারি ক্ষেত্রের ব্যর্থতা, কোনো নতুন উদ্যোগ বা শিল্প একক স্থাপনের ক্ষেত্রে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা, চিরাচরিত ও বৈচিত্র্যহীন কৃষি, মূলধনের অভাব, উপযুক্ত প্রযুক্তির অভাবে প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহারে ব্যর্থতা প্রভৃতি।

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, ভারতের ক্রমবর্ধমান বেকারত্বের পিছনে নানা কারণ রয়েছে। সেই কারণগুলিকে আমরা অন্য দৃষ্টিকোণ থেকেও বিবেচনা করতে পারি। ভারতের বেকারত্বকে মূলত তিন ভাগে ভাগ করা যায় : i) কৃষি ও গ্রামীণ বেকারত্ব, ii) শিল্প ও শহরাঞ্চলের বেকারত্ব এবং iii) শিক্ষিত যুবকদের মধ্যে বেকারত্ব। কৃষি ও গ্রামীণ বেকারত্বের দুটি প্রধান রূপ বা ধরন হল প্রচ্ছন্ন বেকারত্ব ও মরশুমি বেকারত্ব। প্রচ্ছন্ন বেকারত্বের পিছনে প্রধান কারণ হল জনসংখ্যার চাপ এবং বিকল্প নিয়োগের অভাব। মরশুমি বেকারত্বের প্রধান কারণ হল কৃষিতে জলসেচের অভাব এবং কৃষির বৈচিত্র্যহীনতা। কৃষি ও গ্রামীণ বেকারত্বের অন্যান্য কারণগুলি হল ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের অবনতি, গ্রামীণ শ্রমিকের চলনশীলতার অভাব, রক্ষণশীল মনোভাব প্রভৃতি। শিল্প ও শহরাঞ্চলের বেকারত্বের পিছনে যে কারণগুলি কাজ করছে সেগুলি হল : শিল্পে অগ্রগতির মন্থরতা, শিল্পে মূলধন-নিবিড় উৎপাদন কৌশলের ব্যবহার, কারিগরি জ্ঞান ও দক্ষতার অভাব, মূলধনের স্বল্পতা, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রসার না ঘটা প্রভৃতি। আর সব রকমের বেকারত্বের পিছনে একটি বড় কারণ হল পরিকল্পনার স্তরে কর্মসংস্থান ও নিয়োগের উপর জোর না দিয়ে মোট উৎপাদনের উপর জোর দেওয়া এবং উৎপাদনের বণ্টনের দিকটি অবহেলা করা।

১০.৮ 1950 সাল থেকে কর্মসংস্থানের নীতি

ভারতে বেকার সমস্যা 1970-এর দশক থেকেই বেশ ব্যাপক আকার ধারণ করতে শুরু করে। এই বেকারি দূর করতে সরকার তাই ওই দশক থেকে বিভিন্ন সময়ে নানা কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। আমরা প্রধান কয়েকটি কর্মসূচি এখানে উল্লেখ করছি।

1. **গ্রামীণ কর্ম প্রকল্প (Rural Works Programme বা RWP) :** এই প্রকল্পে এমন কাজকর্ম গ্রহণ করা হয় যেগুলি গ্রামীণ এলাকায় স্থায়ীভাবে আয় সৃষ্টি করতে পারে।

2. **ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন সংস্থা (Small Farmers Development Agency বা SFDA) :** ছোটো চাষিরা যাতে তাদের কাজকর্মে বৈচিত্র্য আনতে পারে তার জন্য আর্থিক সাহায্য প্রদানের উদ্দেশ্যে এই সংস্থা স্থাপন করা হয়। সারা ভারত ঋণ পুনঃপরীক্ষা কমিটির (1969) সুপারিশের ভিত্তিতে এই সংস্থা স্থাপিত হয়। গ্রামীণ এলাকায় মরশুমি বেকারত্ব কমানোই ছিল এর প্রধান উদ্দেশ্য।

3. **প্রান্তিক চাষি ও ভূমিহীন কৃষক (Marginal Farmers and Agricultural Labourers বা MFAL) :** প্রান্তিক চাষি এবং ভূমিহীন কৃষি শ্রমিকদের কৃষি ও সংশ্লিষ্ট কাজকর্ম যেমন, ডেয়ারি, মুরগি পালন, মৎস্য চাষ প্রভৃতির জন্য এই প্রকল্প থেকে অর্থ সাহায্য দেওয়া হয়। 1970-71 সালে এই প্রকল্প চালু হয়। SFDA-এর মতোই সারা ভারত গ্রামীণ ঋণ পুনঃপরীক্ষা কমিটির (1969) সুপারিশ ক্রমে এই প্রকল্প চালু হয়।

4. **সুসংহত শুষ্ক কৃষি ভূমি উন্নয়ন (Integrated Dry-land Agricultural Development) :** চতুর্থ পরিকল্পনার (1969-74) সময় কেন্দ্রীয় সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় এই কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। এই প্রকল্পের অধীনে কৃষির উন্নতির জন্য কিছু স্থায়ী কাজকর্ম গ্রহণ করা হয়, যেমন, ভূমি সংরক্ষণ, ভূমি উন্নয়ন, জলসেচের প্রসার প্রভৃতি। এধরনের কাজকর্ম খুবই শ্রম-নিবিড়।

5. **কৃষি-সেবা কেন্দ্র (Agro-Service Centre) :** সবুজ বিপ্লবের পর কৃষিতে যন্ত্রপাতির ব্যবহার বেড়েছে। তাই কৃষি যন্ত্রপাতি মেরামত করার জন্য স্বনিযুক্তি প্রকল্পে কৃষি সেবা কেন্দ্র গড়ে তোলার কথা বলা হয়। এই ধরনের কেন্দ্র গড়তে আর্থিক সাহায্য দেওয়ার কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

6. **অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প (Area Development Scheme) :** পার্লামেন্টের সদস্যদের সুপারিশ অনুযায়ী স্থায়ী সম্পদ গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে 1993 সালের ডিসেম্বর মাসে এই কর্মসূচি গৃহীত। এই প্রকল্পের মাধ্যমে নির্বাচিত কিছু অঞ্চলে রাস্তাঘাট, বাজার কমপ্লেক্স ইত্যাদি পরিকাঠামো গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয়।

7. **জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিয়োগ প্রকল্প (National Rural Employment Programme বা NREP) :** কাজের বিনিময়ে খাদ্য (Food for Work) কর্মসূচির বদলে 1980 সালের অক্টোবর মাসে এই প্রকল্প চালু হয়। গ্রামীণ জনসাধারণের একটা অংশ শুধুমাত্র মজুরির উপর নির্ভর করে। কৃষিতে মরশুমি বেকারত্বের সময় এরা খুবই দুর্দশায় পতিত হয়। মূলত এদের সাহায্য করার উদ্দেশ্যেই এই প্রকল্প গৃহীত হয়। গ্রামীণ অর্থনীতিতে যৌথ পরিসম্পদ তৈরি করে গ্রামীণ পরিকাঠামো উন্নত করা ছিল এর মূল লক্ষ্য। এই প্রকল্পের অধীনে মুখ্য কাজগুলি হল জলসেচের জন্য কূপ খনন, গ্রামীণ রাস্তা নির্মাণ, পানীয় জলের জন্য নলকূপ নির্মাণ প্রভৃতি। 1989 সালে 1 এপ্রিল এই NREP কর্মসূচিকে জওহর রোজগার যোজনার (JRY) অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

8. **গ্রামীণ ভূমিহীনদের নিয়োগ নিশ্চিতকরণ প্রকল্প (Rural Landless Employment Guarantee Programme বা RLEGP) :** 1983 সালের 15 আগস্ট NREP প্রকল্পের পরিপূরক হিসাবে এই প্রকল্প চালু হয়। এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য হল গ্রামীণ অর্থনীতিতে সম্পদ সৃষ্টি করে ক্ষেতমজুরদের নিয়োগ নিশ্চিত করা। এর আর একটি প্রধান লক্ষ্য হল গ্রামীণ জীবনযাত্রার মানের সার্বিক উন্নতি ঘটানো। এই প্রকল্পকেও 1989 সালের 1 এপ্রিল জওহর রোজগার যোজনার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। অনেকে মনে করেন যে RLEGP কর্মসূচি আরও বিস্তৃত হয়ে 2006 সালে মহাত্মা গান্ধি জাতীয় গ্রামীণ নিয়োগ নিশ্চয়তা কর্মসূচিতে (MGNREGS) পরিণত হয়েছে।

9. **সুসংহত গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্প (Integrated Rural Development Programme বা IRDP) :** গ্রামীণ ক্ষেত্রে কর্মনিয়োগ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে তৈরি এটি একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প। 1978 সালে ভারত সরকার এই কর্মসূচি গ্রহণ করে এবং 1980 সালে তা রূপায়িত করে। ওই সময়ে গ্রামীণ অর্থনীতিতে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে চালু প্রকল্পগুলিকে ষষ্ঠ পরিকল্পনায় একত্রিত করা হয়। এর নাম দেওয়া হয় সুসংহত গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্প (Integrated Rural Development Programme বা IRDP)। এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হল, গ্রামের দরিদ্রদের উৎপাদনের উপকরণ জোগান দিয়ে তাদের স্ব-নিযুক্তিতে সাহায্য করা।

10. **গ্রামীণ যুবকদের স্ব-নিযুক্তির জন্য প্রশিক্ষণ প্রকল্প (Training for Rural Youth for Self-employment বা TRYSEM) :** 1979 সালের 15 আগস্ট এই প্রকল্প গৃহীত হয়। প্রকল্পটির নাম থেকেই এর উদ্দেশ্য বোঝা যায়। গ্রামীণ যুবকেরা যাতে স্ব-নিযুক্ত হতে পারে তার জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দেওয়া এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য।

11. **জওহর রোজগার যোজনা (Jawahar Rozgar Yojana বা JRY) :** এই যোজনা চালু করা হয় 1989 সালের 1 এপ্রিল। ওই সময়ে চালু থাকা NREP এবং RLEGP প্রকল্প দুটিকেও

এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ফলে এই যোজনার ব্যাপ্তি এবং গভীরতা উভয়ই বাড়ে। এই যোজনার প্রধান উদ্দেশ্য হল গ্রামীণ জনসাধারণের জন্য লাভজনক নিয়োগের সুযোগ তৈরি করা। এর অপর প্রধান উদ্দেশ্য হল গ্রামাঞ্চলে পরিকাঠামো নির্মাণ করা এবং যৌথ সম্পদ সৃষ্টির দ্বারা গ্রামীণ জীবনযাত্রার মানের উন্নতি ঘটানো। এই যোজনা থেকে সাহায্য প্রদানের ক্ষেত্রে তফশিলি জাতি ও উপজাতি জনসমষ্টি ব্যক্তিদের অগ্রাধিকার দেওয়া হয়।

12. **মহাত্মা গান্ধি জাতীয় গ্রামীণ নিয়োগ নিশ্চয়তা কর্মসূচি (Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme বা MGNREGS) :** গ্রামীণ ক্ষেত্রে চালু থাকা বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্যে এটিই সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। 2005 সালের সেপ্টেম্বর মাসে পাশ হয় জাতীয় গ্রামীণ নিয়োগ নিশ্চয়তা আইন (National Rural Employment Guarantee Act বা NREGA)। তারই ভিত্তিতে 2006 সালের ফেব্রুয়ারি মাসে MGNREGS চালু হয়। গ্রামীণ পরিবারের অন্তত একজন সক্ষম ব্যক্তিকে বছরে অন্তত 100 দিন কাজ দেওয়া এই কর্মসূচির লক্ষ্য। গ্রামীণ ভারতে কর্মসংস্থান সৃষ্টির ক্ষেত্রে এটিই অন্যতম প্রধান কর্মসূচি।

13. **অন্যান্য ব্যবস্থা (Other measures) :** গ্রামীণ ভারতে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি এবং তার দ্বারা জীবনযাত্রার মান বাড়াতে বিভিন্ন কর্মসূচি গৃহীত হয়েছে। যেমন, 1977 সালে গৃহীত হয়েছিল কাজের বিনিময়ে খাদ্য প্রকল্প (Food for Work বা FFW), 1969-70 সালে প্রবর্তিত হয় ডেয়ারি উন্নয়ন প্রকল্প, মৎস্য চাষ উন্নয়ন সংস্থা প্রভৃতি। আবার, 1973-74 সালে চালু হয় খরা প্রবণ এলাকা প্রকল্প (Drought Prone Area Programme বা DPAP), 1977-78 সালে চালু হয় মরুভূমি উন্নয়ন প্রকল্প (Desert Development Programme বা DDP) প্রভৃতি। এছাড়া, 1985-86 সালে চালু হয় ইন্দিরা আবাস যোজনা (Indira Awaas Yojana বা IAY)। পরে অবশ্য এটিকেও NREP এবং RLEGP-র ন্যায় 1989 সালের 1 এপ্রিল জওহর রোজগার যোজনার (JRY) অন্তর্ভুক্ত করা হয়। শহরে কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ানোর উদ্দেশ্য আরো কয়েকটি কর্মসূচি গৃহীত হয়। সেগুলি হল : শহরের দরিদ্র ব্যক্তিদের জন্য স্ব-নিযুক্তি কর্মসূচি (Self-Employment Programme for the Urban Poor বা SEPUP) শহুরে শিক্ষিত যুবকদের স্ব-নিযুক্ত প্রকল্প (Self-Employment for the Educated Urban Youth বা SEEUY) প্রভৃতি। কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়ানোর উদ্দেশ্যে 1993-94 সালে দুটি বিশেষ প্রকল্প ঘোষিত হয়। সেগুলি হল : নিয়োগ আশ্বাস প্রকল্প (Employment Assurance Scheme বা EAS) এবং শিক্ষিত বেকার যুবক-যুবতীদের জন্য প্রধানমন্ত্রী রোজগার যোজনা (Pradhan Mantri Rozgar Yojana বা PMRY)।

এ সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা সত্ত্বেও ভারতে বেকার সমস্যার ব্যাপকতা কমেনি, বরং তা বেড়েই

চলেছে। ভারতে বর্তমানে জনসংখ্যা 140 কোটির বেশি। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার 1 শতাংশ ধরলে প্রতি বছর জনসংখ্যা বাড়ছে 1.40 কোটি। প্রতি বছর জনসংখ্যার একটা বড় অংশ নতুন শ্রমিক হিসাবে শ্রমের বাজারে প্রবেশ করছে। তাদের সকলকে কাজ দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। ফলে ভারতে বেকারের সংখ্যা দিন দিন বেড়ে চলেছে। বেকারি ও দারিদ্র্য পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। বেকারি বাড়লে দারিদ্র্য বাড়বে। সুতরাং ভারতে দারিদ্র্যের সমস্যাও জটিল থেকে জটিলতর হচ্ছে। তাই দারিদ্র্য ও বেকারি কমাতে গেলে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। পাশাপাশি, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের প্রসার ঘটাতে হবে। কৃষিভিত্তিক গ্রামীণ শিল্প গড়ে তুলতে হবে। বেকারদের কিছু আর্থিক সাহায্য না দিয়ে সেই তহবিল দিয়ে স্থায়ী পরিসম্পদ নির্মাণ করতে হবে। তবেই সেখানে আয় ও কর্মনিয়োগ সৃষ্টি হবে। শুধু কিছু আর্থিক সাহায্য দিলে তা সাময়িক অভাব দূর করবে মাত্র। এতে কোনো স্থায়ী সমাধান হবে না। এছাড়া, বর্তমানে সরকার উদারীকরণের নীতি গ্রহণ করেছে। অনেক বহুজাতিক সংস্থা এখন বিনা বাধায় ভারতে প্রবেশ করছে। এদের উৎপাদন কৌশল মূলধন-নিবিড়। এদের আগমনের ফলে ভারতে নিয়োগ বিশেষ বাড়বে না। তাছাড়া, বহুজাতিক সংস্থাগুলির সঙ্গে দেশীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি প্রতিযোগিতায় পেরে উঠবে না। এই দেশীয় শিল্পগুলিকে ধীরে ধীরে বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানগুলি গ্রাস করবে। এর ফলেও ভারতে আগামী দিনে কর্মসংস্থান বিশেষ বাড়বে না বলেই মনে হয়। সেক্ষেত্রে ভারতে বেকার সমস্যা ও দারিদ্র্যের সমস্যার সমাধান অধরাই থেকে যাবে বলে আশঙ্কা হয়।

১০.৯ অসংগঠিত অর্থনীতি

ভারতের নানা অসংগঠিত ক্ষেত্রে বিশাল সংখ্যক শিশু নানা অর্থনৈতিক কাজকর্মে নিযুক্ত। অবশ্য শিশু শ্রমিক কেবলমাত্র আমাদের দেশেই রয়েছে এমন নয়। উন্নত এবং উন্নয়নশীল উভয় প্রকার দেশেই শিশু শ্রমিক দেখা যায়। কিন্তু ভারতে শিশু শ্রমিকের অনুপাত সবচেয়ে বেশি। ভারতে নানা ছোটখাটো কাজে প্রায় 35 মিলিয়ন শিশু নিযুক্ত রয়েছে।

কারণ : শিশু শ্রমিকের এই সংখ্যাধিক্যের পিছনে কয়েকটি প্রধান সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণ রয়েছে। সংক্ষেপে সেগুলি হল :

(1) শিশু শ্রমিকের সংখ্যাধিক্যের প্রধান কারণ হল তাদের বাবা-মায়ের দারিদ্র্য। দারিদ্র্যের জন্যই বাবা-মায়েরা তাদের বাচ্চাদের বাইরের কাজে পাঠাতে বাধ্য হয়।

(2) শিশু শ্রমিকের আরও একটি কারণ হল শিশুশ্রম সস্তা। বাচ্চাদের কম খেতে দিতে হয়, তাদের মজুরি দিতে হয় কম। তারা দীর্ঘক্ষণ (অনেক সময়, যেমন, চায়ের দোকান, হোটেল, রেস্তোরাঁ-য় ভোর চারটে থেকে রাত এগারোটা) কাজ করে। তারা ইউনিয়ন করে না। একঘেঁয়ে পৌনঃপুনিক (repititive) কাজ তাদের দিয়ে করানো যায়। এগুলো সবই নিয়োগকর্তার কাছে খুবই লাভজনক।

(3) অনেক দূর ও প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে বিদ্যালয়ে শিক্ষার সুযোগ তেমন নেই, বিশেষত প্রাথমিক বা মাধ্যমিক শিক্ষার পর। স্বভাবতই একটা সময়ের পর বাবা-মায়েরা তাদের সন্তানদের পড়াশুনো বন্ধ করে তাদের কর্মক্ষেত্রে পাঠায়।

(4) শিশুদের নিয়োগের ক্ষেত্রে শর্তাবলি সবই মৌখিক। ফলে কাজ ছাড়িয়ে দিলেও তার জন্য কোনো ক্ষতিপূরণ দিতে হয় না। কাজের পরিবেশ, সময়, ছুটি বা বিশ্রাম সম্পর্কেও কোনও নিয়মের কড়াকড়ি নেই। ফলে বাস্তবে শিশু শ্রমিকদের প্রতি নিয়োগকর্তার কোনো দায়িত্বই থাকে না। তাই তারা শিশু শ্রমিক নিয়োগে বেশি আকৃষ্ট হয়।

(5) কিছু কিছু কাজে (যেমন, কার্পেট বোনা, আতসবাজি তৈরি, উল শোধন ইত্যাদি) শিশু শ্রমিকদের দক্ষতা পূর্ণবয়স্ক শ্রমিকদের চেয়ে বেশি। সুতরাং এ ধরনের কাজকর্মে শিশুদেরই পছন্দ করা হয়।

প্রতিকার : শিশু শ্রমিকেরা তাদের নিয়োগকর্তার দ্বারা নানাভাবে শোষিত হয়। তাদের দীর্ঘক্ষণ খাটানো হয়, কম মজুরি দেওয়া হয়, সামান্য পরিমাণ খেতে দেওয়া হয়, অস্বাস্থ্যকর এবং নিরাপত্তাহীন পরিবেশে কাজ করতে বাধ্য করা হয়, দুর্ঘটনা অথবা অসুস্থতার জন্য কোনো বিমা ব্যবস্থা নেই, যাতে পালাতে না পারে সেজন্য কর্মক্ষেত্রে আটকে রাখা হয়, সামান্য ভুল বা ত্রুটি হলে শারীরিক নির্যাতন করা হয় ইত্যাদি। এ সমস্ত দুর্দশা থেকে তাদের রক্ষা করার জন্য 1996 সালের 10 ডিসেম্বর সুপ্রিম কোর্ট একটি রায় দেয়। কোর্ট নির্দেশ দেয় যে, নয়টি বিপদজনক বলে চিহ্নিত কারখানায় শিশুদের পরিবর্তে পূর্ণবয়স্ক শ্রমিকদের নিয়োগ করতে হবে। তাছাড়া যে সমস্ত নিয়োগ- কর্তা পূর্বের আইন লঙ্ঘন করে শিশুদের নিয়োগ করেছে তাদের শিশু প্রতি 20,000 টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। এই টাকা দিয়ে **শিশুশ্রমিক পুনর্বাসন তথা কল্যাণ ভাণ্ডার** (Child Labour Rehabilitation-cum-Welfare Fund) গঠন করা হবে। সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারও শিশু প্রতি 5,000 টাকা প্রদান করবে এই ফান্ডে, যদি সরকার কোনো শিশু শ্রমিকের পরিবারের একজন পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তিকে চাকরি দিতে না পারে। এই ফান্ডের টাকা শিশু শ্রমিকটির উপযুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার জন্য ব্যয় করা হবে।

এছাড়া সর্বোচ্চ আদালত যে-কোনো বিপদজনক কাজে 14 বছরের কমবয়স্ক শিশুদের নিয়োগ নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। এছাড়া আরও কয়েকটি কাজে শিশুদের নিয়োগ নিষিদ্ধ করা হয়, যেমন, বিড়ি বাঁধা, কার্পেট বোনা, সিমেন্ট তৈরি, কাপড় ছাপা, কাপড় রং করা ও বোনা, আতসবাজি, দেশলাই ও বিস্ফোরক তৈরি, অভ্র কাটা ও ভাঙা, নির্মাণ কার্য, ঝালাইয়ের কাজ, চর্মশোধন, সাবান তৈরি, উল শোধন, শ্লেট ও পেন্সিল তৈরি প্রভৃতি।

সুপারিশ/মন্তব্য (Suggestions/Comments) : শিশু শ্রমিকদের সমস্যা দূর করার জন্য বাধ্যতামূলক স্কুল শিক্ষা প্রবর্তনের ব্যবস্থা করা অত্যন্ত জরুরি। সরকারকে অবিলম্বে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে। **দ্বিতীয়ত**, শ্রম আইন দৃঢ়ভাবে প্রয়োগ করতে হবে। আমাদের দেশে রয়েছে শিশুশ্রম

বন্ধ করার আইন : Child Labour (Prohibition) Regulation Act, 1986. এছাড়া, সংবিধানের 24 নং ধারায় বিপদজনক কাজে শিশুদের নিয়োগ নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করা হয়েছে। তাছাড়া, 1948 সালের কারখানা আইনে বিপসসংকুল মেসিনের সামনে শিশুদের কাজ করানোর নিষেধ রয়েছে। এই আইন ভাঙলে নিয়োগকর্তার বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগ জানানোর কথাও বলা হয়েছে। কিন্তু এই আইনগুলো যথাযথভাবে প্রযুক্ত হয়নি, তাই রেস্তোরাঁ বা গ্যারেজে আমরা শিশু শ্রমিক দেখতে পাই। **তৃতীয়ত**, UNICEF-এর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, সরকারি বাজেটের 20% প্রাথমিক শিক্ষা এবং মৌল সামাজিক পরিষেবার জন্য বরাদ্দ রাখতে হবে।

USA, জার্মানি প্রভৃতি কয়েকটি দেশ শিশুদের দ্বারা তৈরি দ্রব্যসামগ্রী আমদানির উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। তারা আশা করছে যে, এর ফলে ওই সমস্ত দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদনে শিশু শ্রমিকের নিয়োগ বন্ধ হবে। কিন্তু স্বল্পকালে এর কোনো শুভ প্রভাব পড়বে বলে মনে হয় না। তাৎক্ষণিকভাবে যা ঘটবে তা হল ওই সমস্ত কারখানা বন্ধ হবে, শিশুরা কাজ হারাবে, তাদের বাবা-মায়ের বাড়তি উপার্জন বন্ধ হবে। তারা দারিদ্রের চাপে শিশুদের আরও বিপদজনক কাজে ঠেলে দেবে অথবা তাদের আরও নিপীড়ন ও শোষণ করবে।

শিশু শ্রমিকের সমস্যার সমাধান করতে হলে সামাজিক সচেতনতা বাড়াতে হবে। সমস্যাটি যতটা অর্থনৈতিক তার চেয়েও বেশি সামাজিক। শিশুদের বাবা-মা, সরকার, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, নিয়োগকারী সকলকেই উপলব্ধি করতে হবে যে, শিশুদের স্কুল শিক্ষা ও উপযুক্ত পরিচর্যা সর্বাগ্রে প্রয়োজন। তবেই তারা ভবিষ্যতে সমাজের উন্নয়নে তাদের অবদান রাখতে পারবে। আইন নয়, এই উপলব্ধিই শিশুশ্রম নামক সামাজিক ব্যাধিটি দূর করতে পারে।

১০.১০ সারাংশ

১. **ভারতে বেকার সমস্যা :** প্রচলিত মজুরির হারে যারা কাজ করতে ইচ্ছুক এবং সক্ষম, কিন্তু কোনো কাজ পাচ্ছে না তাদের বেকার বলা হয়। ভারতে বেকার সমস্যা বর্তমানে এক ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। দেশে বেকার থাকার অর্থ হল মানব সম্পদ অব্যবহৃত থাকা। তাছাড়া, বেকার সমস্যা ও দারিদ্র্যের সমস্যা একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। কোনো ব্যক্তি বেকার বা কর্মহীন হয়ে পড়লে একসময় সে দরিদ্র হয়ে পড়ে। তাই দেশের দারিদ্র্য দূর করতে হলে বেকার সমস্যার সমাধান সর্বাগ্রে প্রয়োজন।

২. **বেকারত্বের শ্রেণিবিভাগ :** বেকারত্বের প্রকৃতি অনুযায়ী একে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়, যেমন, প্রচ্ছন্ন বা ছদ্মবেশী বেকারত্ব, মরশুমি বেকারত্ব, প্রযুক্তিগত বা কাঠামোগত বেকারত্ব এবং বাণিজ্যচক্রজনিত বেকারত্ব। প্রচ্ছন্ন বা ছদ্মবেশী বেকারত্ব বলতে সেই উদ্‌বৃত্ত শ্রমিকদের বোঝায় যাদের উৎপাদন প্রক্রিয়া থেকে তুলে নিলেও মোট উৎপাদন কমে না। মরশুমি বেকারত্ব

বলতে সেই সমস্ত শ্রমিকদের বোঝায় যারা বিশেষ মরশুম বা ঋতুতে কাজ পায় এবং বাকি সময় বেকার থাকে। অন্যদিকে, দেশের কাঠামোগত কোনো পরিবর্তন ঘটলে অথবা কলাকৌশলের পরিবর্তন ঘটলে কিছু শ্রমিক উদ্‌বৃত্ত হয়ে পড়লে তাদের প্রযুক্তিগত বা কাঠামোগত বেকারত্ব বলে। আর অর্থনীতিতে মন্দা বা বাণিজ্যচক্রের নিম্নগতির সময় জিনিসপত্রের চাহিদা কমার ফলে শ্রমিকের চাহিদাও কমে যায়। এর ফলে দেশে যে বেকারত্বের উদ্ভব ঘটে তাকে বাণিজ্যচক্রজনিত বেকারত্ব বলে।

৩. **ভারতে বেকারত্বের প্রকৃতি :** ভারতে যে বেকারত্ব দেখা যায় সেটিকে মোটামুটি ভাবে দু'ভাগে ভাগ করা যায় : গ্রামীণ বেকারত্ব এবং শহুরে বেকারত্ব। গ্রামীণ বেকারত্বকে আবার দু'ভাগে ভাগ করা যায় : প্রচ্ছন্ন বা ছদ্মবেশী বেকারত্ব এবং মরশুমি বা ঋতুগত বেকারত্ব। শহুরে বেকারত্বকে আবার দু'ভাগে ভাগ করা যায় : শিল্পক্ষেত্রের বেকারত্ব এবং শিক্ষিত যুবক-যুবতীদের মধ্যে বেকারত্ব। অবশ্য এই শ্রেণিবিভাগ পারস্পরিক ভাবে বিচ্ছিন্ন নয়।

৪. **ভারতে বেকারির পরিমাণ :** ভারতে বেকারি সম্পর্কে কোনো নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায় না। তাছাড়া, বিভিন্ন সমীক্ষায় বেকারির বিভিন্ন সংজ্ঞা বা মাপকাঠি নেওয়া হয়েছে। আবার, কৃষিক্ষেত্রে প্রচ্ছন্ন বেকারির সংখ্যা বাস্তবে নির্ণয় করা খুবই কঠিন, শিক্ষিত বেকারদের সংখ্যা সম্পর্কেও নিখুঁত কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। Centre for Monitoring Indian Economy (CMIE) দ্বারা প্রকাশিত একটি হিসাব থেকে দেখা যাচ্ছে যে, 2021 সালের ডিসেম্বর মাসে ভারতে বেকারত্বের হার ছিল 7.9 শতাংশ অর্থাৎ কর্মক্ষম ব্যক্তিদের প্রায় 8 শতাংশ ছিল বেকার। শহরে এই হার 9.3 শতাংশ এবং গ্রামীণ এলাকায় 7.3 শতাংশ। অনেকেই অবশ্য প্রকৃত সংখ্যাটা আরো বেশি বলে মনে করেন।

৫. **ভারতে বেকারত্বের কারণ :** ভারতে বিপুল সংখ্যক বেকারত্বের পিছনে প্রধান কারণগুলি হ'ল : জনসংখ্যা বৃদ্ধি, প্রসারের মন্থর হার, ভুল উৎপাদন কৌশল নির্বাচন, উপযুক্ত নিয়োগ নীতির অভাব, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের রুগ্‌ণ অবস্থা, বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষার প্রতি অবহেলা, শিল্পে বাড়তি উৎপাদন ক্ষমতা, সরকারি ক্ষেত্রের ব্যর্থতা, শ্রমিকদের চলনশীলতার অভাব, মূলধনের অভাব, চিরাচরিত কৃষি ব্যবস্থা, শিল্প ইউনিট স্থাপনের ক্ষেত্রে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা প্রভৃতি।

৬. **ভারতের বেকার সমস্যার সমাধানে কিছু সুপারিশ :** গ্রামীণ বেকারত্ব দূর করতে যে ব্যবস্থাগুলি নেওয়া যেতে পারে সেগুলি হল : পতিত জমি উদ্ধার, বাঁধ নির্মাণ, খাল খনন, রাস্তাঘাট নির্মাণ, জলসেচের প্রসার, কৃষিভিত্তিক শিল্প গড়ে তোলা প্রভৃতি। শহর ও শিল্পাঞ্চলের বেকারত্ব দূর করতে হলে যে ব্যবস্থাগুলি নিতে হবে সেগুলি হল : শিল্পে বিনিয়োগ বৃদ্ধি, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের বিকাশ ঘটানো, শ্রম-নিবিড় উৎপাদন কৌশল গ্রহণ, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি। শিক্ষিত যুবকদের মধ্যে বেকারত্ব দূর করতে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রসার প্রয়োজন।

৭. **ভারতে বেকারি দূর করতে গৃহীত কর্মসূচি :** বেকারি দূর করতে ভারত সরকার গৃহীত উল্লেখযোগ্য ব্যবস্থাগুলি হল : গ্রামীণ কর্ম প্রকল্প, ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন সংস্থা, প্রান্তিক চাষি ও ভূমিহীন শ্রমিক সংস্থা, জাতীয় গ্রামীণ কর্মনিয়োগ প্রকল্প, গ্রামীণ ভূমিহীনদের নিয়োগ নিশ্চিতকরণ প্রকল্প, সুসংহত গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্প, জওহর রোজগার যোজনা, খরাপ্রবণ এলাকা প্রকল্প, ইন্দিরা আবাস যোজনা, ডেয়ারি উন্নয়ন প্রকল্প, মৎস্য চাষি উন্নয়ন প্রকল্প এবং সর্বোপরি মহাত্মা গান্ধি জাতীয় গ্রামীণ নিয়োগ নিশ্চিতকরণ প্রকল্প। কিন্তু এসব সত্ত্বেও বেকারের সংখ্যা বাড়ছে। বেকার সমস্যা কমাতে গেলে প্রথমেই জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার নিয়ন্ত্রণ করা দরকার। এছাড়া, সরকারি প্রচেষ্টায় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের এবং শ্রম-নিবিড় উৎপাদন কৌশলের প্রসার ঘটানো দরকার। কিন্তু উদারীকরণের যুগে তা সম্ভব হবে না বলেই মনে হয়।

৮. **ভারতে মহিলা শ্রমিক :** মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক হল মহিলা। অথচ মহিলা শ্রমিকের অনুপাত ভারতে মাত্র 20 শতাংশের মতো। এদের একটা বড়ো অংশই অসংগঠিত ক্ষেত্রে, কৃষিক্ষেত্রে এবং বাগিচা শিল্পে নিযুক্ত। ভারতে মহিলারা সাধারণত কম মজুরির শ্রমে নিযুক্ত। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধায়ক কিংবা আধিকারিক হিসাবে মহিলাদের নিয়োগ ভারতে খুবই কম। অবশ্য কিছু কিছু কাজে মহিলারা পুরুষদের চেয়ে বেশি দক্ষ। এগুলি হল : বিশেষ কিছু কৃষি কাজকর্ম, চা পাতা তোলা, ইটভাটার কাজ, চালকলে কাজ, বিড়ি বাঁধা প্রভৃতি। কিন্তু এ সমস্ত কাজে মজুরি তুলনায় কম। তাই ভারতে মহিলা শ্রমিকেরা পুরুষদের চেয়ে কম মজুরি পেয়ে থাকে। এর পিছনে অবশ্য নানা আর্থ-সামাজিক কারণ কাজ করে।

৯. **ভারতে শিশু শ্রমিক :** ভারতের বিভিন্ন অসংগঠিত ক্ষেত্রে বহুসংখ্যক শিশু নানা অর্থনৈতিক কাজকর্মে নিযুক্ত। শিশু শ্রমিকদের এই সংখ্যাধিক্যের পিছনে কারণ হল : তাদের বাবা-মায়ের দারিদ্র্য, মজুরি কম, এক ঘেঁয়ে কাজ তাদের দিয়ে করানো যায়, তারা দীর্ঘক্ষণ কাজ করে, কিছু কিছু কাজে শিশুদের দক্ষতা বেশি ইত্যাদি। ভারতে 14 বছরের কমবয়সি শিশুদের বিপদজনক কাজে নিয়োগ বেআইনি, কিন্তু মূলত শিশুদের বাবা-মায়ের দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে ভারতে শিশু শ্রমিক নিয়োগ অবাধে চলছে।

১০.১১ অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত উত্তরের প্রশ্নাবলী

১. বেকার কাকে বলে?

২. মরশুমি বেকারি কাকে বলে?

৩. প্রযুক্তিগত বেকারির সংজ্ঞা দাও।

৪. বাণিজ্যিচক্রজনিত বেকারি কাকে বলে?

৫. শিক্ষিত বেকারত্বের প্রধান কারণ কী?

৬. কৃষিতে মরশুমি বেকারত্বের মূল কারণ কী?

৭. কৃষিতে প্রচ্ছন্ন বেকারত্বের প্রধান কারণ কী?

৮. প্রচলিত পদমর্যাদাসম্পন্ন বেকারত্ব কী?

৯. MFAL ও SFDA-র পুরো নাম কী?

১০. NREP-র পুরো কথাটি কী?

১১. RLEGP ও IRDP-র পুরো নাম বল।

১২. TRYSEM প্রকল্পটি কী?

১৩. TRYSEM প্রকল্পটির পুরো নাম লেখ।

১৪. SEPUP ও SEEUY-এর পুরো নাম দুটি লেখ।

১৫. PMRY-এর পুরো নাম কী?

১৬. MGNREGS-এর পুরো নাম কী?

১৭. MGNREGS-এর মূল উদ্দেশ্য কী?

মাঝারি দৈর্ঘ্যের উত্তরের প্রশ্নাবলী

১. প্রচলিত, সাপ্তাহিক ও দৈনিক পদমর্যাদাসম্পন্ন বেকারত্ব কাকে বলে?

২. গ্রামীণ বেকারত্ব দূর করার জন্য কয়েকটি প্রতিবিধান উল্লেখ করো।

৩. শিল্পাঞ্চলে বেকারত্ব দূর করার কয়েকটি উপায় নির্দেশ করো।

৪. মরশুমি ও প্রচ্ছন্ন বেকারির ধারণা সংক্ষেপে বর্ণনা করো।

৫. ভারতে বেকারত্ব পরিমাপের সমস্যাগুলি উল্লেখ করো।

৬. ভারতে মহিলা শ্রমিকদের নিয়োগের অবস্থা কেমন?

৭. RLEGP প্রকল্পটি সংক্ষেপে বর্ণনা করো।

৮. ভারতে শিশু শ্রমিকদের নিয়োগের অবস্থা বর্ণনা করো।

৯. MGNREGS-এর সুফলগুলি বর্ণনা করো।

১০. MGNREGS-এর সাম্প্রতিক সীমাবদ্ধতাগুলি উল্লেখ করো।

১১. IRDP কার্যসূচি সংক্ষেপে বর্ণনা করো।

১২. NREP প্রকল্পটি সংক্ষেপে আলোচনা করো।

দীর্ঘ উত্তরের প্রশ্নাবলী

১. ভারতে বিভিন্ন ধরনের বেকারত্বের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

২. ভারতে বেকারির প্রধান কারণগুলি উল্লেখ করো।

৩. ভারতে বেকারত্ব দূর করতে তোমার কিছু সুপারিশ দাও।

৪. বেকারত্ব দূর করতে ভারত সরকার অবলম্বিত পদক্ষেপগুলি আলোচনা করো।

৫. ভারতে বেকারি দূর করতে ভগবতী কমিটির সুপারিশগুলি সংক্ষেপে উল্লেখ করো।

৬. MGNREGS-এর উপর একটি নীতিদীর্ঘ প্রবন্ধ লেখ।

সঠিক উত্তর নির্বাচনের প্রশ্নাবলী (MCQ)

১. মরশুমী বেকারত্ব কাকে বলে?

(ক) মুলধন গঠনের অভাব
(খ) জনসংখ্যা বৃদ্ধি
(গ) বছরের কোনো বিশেষ সময়ে কাজ না পাওয়া
(ঘ) কোনোটিই নয়

২. প্রচ্ছন্ন বেকারত্ব কাকে বলে?

(ক) চাহিদার অভাব
(খ) উৎপাদন কম হওয়ার জন্য
(গ) যে শ্রমিকের প্রান্তির উৎপাদনশীলতা শূন্য
(ঘ) কোনোটিই নয়

৩. ভারতে মহিলা শ্রমিকের একটি বড় অংশ কোন ক্ষেত্রে

(ক) সংগঠিত (খ) অসংগঠিত
(গ) কোনোটিই নয়

৪. ভারতে শিশু শ্রমিকের একটি বড় অংশ কোন ক্ষেত্রে

(ক) সংগঠিত (খ) অসংগঠিত

(গ) কোনোটিই নয়

১০.১২ গ্রন্থপঞ্জি

১. Datt Gaurav & Ashwani Mahajan (2020) : *Indian Economy*, S. Chnad and Company Limited, New Delhi.

২. Puri, V. K. and S. K. Misra (2020) : *Indian Economy*, Himalaya Publishing House, Mumbai

৩. Kapila, Uma (2017-18) : *Indian Economy*, Academic Foundation, New Delhi

৪. সেখ সেলিম (2011) : *ভারতের পরিকল্পনা ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন*, গ্রন্থমিত্র, কলকাতা

৫. সরখেল, জয়দেব ও সেখ সেলিম (2022) : *ভারতীয় অর্থনীতি*, বুক সিন্ডিকেট প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা

৬. রায়, স্বপন কুমার ও জয়দেব সরখেল (2018) : *ভারতের অর্থনীতি*, বুক সিন্ডিকেট প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা

৭. Nandi Ajoy (2010) : আধুনিক ভারতীয় অর্থনীতির রূপরেখা : B. B. Kundu Grandson.

NOTES

NOTES